বাংলায় মতুয়া নারী বৃত্তান্ত (১৮৭২-২০১১)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যা বিভাগের অধীনে
এম.ফিল (আই.এস.এল.এম) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক
মিলটন বিশ্বাস
মানবীবিদ্যা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা ৭০০০৩২

তত্ত্বাবধায়ক
ড. রূপ কুমার বর্মন
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা-৭০০০৩২

২০১৯

M Phil in Women's Studies
Affiliated to the
Faculty of Interdisciplinary Studies, Law & Management
Jadavpur University
Kolkata, India

CERTIFICATE OF RECOMMENDATION

This is to certify that the thesis entitled **"বাংলায় মতুয়া নারী বৃত্তান্ত(১৮৭২-২০১১)"** is bonafide work carried out by MILTON BISWAS under our supervision and guidance for partial fulfillment of the requirement for M Phil in Women's Studies during the academic session 2019.

THESIS ADVISOR

Professor Rup Kumar Barman

Department of History,

Jadavpur University, Kolkata-700032

DIRECTOR

Professor Aishika Chakraborty

School of Women's Studies

Jadavpur University, Kolkata-700032

DEAN

Faculty of Interdisciplinary Studies, Law & Management
School of Water Resources Engineering
Jadavpur University, Kolkata- 700032

Declaration of Originality and Compliance of Academic Ethics

I hereby declare that this thesis contains literature survey and original research work by the undersigned candidate, as a part of my M Phil in Women's Studies degree during academic session 2019.

All information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct.

I also declare that, as required by this rules and conduct, I have fully cited and referred all material and results that are not original to this work.

Name: MILTON BISWAS

Roll Number: MPWO194013

Thesis Title: বাংলায় মতুয়া নারী বৃত্তান্ত (১৮৭২-২০১১)

Signature:

Date:

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	i-iii
ভূমিকা	১-২০
প্রথম অধ্যায়: জাত ব্যবস্থার গোড়াপত্তন ও নারীবাদী আন্দোলন	২১-৪৪
১.১. প্রাচীন কালে বর্ণ ভিত্তিক সমাজ ও অস্পৃশ্যদের অবস্থান	২১-২২
১.২. মধ্য যুগে বর্ণ ভিত্তিক সমাজ ও অস্পৃশ্যদের অবস্থান	২৩-২৪
১.৩. ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে চণ্ডালের অবস্থান	২৪-২৬
১.৪. চণ্ডালদের আন্দোলন	২৬-৩৪
১.৫. দেশভাগ পরবর্তী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মতুয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধারাবাহিক ক্ষমতার সম্পর্ক	৩৪-৩৬
১.৬. নারী বাদী আন্দোলনের সূচনা	৩৬-৪০
১.৭. পর্যবেক্ষণ	৪১
টীকা ও সূত্র নির্দেশ	৪২-৪৪
দ্বিতীয় অধ্যায়: মতুয়া নারীদের অবস্থা(১৮৭২-১৯৪৬)	৪৫-৯৭
২.১. উচ্চবর্ণীয় নারীদের সামাজিক অবস্থা	৪৫-৪৯
২.২. উচ্চবর্ণীয় নারীদের শিক্ষা	৪৯-৫১
২.৩. উচ্চবর্ণীয় নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা	৫১-৫২
২.৪. উচ্চবর্ণীয় নারীদের রাজনীতিতে আগমন	৫২-৫৫
২.৫. নিম্নবর্ণীয় নারীদের সামাজিক জীবন	৫৫-৬৫
২.৬. নিম্নবর্ণীয় নারীদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ	৬৫-৬৬
২.৭. নিম্নবর্ণীয় নারীদের শিক্ষা	৬৬-৬৮
২.৮. নিম্নবর্ণীয় নারীদের রাজনৈতিক অবস্থা	৬৮-৬৯
২.৯. মতুয়া নারীদের ধর্মীয় অবস্থা	৬৯-৭৪
২.১০. মতুয়া নারীর সামাজিক জীবন	৭৪-৭৯
২.১১. মতুয়া নারীদের শিক্ষা	৮০-৮৩
২.১১. মতুয়া নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা	৮৩-৮৭
২.১২. মতুয়া নারীদের রাজনৈতিক অবস্থা	৮৭-৯০
২.১৩. পর্যবেক্ষণ	৯১

টীকা ও সূত্র নির্দেশ	৯২-৯৭
তৃতীয় অধ্যায়: উদ্বাস্তু ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর পর্বে মতুয়া নারী (১৯৯০-১৯৪৭)	৯৮-১৪১
৩.১. দেশভাগ ও উদ্বাস্তু আগমন	৯৮-১০৪
৩.২. মতুয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আগমন	১০৪-১০৯
৩.৩. দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধে মতুয়া নারীদের উপর প্রভাব	১০৯-১১১
৩.৪. মতুয়া নারীর সামাজিক অবস্থা	১১১-১১৫
৩.৫. মতুয়া নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা	১১৫-১১৮
৩.৬. মতুয়া নারীদের রাজনৈতিক অবস্থা	১১৮-১২২
৩.৭. উদ্বাস্তু মতুয়া নারীদের শিক্ষা	১২২-১২৩
৩.৮. মতুয়া নারীর ধর্মীয় অবস্থা	১২৩-১২৫
৩.৯. দেশভাগ পরবর্তী পূর্ববঙ্গে অবস্থানকারী মতুয়া নারীর সামাজিক অবস্থা	১২৫-১৩৪
৩.১০.পর্যবেক্ষণ	১৩৫
টীকা ও সূত্র নির্দেশ	১৩৬-১৪১
চতুর্থ অধ্যায়: মতুয়া নারীদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন বৃত্তান্ত (১৯৯০-২০১১)	১৪২-১৭৯
৪.১. বাংলায় দলিত আন্দোলনের প্রেক্ষাপট	১৪৪-১৪৯
৪.২. মতুয়া নারীদের ধর্মীয় অবস্থা	১৪৯-১৫১
৪.৩. পশ্চিমবঙ্গে মতুয়া নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা	১৫১-১৫৪
৪.৪. মতুয়া নারীদের রাজনৈতিক অবস্থান	১৫৫-১৫৭
৪.৫. শিক্ষাগত অবস্থা	১৫৭-১৫৮
৪.৬. মতুয়া নারীদের সামাজিক অবস্থা	১৫৮-১৬১
৪.৭. বাংলাদেশের মতুয়া নারীদের ধর্মীয় অবস্থা	১৬১-১৬৩
৪.৮. বাংলাদেশের মতুয়া নারীদের রাজনৈতিক অবস্থা	১৬৩-১৬৪
৪.৯. বাংলাদেশী মতুয়া নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা	১৬৪-১৬৭
৪.১০. বাংলাদেশের মতুয়া নারীদের শিক্ষা	১৬৭-১৬৯
৪.১১. সামাজিক অবস্থা	১৬৯-১৭৩
৪.১২. পর্যবেক্ষণ	১৭৪
টীকা ও সূত্র নির্দেশ	১৭৫-১৮০

উপসংহার	১৮১-১৮২
নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি	১৮৩-১৮৮

ভূমিকা

আমার গবেষণা-সন্দর্ভের বিষয়বস্তু হল উনবিংশ শতক থেকে বর্তমান সময় অব্দি বাংলার মতুয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নারীদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থান উত্থাপন এবং তার বিশ্লেষণ করা। মূলধারার নারী-আন্দোলনে যতই সাধারণভাবে সমস্ত নারীর মুক্তির কথা বলা হোক 'নারী' বলে একটি সমসত্ব সত্তার কথা বললে তা সবধরনের নারীর সমস্যার কথা বলছে না। মতুয়া নারীর জীবনের শোষণ যেহেতু বহুমাত্রিক, উচ্চবর্ণের নারীদের থেকে পৃথক, তা আলাদা করে তুলে ধরার দাবি রাখে। মতুয়া নারীদের প্রতি বৈষম্য হয় কারণ তাঁরা নারী (লিঙ্গভিত্তিক), কারণ তাঁরা প্রান্তিক (বর্ণভিত্তিক), এবং প্রান্তিক নারী হিসেবে, তাঁদের নিজেদের পুরুষদের দ্বারা শোষিত। ভারতবর্ষে জাতপাতগত ও লিঙ্গগত বিভেদের সবচেয়ে খারাপ রূপটা প্রকাশ পায় দলিত নারীদের প্রতি আচরণে।

উনিশ শতকে, সংখ্যার বিচারে তথাকথিত 'চণ্ডাল' বা নমশুদ্ররা বাংলার বৃহৎ জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও উচ্চবর্ণের ভদ্রলোক সমাজের কাছে 'অ-জল চল' ও 'অস্পৃশ্য' বলে ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হত, আবার উচ্চবর্ণের প্রভাবশালী জমিদার ও জোতদারদের দ্বারা আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে শোষিত ও নিপীড়িত হত। এই অবস্থায় ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দি গ্রামের চণ্ডাল হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮) 'মতুয়া ধর্ম' প্রবর্তনের মাধ্যমে এক নতুন আদর্শকে তুলে ধরেন। নারীকে সমমর্যাদা দেওয়ার কথা বলা হয়। তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের (১৮৪৭-১৯৩৭) নেতৃত্বে মতুয়া নিছক ধর্মীয় পরিমণ্ডল অতিক্রম করে এক শক্তিশালী সমাজ সংস্কার আন্দোলনে পরিণত হয়। বিশেষত নারীদের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্য-বিবাহ রদ করেন। কিন্তু ধীরে ধীরে আদর্শ গার্হস্থ্য সংসার প্রতিস্থাপনের মধ্যে দিয়ে নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করা হয়। নারীদের সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে, চাল-চলনে, আচার আচরনে পুরুষদের বিধি নিষেধের উপর নির্ভর করতে হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা অর্থহীন শ্রমিকে পরিণত হয়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে যদিও তাঁদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা ছিল পুরুষদের অধীনে।

কিন্তু, এই অবস্থার পরিবর্তন হয় ১৯৪৭ সালে দেশভাগ ও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়। মতুয়া নারীরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পাক বাহিনী, আল–বদর, রাজাকার বাহিনীর চোখ এড়িয়ে পুরুষের ঘেরাটোপে দেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। বেঁচে থাকার তাগিদে, পুরুষদের সঙ্গে নারীরা জীবিকার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে লোকের বাড়িতে কাজ, দিনমজুরি, বিড়ি বাঁধার কাজ, আংটির কাজ করে জীবন ধারণ করতে শুরু করে। অর্থের জন্য পুনরায় তারা ঘরের বাইরে চলে আসে। সামাজিক বাঁধন কিছুটা শিথিল হয় এবং তারা শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক জীবিকা গ্রহণ করে। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের মাধ্যমে মতুয়া নারীরা স্থানীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলেও, মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশে মতুয়া নারীদের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার পুরোটাই পুরুষ কেন্দ্রিক, ফলে তাদের অবস্থা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী মতুয়া নারীদের তুলনায় আরো শোচনীয়। একইরকমভাবে তাদের ও পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা তাঁদের চালচলন সব ক্ষেত্রেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। বর্তমান সময়েও সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে মতুয়া নারীরা যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিয়মনীতি, বাধা-নিষেধের মধ্যে রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না।

এই গবেষণা-সন্দর্ভে স্বাধীন চণ্ডাল নারী মতুয়া ধর্মের অনুশাসনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে তাঁরা কীভাবে উচ্চবর্ণের নারীদের মতো শুধু ‘ভালো স্ত্রী ও মা’ হয়ে ঘরের অন্তঃপুরে ঠাঁই পেল, এই গবেষণা-সন্দর্ভে তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার পরিধি

গবেষণা-সন্দর্ভটি ১৮৭২ সাল থেকে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন অব্দি সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে। ১৮৭২ সালে ভারতে প্রথম জনসমীক্ষার কাজ শুরু হয়। ফলে প্রত্যেকটা জনগোষ্ঠীর সংখ্যাটা এই সময় থেকে আংশিক ভাবে জানা যায়। উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে অস্পৃশ্য চণ্ডালদের সামাজিক আন্দোলন শুরু হয় ১৮৭২ সালে ফরিদপুর-বাখরগঞ্জ অঞ্চলে। এই সামাজিক বর্জনের আন্দোলন প্রায় ছয় মাস চলে। এই আন্দোলন অবশ্য বেশিদিন চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। আর এই প্রথম অসাফল্যের পরেই এদের মধ্যে উদ্ভব হয় এক সংগঠিত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের, যার

নাম হল মতুয়া। তাই গবেষণা-সন্দর্ভটি মতুয়া ধর্মের আরম্ভ থেকে শুরু করেছি। ১৯৪৭ সালে মতুয়াদের একাংশ প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের ঠাকুরনগরে বসতি স্থাপন করে এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী হয়ে বিপুল সংখ্যাক মতুয়া তথা নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ভারতে আশ্রয় নেয়। নতুন পরিবেশে জীবন-ধারণের জন্য তাঁদের পূর্বের মতো কাজে নামতে হয়, এবং তার সঙ্গে ছিল নাগরিকত্বের অধিকার নিয়ে টালবাহানা। ১৯৯০ সালে প্রথম মতুয়া মহাসঙ্ঘের মহিলা শাখা হিসাবে শান্তি সত্যভামা নির্বাণ কমিটি তৈরি হয়। মতুয়া নারীদের কার্যকলাপ হিসাবে হরিসভায় কীর্তন গান গাওয়া, পূজাঅর্চনার নিয়মবিধি ঠিক রাখা, এবং আদর্শ মতুয়া ভক্ত হিসাবে হরি-গুরুচাদের পুজাঅর্চনা দেওয়া প্রধান দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ১৯৯২ সালে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নমঃশূদ্র তথা মতুয়া নারীদের সংরক্ষণ সুবিধে পাবার সুবাদে হিসাবে নির্বাচিত হতে শুরু করে। বর্তমান সময়ে বিশেষ করে গত বিধানসভা নির্বাচন অব্দি তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভোট ব্যাংক হিসাবে সরকার গঠনে নির্ণায়ক হয়ে উঠেছে। তাই গবেষণা-সন্দর্ভে ২০১১ অবধি মাতুয়া নারীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী গবেষণার প্রতি অবলোকন

উনবিংশ শতকের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কার, ধর্ম, জাতপাত, নারী প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রচনা বিংশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন গবেষণাধর্মী রচনার মাধ্যমে উনিশ শতককে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন উচ্চবর্ণের আলোকে, সেখানে স্থান খুব কম পেয়েছে অন্ত্যজ নারী। একবিংশ শতকেও ইতিহাস-চর্চার ধারা পরিবর্তিত হলেও মতুয়া নারীদের নিয়ে গবেষণাধর্মী গ্রন্থ নেই বললেই চলে। আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভে বিশেষ কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করলেই বোঝা যাবে-

মনোহর মৌলী বিশ্বাস রচিত *দলিত সাহিত্যের রূপরেখা* গ্রন্থটি[১] ভারতীয় দলিতদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে দলিত আন্দোলন, কন্নড় দলিত আন্দোলন, বাংলার দলিত আন্দোলন প্রসঙ্গে চণ্ডালদের কথা তুলে ধরেছেন বামফ্রন্টের সময় অবধি। বিভিন্ন অস্পৃশ্য জাতি সম্প্রদায়কে উচ্চবর্ণ কীভাবে শোষণ করত তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন। কিন্তু দলিত নারীদের

শোষণ যে আরও বেশি ছিল, সেটা তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায় না।যতিন বালা রচিত *দলিত সাহিত্য আন্দোলন* একইরকমভাবে নারীদের কথা তুলে ধরেননি।[২]

অনুপম হীরা মণ্ডল রচিত *বাংলার ভাবান্দোলন ও মতুয়া ধর্ম* নামক গ্রন্থে[৩] হরিচাঁদ ঠাকুরের মতুয়া ধর্ম প্রচারের জন্য কয়েকজন সাধিকাকে নিয়োগ করেছিলেন তাঁদের কথা তাঁর গ্রন্থ থেকে জানা যায়। তবে মতুয়া নারীরা কেন সামাজিক রাজনৈতিক ভাবে এগিয়ে আসেনি, সেটা তাঁর গ্রন্থে নেই। নন্দদুলাল মোহান্ত রচিত *মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ* গ্রন্থে[৪] ধর্মীয়ভাবে মতুয়াদের সব বিবরণ পাওয়া যায়। নারীদের কথা লিখেছেন শুধু ধর্মীয় দিক থেকে ব্যাখা দিয়ে।

মনোশান্ত বিশ্বাস রচিত *বাংলায় মতুয়া আন্দোলন সমাজ সংস্কৃতি* গ্রন্থটি[৫] বাংলায় মতুয়াদের সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। হরি-গুরুচাঁদ ধর্মীয় ক্ষেত্রে নারীদের কতটা স্বাধীনতা দিয়েছেন, বাল্য বিবাহ রদ, নারীদের শিক্ষা বিস্তারের বিষয়ে জানা গেলেও নারীরা যে মতুয়া ধর্মের মধ্যে থেকে তাঁদের স্বাধীনতা হারিয়েছে সেটা তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল তাঁর *মতুয়া ধর্ম প্রসঙ্গে* (চতুর্থ দুনিয়া, ২০১০) গ্রন্থে[৬] মতুয়া ধর্মের পাশাপাশি নারীরা স্থানীয় লোকাচার হিসাবে হ্যাচড়া পূজা, বাস্তুপূজা, একাদশী ব্রত, শিবরাত্রি পালন করত সেটা তিনি উল্লেখ করলেও তৎকালীন সময়ে সামগ্রিক মতুয়া নারীদের কথা জানা যায় না।

উনিশ শতকের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সংস্কার নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের লেখাতে ও চণ্ডাল তথা প্রান্তিক মতুয়া নারীদের কথা পাওয়া যায় না। তাঁদের গ্রন্থেও মতুয়া নারীরা অচ্ছুৎ হিসাবে থেকে গেছেন। বিংশ শতকে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের রচনা পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট ধারণা হবে—

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রচিত *বাংলার নারী জাগরণ* নামক গ্রন্থে[৭] রামমোহন যুগে নারী কল্যাণ আন্দোলনের অংশ হিসাবে সতীদাহ প্রথা রদ, স্ত্রী শিক্ষা প্রসার, বিদ্যাসাগরের সময়ে বিধবা বিবাহ, বামাবোধিনী পত্রিকার লেখিকাগণ, হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়, অন্তপুরে স্ত্রীশিক্ষা, বরিশালে নারী আন্দোলন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন উচ্চবর্ণের নারীদের প্রেক্ষিতে, কিন্তু গ্রন্থে উচ্চবর্ণের সামাজিক সঙ্গকার আন্দোলনে সমাজের নিচুতলার অন্ত্যজ নারীদের কী প্রভাব পড়েছে সেটা জানা যায় না।

ছবি রায় রচিত *বাংলার নারী আন্দোলন* নামক গ্রন্থে[৮] উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলার প্রগতিশীল সমাজে 'এক অংশ' থেকে এগিয়ে এসে যে সমস্ত মেয়েরা পরবর্তীকালের জীবনযাত্রার রূপ-কে নতুন ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের কথা তিনি আলোচনা করেছেন।

Dr. (Mrs) Usha chakraborty, *Condition of Bengali women around the 2nd half of the 19th century* নামক গ্রন্থে,[৯] সতীদাহ প্রথা রদ, নারী শিক্ষার বিস্তার, বহুবিবাহ আইনত বন্ধ না হলেও সমাজ যে সচেতন হয়েছিল সেটা বিস্তারিত আলোচনা করলেও, অন্ত্যজ শ্রেণীর নারীদের সম্পর্কে কোনও আলোচনা নেই।

বিনয় ঘোষ রচিত *বাংলার নবজাগৃতি* বইটি[১০] তিনটি খণ্ডে রচিত। প্রথম খণ্ডে তিনি নবজাগৃতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাদভূমি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কলকাতার উৎপত্তি থেকে শুরু করে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হিসাবে কলকাতার উত্থান দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে, সমাজ খণ্ড হিসাবে পরিচিত, এই খণ্ডে তিনি রামমোহন, দ্বারকানাথ, কেশব চন্দ্র সেন, রাধাকান্ত দেব, ভূদেব, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, ইয়ং বেঙ্গল, স্যার সৈয়দ আহমেদ খান প্রমুখ দের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তৃতীয় খণ্ডে, সংস্কৃতি খণ্ড, যেখানে তিনি ছাপাখানা থেকে, সংবাদপত্র, সাহিত্য, চিত্রকলা প্রভৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। যেখানে তিনি তাঁর ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা উদ্ধৃতি করে বলেছেন, "বাংলার ইতিহাস চাই, নাহলে বাঙালী কখনো মানুষ হইবে না"[১১]। কিন্তু তাঁর গ্রন্থেই বাংলার সবচেয়ে বড়ো জনগোষ্ঠী চণ্ডালদের নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি। চণ্ডাল বা মতুয়া নারীরাও তাঁর লেখায় স্থান পাইনি। তিনি তাদের বাঙালী হিসাবে মনেই করেননি।

যোগেশ চন্দ্র বাগল *বাংলার নব্য সংস্কৃতি* গ্রন্থে[১২] নব্য সংস্কৃতির প্রধান বিষয় হিসাবে নারী-শিক্ষার কথা বলেছেন। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকশ্রেণী যে বিভিন্ন ধরনের সভাসমিতি গঠন করে, সেইগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তৎকালীন সময়ে উচ্চবর্ণের নারীদের অনুকরণে বাংলার নিম্নবর্ণের নারীদের শিক্ষা-বিষয়ক কোনও আলোচনা তাঁর গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায় না।

রমাকান্ত চক্রবর্তী রচিত *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রন্থে*[১৩] *বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব, বিস্তার* এবং অস্পৃশ্যদের সমাজে কিভাবে প্রভাব পড়েছিল, সেই বিষয়ে আলোচনা করেছেন, বৈষ্ণব ধর্মের সম্প্রদায়-উপসম্প্রদায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তিনি জাতবৈষ্ণব প্রসঙ্গ নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অস্পৃশ্য চণ্ডাল নারীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল— সেটা তাঁর গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তবে তাঁদের সামাজিক অবস্থা, অর্থনীতি সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

নির্মল কুমার গুপ্ত তাঁর *ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য* নামক গ্রন্থে[১৪] বলেছেন বাংলায় অস্পৃশ্য দূর করতে বৈষ্ণব ধর্ম অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পুরুষ- নারী ভেদাভেদ ও দূর করতে এই ধর্ম সাহায্য করেছে। বঙ্গীয় সমাজ ও সাহিত্যে চৈতন্যপ্রভাব নিয়ে আলোচনা করলেও অস্পৃশ্য সমাজ নিয়ে তাঁর গ্রন্থে কিছু তথ্য পাওয়া যায় না।

ডঃ অজয়েন্দ্র নাথ সরকার রচিত *উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বিতর্ক রচনা* গ্রন্থে[১৫] সমাজ সংস্কার হিসাবে সতীদাহ প্রথা, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথা নিবারণ, স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তন, মদ্যপান নিবারন আন্দোলন, এবং ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবে খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যকলাপ, ব্রাহ্মধর্মের কথা উল্লেখ করলেও মতুয়া ধর্মের প্রবর্তনের মাধ্যমে চণ্ডালদের ঐক্যবদ্ধতা তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না।

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *বঙ্গ সাহিত্যে নারী* গ্রন্থে[১৬] তিনি স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, শরৎকুমারী দেবী, মানকুমারী দেবী, কামিনী রায়, কুসুমকুমারী দেবী, বিনয়কুমারী দেবী, প্রমীলা বসু, কৃষ্ণ ভাবিনী দাসী, মৃণালিনী সেন, সরলা দেবী প্রমুখ শিক্ষিতা নারীর বয়ান ও তাঁদের রচিত গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার রচিত *বাংলাদেশের ইতিহাস* গ্রন্থের[১৭] অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে জাতিভেদ হিসাবে চার বর্ণের বাইরে সৎশূদ্র, পতিত সংকর জাতি, ও ব্যাধ, ভড়, কোল, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি নিচু জাতির কথা উল্লেখ করলেও নিচু জাতির নারীদের কথা জানা যায় না।

বিনয় ঘোষ রচিত *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)* (কলকাতা, পাঠভবন, নভেম্বর ১৯৬০) পঞ্চম অধ্যায় সহযোগে বিভাজিত গ্রন্থে[১৮], তিনি গ্রামসমাজের পরিবর্তনের গতি

ঐতিহ্য যে বংশানুক্রমিকভাবে প্রভাবিত হত সেটা তিনি দেখিয়েছেন। বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থানসহ তাঁদের বাবুশ্রেণিতে রূপান্তরিত হওয়ার কথা বলেছেন। গ্রাম্য সমাজের কথা বলেও তিনি বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী চণ্ডাল বা নমঃশূদ্রদের কথা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেননি।

বিনয় ঘোষ রচিত *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)* গ্রন্থে[১৯] ধর্মান্দোলন, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতির দিকে আলোকপাত করেছেন। ধর্মান্দোলনের অংশে তিনি প্রচলিত ব্রাক্ষণ্যবাদের বিরুদ্ধে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, তাঁর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নিম্নবর্ণের হিন্দুরা মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছিল সেটা তুলে ধরার পাশাপাশি ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু মুসলিম ধর্ম তৎকালীন সময়ে গ্রহণ করার থেকে নিজেদের মতো করে স্বধর্মের প্রতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নজর দিয়েছিল, সেটা যেমন তাঁর লেখায় যেমন পাওয়া যায় না, তেমনি এই ধর্মান্দোলন বিশেষ করে নিম্নজাতির নারীদের কী ভূমিকা ছিল সেটা তাঁর রচনায় অনুপস্থিত।

গোলাম মুর্শিদ তাঁর *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক* নামক গ্রন্থে[২০] সমাজ সংস্কার আন্দোলন হিসাবে তিনি ঊনবিংশ শতকে বাংলায় নারীকে কেন্দ্র করে বিধবাবিবাহ থেকে শুরু করে বহুবিবাহ-বিরোধী, স্ত্রী-শিক্ষা আন্দোলন, ও মদ্যপানের মতো বিষয় নিয়ে তাঁর লেখায় বিভিন্ন নাটক উঠে আসলে ও সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণিকে নিয়ে ভাবিত কোনও নাটক তাঁর লেখায় স্থান পায় নি। গোলাম মুর্শিদ রচিত অন্য একটি গ্রন্থ *সংকোচের বিহ্বলতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া (১৮৪৯-১৯০৫)* নামক বইতেও[২১] অন্ত্যজ নারীদের কথা উঠে আসেনি।

Meredith Borthwick রচিত *The Changing Role of Women in Bengal 1849-1905)* (New Jersy, Princeton University Press, 1984) গ্রন্থে[২২] নারীদের অবস্থা, এবং নারীদের ওপর শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অন্তঃপুরে নারীদের অবস্থা, মাতৃত্ব, শিশুপালন, ভদ্র মহিলাদের বাইরের জীবন, কর্মদক্ষতা, রাজনীতি এবং তাঁদের জীবন ধীরে ধীরে যে পরিবর্তন হচ্ছে সেটা তিনি বিশদভাবে উল্লেখ করলেও বাংলার অন্য নারীদের কথা তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

ডঃ মঞ্জুশ্রী সিংহ রচিত *ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বঙ্গমহিলা* গ্রন্থে[২৩] উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে প্রাচীন সময় থেকে মধ্যযুগের নারীদের কথা তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখিত গ্রন্থে তিনি স্ত্রী-শিক্ষা, সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ রদ আন্দোলন, বাল্যবিবাহ রদ, মদ্যপান-বিরোধী আন্দোলন ঐতিহাসিকভাবে ও সাহিত্যে কীভাবে দেখানো হয়েছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করলেও তৎকালীন সময়ের অন্ত্যজ নারীদের কথা তাঁর লেখায় অনুপস্থিত।

মালেকা বেগম বাংলার নারীদের কথা তাঁর লেখনীর মধ্যে সবসময় গুরুত্ব দিয়েছেন কিন্তু তাঁর গ্রন্থ *বাংলার নারী আন্দোলন* গ্রন্থে[২৪] উচ্চবর্ণের নারী-আন্দোলন সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর উপর কী প্রভাব পড়েছে সেটা কোনোভাবেই জানা যায় না। তাঁর অন্য একটি গ্রন্থ[২৫] *নারী মুক্তি আন্দোলন,* যেখানে তিনি পাশ্চাত্যের নারীবাদী আন্দোলন থেকে প্রাচ্যের নারী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইসলাম-ধর্মের তুলনায় হিন্দু-ধর্মে যে নারী নির্যাতন বেশী হয় এবং তাঁর কারণ হিসাবে সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বেগম রোকেয়া তাঁর গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হলেও অন্য নিম্নবর্গের নারীদের কোনও উল্লেখ নেই।

সুফিয়া কামাল তাঁর *নারী জাগরণ ও মুক্তি* গ্রন্থে[২৬] আদিম সমাজ থেকে দাসসমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজে নারীরা বরাবরই যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ব্যাক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে সেই সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। বর্তমান বাংলাদেশে নারীদের কতটা হীনভাবে দেখা হয় সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন কোনও নির্দিষ্ট সমাজের নারী ব্যতীত।

সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী রচিত *অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকের ভদ্রমহিলা* গ্রন্থের[২৭] নামকরণ থেকে বোঝা যায় তিনি শুধু উচ্চবর্ণের নারীদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। উনিশ শতকের সূচনাপর্ব থেকে বাঙালী মহিলাদের চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা, দাম্পত্য-ভাবনা, ঘর-গেরস্থালী, মেয়েদের নিজস্ব জগত প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য-সম্বলিতভাবে আলোচনা করেছেন।

রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *উনিশ শতকে নারী মুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য (১৮৫০-১৯০০)* গ্রন্থেও[২৮] তিনি সতীদাহ প্রথা থেকে শুরু করে মদ্যপান-বিরোধী আন্দোলন অব্দি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চবর্ণের নারীদের পুরুষদের অধীনে জীবনযাত্রা আলোচনা করেছেন।

উনিশ শতক নিয়ে বিভিন্ন গবেষকের গ্রন্থের পর্যালোচনা করে দেখা গেল যে তাঁদের কাছে নারী বলতে শুধু উচ্চবর্ণের নারীদের বুঝাত, যারা সতীদাহ প্রথা নামে এক বর্বর প্রথার দীর্ঘদিন শিকার হয়ে আসছিল, রামমোহন ও ব্রিটিশ সরকারের বেশ কিছু ব্যাক্তির উদ্যোগে তারা মুক্তি পায়। ধীরে ধীরে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি থেকেও। কিন্তু মূলধারার ইতিহাস রচনায় অন্ত্যজ নারীদের উল্লেখ নেই বললেই চলে।

দেশভাগের ইতিহাসও সেইরকম ধারা বজায় রেখেছে শুধু ব্যতিক্রম কিছু গ্রন্থ বাদ দিয়ে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগজনিত কারণে মতুয়াদের একাংশ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়। পুরুষদের থেকেও নারীদের ট্রমা (Trauma) ও ট্র্যাজেডি (Tragedy) বেশী ছিল, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কারণে নারীরা ছিল উভয় সম্প্রদায়ের কাছে আঘাতের লক্ষ্যবস্তু। সুতরাং নারীদের যন্ত্রণাকে বাদ দিয়ে দেশভাগের চর্চা সম্ভব নয় মোটেই। উচ্চবর্ণের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি কোলকাতা বা সংলগ্ন স্থানে বসতি স্থাপন করতে পেরেছিল। সরকার তাঁদের প্রতি সদয় ছিল যদি কেন্দ্রীয় সরকার বেশী সদয় ছিল পশ্চিম পাকিস্থান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের প্রতি। বাংলার উদ্বাস্তুদের প্রতি ছিল বিমাতৃকসুলভ আচরণ। তা সত্ত্বেও নিম্নবর্গের মানুষের ন্যায় তাঁদের মধ্যবিত্তদের অবস্থা হয়নি। আর নিম্নবর্ণের নারীদের অবস্থা ছিল আরও করুণ। তাঁদের জীবিকা অর্জনের জন্য লোকের বাড়ি কাজ করা থেকে শুরু করে সবধরনের কাজ করতে হত।

দেশভাগজনিত কারণে নারীদের যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার প্রথম বর্ণনা পাওয়া যায় উর্বশী বুটালিয়া (*The Other Side of Silence: Voices From The Partition of India*, Duke University Press, June 2000, ISBN978-0-8223-2494-2), রিতু মেনন ও কমলা ভাসিন (*Borders and Boundaries: Women in India's Partition, Kali for Women*, 1998) প্রমুখের গ্রন্থে। তবে তাঁদের লেখা পাঞ্জাবী মহিলাদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদিত যশোধারা বাগচীর লেখায় *The*

Trauma and the Triumph: Gender and Partition in Eastern India (Bhatkal & Son, 2003) প্রথম বাংলার নারীদের দেশভাগজনিত কারণে যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনে যে ভয়ংকর সমস্যার মধ্যে দিয়ে জীবন ধারণ করতে হয়েছে সেটার কথা তিনি তুলে ধরেছেন। পরবর্তী ইতিহাসে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'শরণার্থী মহিলাদের অস্তিত্ব খোঁজার লড়াই' হিসাবে উল্লেখ করেছেন বা 'The Emergence of New Women' বলে তাঁদের উল্লেখ করেছেন। চলচিত্র জগতের দিকে যদি তাকাই দেশভাগে নারীদের যে ঘরের বাইরে বেরিয়ে কাজ করে সংসার চালাতে হয়েছে তার দৃষ্টান্ত ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০ সালে মুক্তি পায়) সিনেমার 'নীতা' চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু নীতা কি নিম্নবর্গের নারীদের ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে? না, পারেনি। কারণ নীতা শিক্ষিতা, বাবা স্কুলে চাকরি করতেন। ফলে যে দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালক দেশভাগে নারীদের বাইরে বেরিয়ে আসা দেখিয়েছেন সেটা মধ্যবিত্ত একটা পরিবারের মাধ্যমে। তাঁর অন্য আরেকটি সিনেমা 'সুবর্ণরেখা' (১৯৬৫), যেখানে দেশভাগে সকলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কিন্তু জাতিভেদ প্রথা তখনও বজায় ছিল; যখন ঈশ্বর (চরিত্রের নাম) জানতে পারেন অভিরাম নিচু জাতের (বাগদী সম্প্রদায়ের) তখন তিনি তার বোনের সঙ্গে বিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। ফলে দেশভাগও উচ্চবর্ণ আর নিম্নবর্ণের মধ্যে বিভাজনরেখা মুছে ফেলতে দেয়নি।

বাংলার উদ্বাস্তুদের নিয়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা লেখা হলেও বিভিন্ন গবেষকরা তথ্য সম্বলিত গ্রন্থও রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *উদ্বাস্তু* নামক গ্রন্থে[২৯] দেশভাগ নিয়ে আলোচনা, কতজন কীভাবে উদ্বাস্তুরা চলে এসেছিল সেটা তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়। তিনি যেহেতু একজন উদ্বাস্তু কমিশনের আধিকারিক ছিলেন ফলে তাঁর গ্রন্থে তথ্যভিত্তিক রচনা পাওয়া যায়। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী রচিত *প্রান্তিক মানব: পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনের কথা* (*The Marginal Men: The Refugees and the Left Political Syndrome in West Bengal*, ১৯৯০) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ।[৩০] তাঁর গ্রন্থে রাজনীতির ঘুঁটি-চালাচালির বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু নারীদের বিষয় তাঁর গ্রন্থে উপেক্ষিত।

জয়া চ্যাটার্জি তাঁর *বাংলা ভাগ হল: হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ-বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭* গ্রন্থে[৩১] প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীর বিপরীতে গিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের উগ্র জাতীয়তাবাদ দেশভাগ হয়েছিল সেটা তিনি দেখিয়েছেন।

গার্গী চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থ[৩২] *Coming Out of Partition: Refugee Women of Bengal*-এ শরণার্থী নারীর ব্যক্তিগত (private life) জীবন থেকে জনসাধারণে বেরিয়ে আসা নারীদের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেটাও সীমাবদ্ধ থাকে 'নীতা' নামক চরিত্রের মতো।

রূপ কুমার বর্মন রচিত *Partition of India and Its Impact On The Scheduled Castes of Bengal* গ্রন্থ[৩৩] থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে তফসিলী জাতি সম্প্রদায়ের দেশভাগের ইতিহাস জানা যায়, যেখানে তিনি দেশভাগের ইতিহাস চর্চা, ঔপনিবেশিক সময়ে তফসিলী জাতির কথা তুলে ধরেছেন, দেশভাগের পূর্বে তফসিলি জাতি-সম্প্রদায়ের অবস্থান, রাজনীতি, দেশভাগের সময় তথ্যসম্বলিতভাবে তাঁদের শরণার্থীর সংখ্যা, তাঁদের অভিজ্ঞতা, তুলে ধরেছেন। মরিচঝাপির ঘটনা তাঁর গ্রন্থে বিস্তারিত পাওয়া যায়।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুসূয়া বসু রায় চৌধুরী *In Search of Space : The Scheduled Caste Movement In West Bengal After Partition* গ্রন্থে[৩৪] দেশভাগের তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

অধীর বিশ্বাস *দেশভাগের স্মৃতি* গ্রন্থটিতে[৩৫] ব্রাত্যদের দেশভাগের অনুভূতি, কষ্ট-জর্জরিত ছবি তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থে ৩৮টি লেখায় আছে ব্যক্তিমানুষ ও রাষ্ট্রের সংঘাতের ইতিবৃত্ত। এই সংঘাত সাধারণত অভিজাতদের সঙ্গে দেশের হয়ে থাকে। কিন্তু একজন প্রান্তিক মানুষ কীভাবে রাজনীতিদীর্ণ দুটি রাষ্ট্রের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় পরিণত হয়ে ওঠেন, গ্রন্থটিতে সেটা পাওয়া যায়। তবে এখানেও দেশভাগে প্রান্তিক নারীরা ব্রাত্য থেকেছেন।

মধুময় পাল সম্পাদিত *দেশভাগ: বিনাশ ও বিনির্মাণ* গ্রন্থে[৩৬] বিভিন্ন নিম্নবর্ণের লোকের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম— অধীর বিশ্বাস, মনোরঞ্জন ব্যাপারী,

রাধিকারঞ্জন বিশ্বাসদের ভারতীয় হয়ে ওঠার কাহিনি, ক্যাম্পগুলিতে তাঁদের জীবনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন,কিন্তু নিম্নবর্গের নারীদের কথা অপ্রতুল।

সেমন্তী ঘোষ সম্পাদিত *দেশভাগ: স্মৃতি আর স্তব্ধতা* গ্রন্থে[৩৭] বিভিন্ন রকম ছোটগল্পে দেশভাগের কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থে জাগরী বন্দ্যোপাধ্যায় 'মেয়েলি জীবন, ভাগাভাগির পরের যুগ' নামক প্রবন্ধে উদ্বাস্তু শহুরে নারীদের পারিবারিক জীবন তুলে ধরেছেন। দীপেশ চক্রবর্তী দক্ষিণারঞ্জন বসুর দেশভাগের গল্প গুলিয়ে 'দেশ' বলতে কী বুঝায় তা নতুন মাত্রা এনে প্রকাশ করেছেন।

আশিস হীরা তাঁর *উদ্বাস্তু: ইতিহাসে ও আখ্যানে* নামক[৩৮] গ্রন্থটিতে— নমঃশূদ্র জাতি-সম্প্রদায় পূর্ববঙ্গের কী অবস্থা থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিল, তার এক না-বলা কথার ইতিহাস দেখতে পাই। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় দেশভগে নারীরা আরও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল সেটা এই গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

একবিংশ শতকের প্রথম দশকের শেষ দিক থেকে মতুয়া সম্প্রদায়ের বেশ কিছু লেখক-লেখিকারা তাদের লেখায় দেশভাগের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল, মঞ্জু বালা, কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, যতীন বালা, মনোহর মৌলী বিশ্বাস, ও মনোরঞ্জন বিশ্বাস। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেশভাগে প্রত্যক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের অভিজ্ঞতার কথা পাই না।

পূর্ব পাকিস্থানে ১৯৫২ সাল থেকে ভাষা আন্দোলনের পর থেকে স্বাধীন হওয়ার সংগ্রাম শুরু হয়। পূর্ব পাকিস্থান অশান্ত হয়ে উঠলে তা সাম্প্রদায়িক হিংসায় পরিণত হয়। ফলে ফরিদপুর, গোপালগঞ্জে বসবাসরত সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় তথা মতুয়াদের একাংশ নির্যাতিত হয় এবং আরও নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য ১৯৬৯ সাল থেকে তারা দেশ ছাড়তে শুরু করে বেশীরভাগ মতুয়ারা উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া জেলায় এসে উপস্থিত হয়। পরবর্তীতে যদিও তাঁদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পুরুষদের ঘেরাটোপে আলবদর, পাক বাহিনীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ভারতে তারা পাড়ি দেয়। কমিউনিস্ট সংগঠন সরকার গঠন অবধি তাঁদের নিয়ে বিচলিত থাকলেও তাদের সময়েই মরিচঝাঁপির মতো ঘটনা ঘটে। পূর্ব পাকিস্থান স্বাধীন

হলেও বাংলাদেশ সরকার তাদের শুধু মনে রেখেছে এমন একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে—যারা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে; তেমনি বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের শরণার্থী হিসাবে দেখেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বেশীরভাগ নিম্নবর্গের লোকজন দেশ ছেড়েছিল। ফলে তাঁদের নিয়ে ইতিহাসচর্চাও তাঁদের জীবনের মতো অবহেলিত থেকে গেছে।

Anthony Mascarenhas রচিত *The Rape of Bangladesh* গ্রন্থে[৩৯] পাকবাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করেছে সাধারণ মানুষকে, যা তিনি যুদ্ধের সময় প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বিশেষ করে নারীদের ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছিল। সংখ্যালঘু হিন্দুদেরকে যে বেছে বেছে হত্যা করা হয়েছিল, সেটা তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ সরকার প্রকাশিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিল পত্র*[৪০] নামে ১৫টি অধ্যায়ে ১১৬৭১ পৃষ্ঠায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা করলেও সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দু হিসাবে মতুয়া যে দেশ ছেড়ে গিয়েছিল সেটা ছাড়া তাঁদের কথা তেমনভাবে পাওয়া যায় না।

সাত্যকি হালদার রচিত *একাত্তরের রক্তস্মৃতি মহিলাদের মৌখিক বয়ান* গ্রন্থটি[৪১] সংখ্যালঘু নারীদের মুখে মুক্তিযুদ্ধের সময় ইতিহাস দেখার বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন, যা বর্তমান ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে সত্যিকারে মূল্যবান। তিনি ১৮ জন মুক্তিযুদ্ধ-দেখা নারীর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন অঞ্চলের নারীদের অবস্থা এই গ্রন্থে তুলে ধরলেও এদের মধ্যে কেউ মতুয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নারী নয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

আমার গবেষণার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল উনবিংশ শতক থেকে ২০১৬ সালের বিধানসভার নির্বাচন অবধি বাংলার মতুয়া নারীদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থান তুলে ধরা ও বিশ্লেষণ করা। উনবিংশ শতকে মতুয়া ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাঁদের সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা পেয়েছিল, তেমনি নিজেদের ধর্মীয় গুরুর মাধ্যমে সামাজিক কুসংস্কার রদ করে মেয়েদের ও শিক্ষার বিস্তার ঘটানো হয়েছিল তা সত্ত্বেও রাজনীতিতে তাঁদের অংশগ্রহণ কম কেন? সেটা খুঁজে বিশ্লেষণ করা। দেশভাগে উচ্চবর্ণের ন্যায় তাঁদের ও নিদারুণ বিভীষিকার মধ্যে গিয়ে যেতে

হয়েছিল, তা নিয়ে উচ্চবর্ণের ইতিহাস, নিম্নবর্ণের পুরুষদের ইতিহাস বর্তমান সময়ে রচিত হলেও তারা ইতিহাস থেকে ব্রাত্য কেন? মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ও মতুয়ারা শরণার্থী হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে, অনেকে থেকে যান, আবার একাংশ নতুন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে আশায় বুকবেঁধে চলে যান। তাঁদের বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি কেমন, সেটা গবেষণার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হবে। ১৯৯০ সালে মতুয়া মহাসঙ্ঘের প্রথম মহিলা শাখা শান্তি সত্যভামা নির্বাণ কমিটি গঠিত হয়, এবং তাঁর দুই বছর পর ১৯৯২ সালে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় তফসিলি নারীদের স্থানীয় স্তরে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হয়। জাতি সম্প্রদায় হিসাবে মতুয়া নারীরা এই ক্ষমতায়নের কতোটা গ্রহন করতে পেরেছে, সেটা তুলে ধরাই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

গবেষণার প্রকল্প ও প্রশ্ন

উচ্চবর্ণীয় সমাজব্যবস্থার প্রতি প্রতিবাদ জানিয়ে নিম্নবর্ণের মানুষ বিশেষ করে চণ্ডালরা মতুয়া ধর্ম প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সমাজে বেশ কিছু সংস্কার করেছিলেন। এই সংস্কার আন্দোলনে নারীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে মতুয়া আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিলেন। কাজেই এই সন্দর্ভের মূল প্রকল্প হল-মতুয়া সমাজের নারীদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চরিত্র বিশ্লেষণ করা। এই প্রকল্পকে সামনে রেখে আলোচ্য সন্দর্ভে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। যেমন-

ক. বাংলায় জাতব্যবস্থার বেড়াজালে (নমঃশূদ্র) মতুয়ারা কিভাবে অবমাননার শিকার হয়েছিলেন? একইসাথে নারীবাদী চিন্তনে মতুয়া নারীরা কেন উপেক্ষিত ছিলেন?

খ. ঔপনিবেশিক শাসনকালে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় মেয়েদের অবস্থা কেমন ছিল? প্রসঙ্গত নিম্নবর্ণের তথা মতুয়া নারীদের অবস্থা বা কেমন ছিল?

গ. দেশভাগ (১৯৪৭) ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর পর্বে (১৯৭১) মতুয়া নারীদের জীবন আখ্যানের চরিত্র কেমন ছিল?

ঘ. স্বাধীনোত্তর পর্বে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার (১৯৯২) মধ্য দিয়ে নারীদের তথা মতুয়া নারীদের ক্ষমতায়ন কি সম্ভব হয়েছিল?পারিবারিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁরা কি স্বাবলম্বী হতে পেরেছে?

গবেষণা-পদ্ধতি

গবেষণা-সন্দর্ভটিতে 'বাংলায় মতুয়া নারী বৃত্তান্ত' বিশ্লেষণমূলক (Qualitative) পদ্ধতিবিদ্যার সঙ্গে পরিমাণগত (Quantitative) পদ্ধতিবিদ্যার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণমূলক গবেষণার মধ্যে মূলত প্রাথমিক উপদান হিসাবে মতুয়া ধর্মের আকর গ্রন্থ হিসাবে পরিচিত, তারক চন্দ্র সরকার রচিত, *শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত* (ওড়াকান্দি, ফরিদপুর, পূর্ববঙ্গ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, ইং ১৯১৬ খ্রি.), মহানন্দ হালদার রচিত, *শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত* (বাগেরহাট, খুলনা, পূর্ববঙ্গ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, ১৯৪৩ খ্রি.) এবং প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর রচিত *আত্মচরিত বা পূর্বস্মৃতি* (ঠাকুরনগর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ)-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

মতুয়া পত্রপত্রিকা বিশেষ করে 'নমঃশূদ্র সুহৃদ', (১৯০৭-১৯২২), 'ঠাকুর নগর' (১৯৪৭-১৯৫০) প্রভৃতি পত্রিকার পাশাপাশি বর্তমান সময়ের পত্রিকা 'এই সময়', 'আনন্দ বাজার পত্রিকা', 'কালের কণ্ঠ' প্রভৃতি পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

ক্ষেত্র সমীক্ষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অঞ্চলে ব্যক্তিবর্গের সরাসরি সাক্ষাৎ নেওয়া হয়েছে।

মৌখিক ইতিহাস (Oral History) বর্তমান সময়ে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভিত্তিক উপাদান হিসাবে গুরুত্ব রয়েছে।

সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে সাধারণ থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মতুয়া ধর্মের সাথেও জড়িত বা মতুয়া ধর্মকে স্বধর্ম বলে মনে করেন।

পরিমাণগত পদ্ধতিবিদ্যার উপরও নির্ভর করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ববঙ্গ থেকে মতুয়া পরিবারগুলিও চলে আসতে বাধ্য হয়। তাঁদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের উদাসীনতা আমাদের চোখ এড়ায় না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মতুয়াদের ভোট ব্যাঙ্ক হিসাবে ভাবা হলেও নারীদের নিয়ে সেই রকম ভাবে কোন অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা হয় নি। সাক্ষাৎকার নেওয়ার মাধ্যমে তাঁদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা জানার চেষ্টা করেছি। ১৯৯২ সালে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় স্থানীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ও কতটা স্বাধীনভাবে তাঁদের সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন, পারিবারিক ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান, ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয় জানার জন্য মতুয়া অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে উত্তর ২৪ পরগনার, হাবড়া-১ ব্লকের কুমড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশীপুর

গ্রামের ১০০/৭১ ওয়ার্ড টি উপযুক্ত বলে বেছে নিয়েছি। এবং এই অঞ্চলের ৩০জন বিভিন্ন বয়স্ক মহিলার সাক্ষাৎকার নিয়েছি।

অন্যদিকে, বাংলাদেশে মতুয়া দের একাংশ এখনো রয়েছে যারা সংখ্যালঘু হিসাবে পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে বর্তমান সময় অব্দি তাঁদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থান জানার জন্য গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানি থানার সিঙ্গা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বয়সী ৩০ জন মহিলার সাক্ষাৎকার করেছি।

এবং বিশিষ্ট মতুয়া গবেষক হিসাবে পরিচিত কল্যাণী চাঁড়াল ঠাকুর, মনোহর মৌলী বিশ্বাসের সাক্ষাতকার নিয়েছি। কাশীপুর অঞ্চলের বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যাক্তি,মতুয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কুমড়া আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

মৌখিক ইতিহাস হল ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের পাঠ্য, বিমূর্ত ও ব্যাখাকারী পদ্ধতি যার জন্য একটি রেকডীং মেশিনের ওপর ভীষণভাবে নির্ভর করতে হয়। সেটা যান্ত্রিক হোক বা ইলেকট্রিক। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য এই নতুন ঐতিহাসিক নথিবদ্ধ করনের সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সব ইতিহাসই মৌখিক, কারণ অতীতকে কখনো প্রত্যক্ষ করা যায় না, ব্যক্ত করার কথা যখন লিপিবদ্ধ করা হয় একমাত্র তখনই তা তথ্য সম্বলিত ইতিহাসে রূপান্তরিত হতে পারে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

উক্ত গবেষণা পত্রটি বেশ কিছু কারণে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিশেষ করে মতুয়া একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়, সব নমঃশূদ্র দের যেমন মতুয়া (যদিও অধিকাংশ নমশূদ্রই মতুয়া ধর্মাবলম্বী) বলা যায় না, তেমনি মতুয়া বলতেও সব নমঃশূদ্র বোঝায় যায় না। পরিসংখ্যানগত তথ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় জাতি-সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে তথ্য থাকলেও তা মতুয়াদের পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য দেয় না।

দ্বিতীয়ত, মতুয়া ধর্মাবলম্বী নারীরা পুরুষদের অধীনে পরিবার দেখাশোনাই তাঁদের মুখ্য কাজ হওয়ায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে তেমন তথ্য পাওয়া যায় না।

তৃতীয়ত, দেশভাগে নমঃশূদ্র পুরুষদের দুর্বিষহ জীবন সম্পর্কে বর্তমান সময়ে বেশ কিছু দলিত লেখকদের লেখায় পরিসংখ্যান গত তথ্য উঠে আসলেও নারীদের সম্পর্কে সরকারী তথ্য জানা যায় না।

চতুর্থত, মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু হিন্দু হিসাবে মতুয়াদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরিসংখ্যান দিলেও, তাঁদের উপর যে অত্যাচার করা হয়েছে সেই সম্পর্কে সরকারী কোনও তথ্য পাওয়া যায় না।

এই সকল সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান গবেষণা-পত্রটির মাধ্যমে মতুয়া নারীদের সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

অধ্যায় বিভাজন

বর্তমান সন্দর্ভটিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। **ভূমিকাতে** গবেষণার প্রয়োজনীয়তা, সাহিত্য অভীক্ষা, উদ্দেশ্য, গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, গবেষণার উপাদান, পদ্ধতি ও প্রতি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে। **প্রথম অধ্যায়ে** জাতব্যবস্থার গোড়াপত্তন ও নারীবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট এবং দলিত নারীবাদী আন্দোলন বিষয়ক আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে স্বাধীনতার প্রাক্‌মুহূর্ত পর্যন্ত মতুয়া নারীদের অবস্থা পর্যালোচিত হয়েছে। উদ্বাস্তু ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর পর্বে কিভাবে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে মতুয়া নারীরা পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল এবং তাদের অবস্থা পর্যালোচিত হয়েছে সন্দর্ভের **তৃতীয় অধ্যায়ে**। **চতুর্থ অধ্যায়ে** লিপিবদ্ধ হয়েছে ১৯৯০ পরবর্তী সময়কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মতুয়া নারীদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনপ্রবাহ। সবশেষে উপসংহারে বাংলার মতুয়া নারীদের সার্বিক ইতিহাস তথা গবেষণার মূল বক্তব্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। সংযোজনীতে গবেষণার প্রাসঙ্গিক তথ্য, চিত্র, মানচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আর গবেষণায় ব্যবহৃত উপাদান ও সহযোগী উপাদানগুলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে গ্রন্থপঞ্জিতে।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ:

১. মনোহর মৌলী বিশ্বাস: *দলিত সাহিত্যের রূপরেখা*, (কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭)।

২. যতীন বালা: *দলিত সাহিত্য আন্দোলন*, (কলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া, ২০০২)।

৩. অনুপম হীরা মণ্ডল: *বাংলার ভাবান্দোলন ও মতুয়া ধর্ম*, (ঢাকা-১১০০, গতিধারা প্রকাশন, ২০১৪)।

৪. নন্দদুলাল মোহান্ত: *মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ*, (কলকাতা, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, ২০০২।

৫. মনোশান্ত বিশ্বাস: *বাংলায় মতুয়া আন্দোলন সমাজ সংস্কৃতি*, (কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০১৬)।

৬. কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল: *মতুয়া ধর্ম প্রসঙ্গে*, (কলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া, ২০১০)।

৭. শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়: *বাংলার নারী জাগরণ*, (কলকাতা, দৈনিক ভারত, সম্পাদক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, চৈত্র ১৩৫২, ১৯৪৫)।

৮. ছবি রায়: *বাংলার নারী আন্দোলন*, (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১৯৪৮)।

৯. Usha chakraborty: *Condition of Bengali women around the 2nd half of the 19th century*, (Calcutta, 1963, ASIN: B0184JLPW0)।

১০. বিনয় ঘোষ: *বাংলার নবজাগৃতি*, (নয়া দিল্লী ১১০০২, ওরিয়েন্টাল লংম্যান লিমিটেড, শ্রাবণ, ১৩৫৫)।

১১. *তদেব*,পৃ.১২।

১২. যোগেশ চন্দ্র বাগল: *বাংলার নব্য সংস্কৃতি*, (কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, মার্চ ১৯৫৮)।

১৩. রমাকান্ত চক্রবর্তী: *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*, (কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারী, ১৯৯৬)।

১৪. নির্মল কুমার গুপ্ত: *ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য*, (কলকাতা-৭০০০০৯, চৈত্র ১৩৬৮)।

১৫. ডঃ অজয়েন্দ্র নাথ সরকার: *উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বিতর্ক রচনা*।

১৬. শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: *বঙ্গ সাহিত্যে নারী* (কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, মাঘ ১৩৫৭)।

১৭. শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার: *বাংলাদেশের ইতিহাস*, (কলকাতা-১৩, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, পঞ্চমী, ১৩৬৪)।

১৮. বিনয় ঘোষ: *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)*, (কলকাতা, পাঠভবন, নভেম্বর ১৯৬।

১৯. বিনয় ঘোষ: *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)*, (কলকাতা, পাঠভবন, নভেম্বর ১৯৬০) ।

২০. গোলাম মুর্শিদ: *সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক*, (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর ১৯৭১) ।

২১. গোলাম মুর্শিদ: *সংকোচের বিহ্বলতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া (১৮৪৯-১৯০৫)*, (নিউ দিল্লি, সাহিত্য একাডেমী, ১৯৮৩) ।

২২. Meredith Borthwick: *The Changing Role of Women in Bengal (1849-1905)*, (New Jersy, Princeton University Press, 1984) ।

২৩. মঞ্জুশ্রী সিংহ: *ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বঙ্গমহিলা*, (কলকাতা-৭০০০০৯, প্রকাশক ডঃ পতিতপাবন সিংহ, ১১ই ডিসেম্বর ২০০০) ।

২৪. মালেকা বেগম: *বাংলার নারী আন্দোলন* (ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯) ।

২৫. মালেকা বেগম: *নারী মুক্তি আন্দোলন*, (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫) ।

২৬. সুফিয়া কামাল: *নারী জাগরণ ও মুক্তি*, (ঢাকা-২, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি, ১৯৮৬) ।

২৭. সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী: *অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকের ভদ্রমহিলা*, (কলকাতা-২৬, প্রকাশক স্ত্রী, ১৯৯৫) ।

২৮. রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়: *উনিশ শতকে নারী মুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য (১৮৫০-১৯০০)*, (কলকাতা-৯, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯)।

২৯. শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়: *উদ্বাস্তু*, (সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯)।

৩০. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: *প্রান্তিক মানব: পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনের কথা* (কলকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭) (*The Marginal Men: The Refugees and the Left Political Syndrome in West Bengal*, ১৯৯০) ।

৩১. জয়া চ্যাটার্জি: *বাংলা ভাগ হল: হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ-বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭* (অনুবাদ আবু জাফর, এল অ্যালমা পাবলিকেশনস, ১৯৯৯) ।

৩২. Gargi Chakraborty: *Coming Out of Partition: Refugee Women of Bengal*, (India, Srishti publisher and Distributors, 2007) ।

৩৩. Rup Kumar Barman: *Partition of India and Its Impact On The Scheduled Castes of Bengal*, (NEW DELHI-110002, ABHIJEET PUBLICATIONS, 2012, ISBN 978-93-81136-58-4)।

৩৪. Sekhar Bandyopadhyay and Anusuya Basu Ray Chowdhury: *In Search of Space : The Scheduled Caste Movement In West Bengal After Partition*, (Politics and Practices 59, ISSN23480297)।

৩৫. অধীর বিশ্বাস: *দেশভাগের স্মৃতি*, (কলকাতা, গাঙচিল, ২০১০)।

৩৬. মধুময় পাল (সম্পা.): *দেশভাগ: বিনাশ ও বিনির্মাণ*, (কলকাতা, গাঙচিল, জানুয়ারি ২০১১)।

৩৭. সেমন্তী ঘোষ (সম্পা.): *দেশভাগ: স্মৃতি আর স্তব্ধতা,* (কলকাতা, গাঙচিল, ১লা মার্চ, ২০০৮, ISBN-978-81-89834-47-0)।

৩৮. আশিস হীরা: *উদ্বাস্তু: ইতিহাসে ও আখ্যানে*, (কলকাতা, গাঙচিল, জানুয়ারি ২০১৯, ISBN978-81-938730-5-2)।

৩৯. Anthony Mascarenhas: *The Rape of Bangladesh*, (অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, ঢাকা-১১০০, পপুলার পাবলিশার্স, জুন ১৯৮৯)।

৪০. বাংলাদেশ সরকার: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র, (ঢাকা, বাংলাদেশ তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৯৫)।

৪১. সাত্যকি হালদার: *একাত্তরের রক্তস্মৃতি মহিলাদের মৌখিক বয়ান*, (কলকাতা, গাঙচিল, জানুয়ারি ২০১৯)।

প্রথম অধ্যায়

জাতব্যবস্থার গোড়াপত্তন ও নারীবাদী আন্দোলন

১.১ প্রাচীন কালে বর্ণ ভিত্তিক সমাজ ও অস্পৃশ্যদের অবস্থান

প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু সমাজ বর্ণ কাঠামো অনুযায়ী ছিল স্থিতিশীল এবং জটিল প্রতিষ্ঠান। বর্ণবাদী সমাজের প্রতিটি স্তরের সঙ্গে ধর্ম অতি নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত, বর্ণভেদের ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাসের সঙ্গে অসমভাবে ধর্মীয়-সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক প্রভাব, এমনকি রাজনৈতিক বিষয়টিও জড়িত। "ঋকবেদের দশম মণ্ডলের 'পুরুষসূক্ত'-এ বলা হয়েছে, ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রীয়, উরু থেকে বৈশ্য, এবং পা থেকে শূদ্রের উৎপত্তি"।[১] ভারতীয় হিন্দু সমাজ বর্ণকাঠামো দ্বারা নির্মিত। ফলে বর্ণব্যবস্থায় ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস বংশগত হয়ে দাড়ায়, শাস্ত্রগুলির অনুমোদনে বর্ণগুলি স্বতন্ত্র এবং অন্তগোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক কতকগুলি দলে বিভক্ত হয়। হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্রের বৈবাহিক আইনে বিবাহ হল 'অনুলোম' বিবাহ আর শাস্ত্রের মতের বাইরের বিবাহ হল 'প্রতিলোম বিবাহ'; প্রতিলোম বিবাহকারীগণ এবং বিবাহ জাত সন্তানসন্ততিগণ সমাজচ্যুত, ধর্মহীন এবং হীন মর্যাদার অধিকারী। বহু বছর ধরে পৃথক পৃথক বর্ণের মেলামেশা ও বিবাহের ফলে সহস্রাধিক বর্ণসংকর জাতির সৃষ্টি হয়েছে, তারা চতুর্বর্ণের বাইরে অবস্থান করে এবং তারা 'অন্ত্যজ' বর্ণহীন বা অবর্নের জাতি হিসাবে চতুর্বর্ণের শেষ বর্ণ শূদ্রের কাছেও হীন মর্যাদায় ভিন্ন ভিন্ন অস্পৃশ্য জাতি বলে প্রতিপন্ন হয়। এই সমাজ কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্য হল শুচি-অশুচির মানদণ্ডে প্রতিটি জাতির পদমর্যাদা নির্দিষ্ট হয়। "According to it, It is the Shudra who is born last. The Untouchable is outside the scheme of creation. The Shudra is Savarna. As against him the Untouchable is Avarna, i.e outside the Varna system. The Hindu theory of priority in creation does not and cannot apply to the Untouchable."[২] ব্রিটিশ সমাজ-নৃত্তত্ত্ববিদ এডমণ্ড লীচ (১৯৬০) এই কারণে জাতিব্যবস্থার পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এগুলি ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ, বংশ-পরম্পরায় কৌলিক পেশা অবলম্বন, সমকূলে বিবাহ, ভোজন সংক্রান্ত বিধিনিষেধ অনুসরণ, এবং অস্পৃশ্যতা।[৩]

প্রাচীনকাল থেকেই সমাজের উপর নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য ব্রাহ্মণগণ ধর্মশাস্ত্রগুলিকে নির্দেশিকা হিসাবে রচনা করেছেন, সর্বত্র আধিপত্যের নিরঙ্কুশ সুরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণকৃত গ্রন্থাদির শাস্ত্রীয় বিধানের প্রয়োগের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল ক্ষত্রিয়দের উপর। এইভাবে ধর্ম ও রাষ্ট্র যৌথভাবে শূদ্র আখ্যাপ্রাপ্ত জাতি সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় ব্রাহ্মণ্য সেবা ও রাজনুগত্যের নামে মানসিক, সামাজিক ব্যবস্থার করুণ ও নিষ্ঠুর নিয়মগুলি। উদ্বৃত্ত উৎপাদন এবং তৎসংশ্লিষ্ট শ্রমবিভাজন উচু-নিচু ভেদাভেদ অনুযায়ী নিচু স্তরের পেশার লোকেদেরকে অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য আখ্যা দেওয়া হয়। সামাজিক শ্রম-বিভাজনের ক্রমবর্ধমান এই 'হেয়তম' অথচ অতি প্রয়োজনীয় কায়িক শ্রমে নিযুক্ত মানুষেরা সমাজের দৃষ্টিতে চতুর্বর্ণের বাইরের অন্ত্যজ বা অবর্ন হিসাবে ধর্মশাস্ত্র প্রণেতাদের নির্দেশে বংশগত অবস্থানে রয়ে গেল, ক্রমোচ্চ বর্ণবিভাগে এঁদের উচ্চবর্ণে উত্তরণের কোনো সুযোগ ছিল না আর শাস্ত্র রইল না।[৪] বৈদিক যুগের পরবর্তী সময়ে বহিরাগত আর্যদের সাথে ভারতীয় উপজাতিদের মধ্যে সংমিশ্রণ প্রক্রিয়া চললেও অনার্য উপজাতির মধ্যকার কিছু গোষ্ঠী— যেমন নিষাদ, কিরাত, চণ্ডাল (ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রার ঔরসে সকল জাতির অধম চণ্ডালদের উৎপত্তি হয়েছে), অন্দ্র প্রভৃতি জাতিগুলিকে 'অস্পৃশ্য' শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছিল।[৫] অবর্ন বা অস্পৃশ্য জাতিগুলি শুদ্ধ-অশুদ্ধ এবং শুচি–অশুচি বিচারে মন্দিরে প্রবেশের অধিকার, এক পুকুরের জল নেওয়ার অধিকার, একসঙ্গে ভোজনের অধিকার ও শিক্ষা গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এমনকি উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের মানুষকে স্পর্শ করা বা তাদের হাতে জলগ্রহণ করাকে ঘৃণ্য বা অমর্যাদাকর বলে মনে করত। চতুর্বর্ণের বাইরে এই বিশাল সংখ্যক অস্পৃশ্য মানুষ তাদের সামাজিক অবস্থান, ধর্মীয় অধিকার স্থায়ী পরিচিতি (Identity) অর্জনের জন্য স্থানীয় ধর্মীয় মতাদর্শের ছত্রছায়ায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে সম্প্রদায় গত মর্যাদা বা সম্মানজনক অবস্থান অনুসন্ধান করেছে। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজস্ব সামাজিক, ধর্মীয় রীতি-নীতির স্বতন্ত্রতা অর্জন করতে চেষ্টা করেছে। যদিও সেগুলি হিন্দু সমাজের কিছুটা অনুকরণধর্মী তবুও প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতির সঙ্গে আদান-প্রদানের মাধ্যমে অবলীলাক্রমে স্বতন্ত্র ধর্ম-সংস্কৃতির কাঠামো নির্মাণ করেছে। তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে বর্ণহিন্দু সমাজের সংস্কৃতির একটা অংশ তারা তাঁদের মতো করে গ্রহণ করেছেন। তারা কখনো পুরোপুরি নিজেরদের স্থানীয় সংস্কৃতি ত্যাগ করে সম্পূর্ণ ভাবে উচ্চবর্ণের সংস্কৃতি গ্রহণ করেনি।

১.২ মধ্যযুগে বর্ণভিত্তিক সমাজ ও অস্পৃশ্যদের অবস্থান

ইসলাম ধর্মের প্রসার বাংলায় হলে অস্পৃশ্যরা সেই ধর্মকে গ্রহণ করলেও তাদের নিজেদের স্থানীয় দেবদেবী, আচার-সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ত্যাগ করেনি। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ইসলাম ধর্মের প্রসারের ক্ষেত্রে Richard M Eaton তাঁর গ্রন্থ *The Rise of Islam and The Bengal Frontier(1204-1760)*-এর[৬] 'Mass Conversion to Islam: Theroies and Protagonists' নামক অধ্যায়ে ধর্মান্তকরণের ক্ষেত্রে চারটি তত্ত্ব দিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল সুফীদের সহজসরল জীবন-দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্যরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। উচ্চবর্ণের ব্যক্তিবর্গের অত্যাচার ও নিপীড়নের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য। তারা নিজেদের মতো করে ধর্মীয় জীবন পালনের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় দেবদেবী সৃষ্টি করেছিল। ষোড়শ শতকে বাংলায় চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) ভক্তিবাদী বৈষ্ণব আন্দোলনের 'ভক্তি-প্রেম তত্ত্বে' সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। অস্পৃশ্য, দরিদ্র, অনাদৃত এবং প্রান্তিক হলেও ভক্তিবাদী বৈষ্ণব ধর্মের আঙিনায় ভক্তগণ সমমর্যাদার অধিকারী হয়েছিল। ভক্তি-বিতরণে, মুক্তিলাভে জাতি-কুল-বিদ্যা-বিত্ত-নির্বিশেষে পুরুষ এবং স্ত্রীলোক সকলেরই সমান অধিকার। সাধারণ মানুষের কাছে এটাই আত্মবিশ্বাস ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার মন্ত্র ছিল। মূলত ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম, শ্যামানন্দ, নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবাদেবী এবং নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্রের প্রচেষ্টা ও প্রেরণায় বর্ণবিন্যস্ত সমাজের নিচুস্তরের অস্পৃশ্যরা বৈষ্ণব ধর্মে প্রবেশ করে।

'চণ্ডালেহো মোহোর শরন যদি লয়।
সেহো মোর মুঞি তার জানিহ নিশ্চয়।।'

শুধু তাই নয় , 'কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ব বেত্তা সেই গুরু হয়।।'[৭]

এই চণ্ডাল জনগোষ্ঠী বাংলার এক বৃহত্তর অংশ জুড়ে চণ্ডাল বা চাঁড়াল বা চাঙ প্রভৃতি নামে অস্পৃশ্য হিসাবে পরিচিত ছিল। সংখ্যার দিক দিয়ে চণ্ডালরা পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে বড়ো জনজাতি আর সমগ্র বঙ্গপ্রদেশে তাঁদের স্থান ছিল দ্বিতীয় (৯.৮ শতাংশ)।[৮] প্রধানত, "পূর্বাঞ্চলের ৬ টি জেলায়, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর আর খুলনা ছিল চণ্ডালদের বসতি"।[৯] উত্তর-পশ্চিম

বাখরগঞ্জ ও বাগেরহাট মহকুমায়। সারা বাংলার চণ্ডাল জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই বাস করত এই নির্দিষ্ট অঞ্চলটিতে। কিন্তু অস্পৃশ্যতা বাংলার সমাজে কখনই খুব বড়ো সমস্যা ছিল না। ত্রয়োদশ–চতুর্দশ শতাব্দীর পুরাণে বাংলার চণ্ডালদের অন্ত্যজ এবং সংকর জাতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু সত্যি সত্যি তাদের অস্পৃশ্য বলে অবজ্ঞা করা হত কিনা তার কোনও ইঙ্গিত নেই। এমনকি ষোড়শ শতকের বাংলার সবচেয়ে গোঁড়া স্মৃতিকার রঘুনন্দনও চণ্ডালদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক এবং পংক্তি-ভোজন এড়িয়ে চলার কথা বলেছেন কিন্তু তাদের স্পর্শ সর্বতোভাবে এড়িয়ে চলতে হবে এমন কথা জোর দিয়ে বলেনি। ষোড়শ–অষ্টাদশ শতকের মঙ্গলকাব্যগুলিতে উল্লেখ আছে যে চণ্ডালরা গ্রাম বা নগরের মধ্যেই বাস করত। মনু যাদের অন্তেবাসী বলে বর্ননা করেছেন অর্থাৎ যারা গ্রাম বা নগর-সীমান্তের বাইরে বাস করে— চণ্ডালরা মোটেই তা ছিল না। এতদসত্ত্বেও বাংলায় উচ্চবর্ণের লোকেদের নানা ধরনের সামাজিক অবিচারের জন্য চণ্ডাল জাতি সহ অন্যান্য অস্পৃশ্য জাতি সম্প্রদায়ের বিরাট দূরত্ব তৈরি হয়।

১.৩ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে চণ্ডালদের অবস্থান

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষার মধ্যে দিয়ে এক নতুন ভদ্র শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় হিন্দু সমাজের কুসংস্কারগুলি দূরীভূত করা হয়েছিল (বিশেষ করে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ব্রিটিশ মিশনারী এবং প্রাচ্যবাদীদের)। তখনো বাংলার সমাজব্যবস্থায় অস্পৃশ্যতা বজায় ছিল। যদিও রামমোহন রায়, কেশব চন্দ্র সেন, ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদ প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং ব্রিটিশ সরকার ১৮৫০ সালের Lexi Loci Act (Castes Disabilities Removal act) জাতিভেদ বিলুপ্তির আইন পাশ করা থেকে শুরু করে ১৮৭২ সালের Special Marriage Act-এর মাধ্যমে বলার চেষ্টা করা হল, "যে-কোনো জাতি বা ধর্মের কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বৈধভাবে অন্য যে কোনো নারীর পাণিগ্রহন করতে পারবে, যদি তারা এই বিবাহকে আইনত নথিভুক্ত করে এবং সেইসঙ্গে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে তারা হিন্দু ধর্ম, ইসলাম, খ্রিস্ট ধর্ম বা ঐ ধরনের কোনো প্রচলিত ধর্মমতে বিশ্বাস করে না। প্রধানত কেশব সেনের অনুগামীদের চেষ্টায় এই আইনটি গৃহীত হয়"।[১০] ফলে এই জাতিভেদ প্রথা বিরোধী উদ্যোগ

ও আইন অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর জন্য তৈরি বা উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তার ফলস্বরূপ বাংলায় চণ্ডালদের মাধ্যমে আত্মমর্যাদার আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

বাংলায় হিন্দুধর্মের চার বর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বাইরে তাঁদের অবস্থান ছিল। শূদ্রদের সংকর জাতি হিসাবে ৩ তিনটি বিভক্ত করা হয়েছে। (১) উত্তম সংকর– ২০ টি জাতি (২) মধ্যম সংকর– ১২ টি জাতি এবং (৩) অধম সংকর জাতি। অধম সংকর হিসাবে ৯ টি জাতির কথা উল্লেখ করা হয় (মলেগ্রহি, কুডব, চণ্ডাল, বরুড়, তক্ষ, চর্মকার, ঘট্টজীবী, ডোলাবাহী, মল্ল)। তার মধ্যে চণ্ডালের স্থান ছিল তৃতীয়।[১১] আবার ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে একইভাবে শূদ্রদের তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে– (১) সৎ শূদ্র: ১৬ টি জাতি (২) অসৎ শূদ্র: ১৯ টি জাতি এবং অন্ত্যজ: ১০ টি জাতি (ব্যাধ, ভড়, কোল, কোঞ্চ, হাড়ি, ডোম, জোলা, বাগতীত, ব্যালগ্রাহী ও চণ্ডাল)। অন্ত্যজদের মধ্যে 'চণ্ডালদের' অবস্থান সর্বনিম্নে: তৃতীয়।[১২] অন্ত্যজদের স্পর্শ করা জল উচ্চবর্ণের লোকেরা পান করতেন না। বিংশ শতকের প্রথম দিকে বাংলার অন্ত্যজ বা অধম বর্ণগুলির ক্ষেত্রে অস্পৃশ্য জাতির পরিবর্তে 'অজল চল' জাতি হিসাবে গণ্য হত। ১৯২৯ সালে Indian statutory commission-এর নিম্নবর্ণের লোকেদের একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অস্পৃশ্য জাতিগুলির তুলনায় বাংলার নিম্নবর্ণের মানুষের সামাজিক অবস্থান তুলনামূলকভাবে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে ছিল। কিন্তু বাংলার ভদ্রলোক সমাজের মুখের ভাষায় এবং ব্যবহারে বারবার অস্পৃশ্যতার অহংকার এবং শ্লেষ উঠে আসত। যেমন 'চাঁড়াল' দুর্বত্ত, নরাধম, অতি অধম । **ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা চণ্ডালদের ধর্মীয় সামাজ**িক ক্রিয়া করমে অংশ নিতেন না, যে-সমস্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা অংশ নিতেন তাঁরাও জাতিচ্যুত হতেন এবং 'চাঁড়ালের বাওন' বলে ঘৃণিত হতেন'।[১৩]

ইংরেজ ঔপনিবেশিক সরকার নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা তৈরি করতে থাকলে জাতি বিভাগ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়, সমাজে নতুন পেশার সৃষ্টি হল, যার ভিত্তি যোগ্যতা। এর ফলে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে নতুন পেশাভিত্তিক জাতি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। "কৃষিজীবী হিসাবে চিহ্নিত বৃহৎ বৃহৎ আকারের জাতিগুলি ছিল রাজবংশী, নমশূদ্র (চণ্ডাল), পৌণ্ড্র, বাগদি, ভুঁইমালী, বাউরি, বেলদার, ভোক্তা, কাউরা, পালিয়া, কোটাল ইত্যাদি। অন্যদিকে দোয়াই, গোনরি, জেলিয়া, কৈবর্ত, মালো, কান্দ্রা, মাল্লা, পাটনি, তিয়র, ঘাসি, বিন্দ প্রভৃতি জাতিগুলি ছিল মূলত মৎস্যজীবী। চর্মকারের কাজে নিযুক্ত ছিল মুচি ও দাবগারগন। পান ও চৌপালদের প্রথাগত কাজ

ছিল কাপড় বোনা। ধোপারা নিযুক্ত ছিলেন কাপড় ধোওয়ার কাজে। ঝাড়ুদার বা মেথরের কাজে নিযুক্ত ছিল কয়েকটি সম্প্রদায় (হালালখোর, হাড়ি, মেথর, লালবেগি)।"[১৪]

"সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) উত্তরকালে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের রীতিনীতির বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করতে চায়নি, বরং বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক জাতিভেদযুক্ত সামাজিক শাসন আইনত বৈধ এবং বিভিন্ন বর্ণের স্তরভেদ দেশীয় সমাজের গুরুত্বপূর্ণ একক হিসাবে মেনে নিয়ে ছিলো। কিন্তু ভারতের (১৮৭২) সময়কাল থেকে বিভিন্ন বর্ণের সম্প্রদায়গুলির সামনে তাঁদের বর্ণপরিচয়ের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় এবং সামাজিক স্থায়ী পরিচিতি অর্জন এবং উক্ত বর্ণের আদি উৎস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নতুন চর্চার উদ্ভব হয়। এই সময়বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে নিজস্ব সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ইতিহাস অনুসন্ধানই জাতি সচেতনতার একটি পরিমণ্ডল তৈরি করেছিল। বিশেষত অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের স্থায়ী পরিচিতি নিয়ে যে টানাপোড়ন বা জটিলতা ছিল তার উৎস ছিল মনু রচিত আইন সংহিতা এবং বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র, যাতে চতুর্বর্ণের বাইরের সম্প্রদায়গুলিকে বর্ণহিসাবে কোন স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এঁদের অবর্ণ, পঞ্চম জাতি, অতিশূদ্র, অস্পৃশ্য, বলা হতো"।[১৫] বাংলায় অস্পৃশ্যতার মাত্রা অবশিষ্ট ভারত থেকে কম হলেও পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলের চিত্র ছিল আলাদা। অধম সংকর জাতিদের সাথে উচ্চবর্ণের সুবিধাভোগীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিরাট দূরত্ব ছিল। উচ্চবর্ণের মানুষ মুখে সর্বদাই 'অজল-চল' বা অস্পৃশ্যতার পক্ষপাতী ছিল।

১.৪. চণ্ডালদের আন্দোলন

সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উচ্চবর্ণের ঘৃণা ও শোষণের প্রতিবাদে সর্বপ্রথম চণ্ডালদের সংগঠিত প্রতিবাদ শুরু হয় ১৮৭২-৭৩ সালে ফরিদপুর-বাখরগঞ্জ অঞ্চলে। এই অঞ্চলের বিশিষ্ট গ্রামীণ নেতার মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উঁচুজাতের লোকেরা আসতে অস্বীকার করে। উচ্চবর্ণের লোকেদের অভিযোগ ছিল— ১) চণ্ডালদের মহিলারা যথেচ্ছভাবে হাটে বাজারে যায় ২) জেলখানায় ঝাড়ুদারের কাজ করে, নোংরা পরিষ্কার করে। উচ্চবর্ণের লোকেদের এই অবজ্ঞা ও অসম্মানজনকভাবে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করায় চণ্ডাল গ্রামপ্রধানগণ একটি সভা করে, সিদ্ধান্ত নেয়: ১) মহিলারা হাটে বাজারে যাবে না। ২) উচ্চবর্ণের কৃষিকাজে, ঘর ছাউনি দেওয়ার অথবা অন্য

কোনোরকম কাজে উঁচুজাতের লোকেদের সঙ্গে কোনোরকমভাবে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে। তাঁদের সঙ্গে সমস্ত রকম সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। মূলত এই আন্দোলনের কোনও রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল না, এটা ছিল 'এক প্রকার সামাজিক বন্ধ' বা সামাজিক বয়কট আন্দোলন। এই আন্দোলন অবশ্য বেশীদিন চালিয়ে নিয়ে যাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর এই প্রথম অসাফল্যের পরেই এদের মধ্যে উদ্ভব হয় এক সংগঠিত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের। বৈষ্ণব ধর্মানুরাগী হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮) প্রতিষ্ঠা করেন মতুয়া ধর্মের। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার সাফলিডাঙ্গা গ্রামে হরিচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। এই আন্দোলন ছিল তৎকালীন সময়ে ব্রাহ্মণ্যবিরোধী, জাতপাত-বিরোধী, সামাজিক মর্যাদার দাবীতে এই ধর্মের সূচনা হয়েছিল। তারক চন্দ্র সরকার রচিত *শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত* গ্রন্থে তাই পাওয়া যায়—

হরিবোলা দেখে উপহাস করে যত।
সবে বলে ও বেটারা হরি বোলা ম'তো
কেহ বলে জাতি নাশা সকল মতুয়া।
দেশভরি শব্দ হ'ল মতুয়া মতুয়া।।
অন্য কেহ যদি হয় হরিনামে রত।
সবে করে উপহাস অই বেটা ম'তো।।
অন্য অন্য গ্রাম আরোকাঁদি ওঢ়াকাঁদি।
সেই হইতে হ'য়ে গেল মতুয়া উপাধি।।
তাহা শুনি ভেবে প্রভু হরিচাঁদ।
ভিন্ন সম্প্রদায় মোরা মতুয়া আখ্যান।।
বেদ বিধি নাহি জানে না মানে ব্রাহ্মণ
নিশ্চয় করিতে হবে এ দলে শাসন।...
...হরিধ্যান, হরিজ্ঞান, হরিনাম সার,
প্রেমেতে মাতোয়ারা 'মতুয়া' তার নাম।।
'ব্রহ্মকে জানিলে হয় ব্রাহ্মণ উপাধি,

বৈষ্ণবে ভজনা করে বিষ্ণু নিরবধি।
নামি হতে নাম বড় জান সমাচার,
নাম পরে অধিকার একা 'মতুয়ার'।।
নামে প্রেমে মাতোয়ারা মতুয়ারা সব,
কথায় ব্রাহ্মণ লাগে কিসের বৈষ্ণব।
কথায় ব্রাহ্মণ দেখ, কোথায় বৈষ্ণব,
স্বার্থ বসে অর্থলোভী যত ভণ্ড সব।
স্বার্থশূন্য নামে মত্ত 'মতুয়া'গণ
ভিন্ন সম্প্রদায় রূপে হইবে কীর্তন।।[১৬]

উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে বোঝা যায় যে 'মতুয়া' শব্দটি এসেছে 'মত্ততা' বা 'মাতোয়ারা' থেকে। অর্থাৎ নাম-সংকীর্তনে মত্ত থাকার কারনে 'মতো' শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রাম্য ভাষায় ব্যাঙ্গার্থে 'মতো' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। 'মতুয়া' সম্পর্কে হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রপৌত্র প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের অভিমত হল— শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের নামে ও প্রেমে যাহারা মাতোয়ারা তাঁহারাই 'মতুয়া' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।[১৭] মতুয়া সাহিত্যিক কপিল কৃষ্ণ ঠাকুরের মতে, "নামে প্রেমে মাতোয়ারা এবং প্রচলিত ধ্যানধারণায় যাদের বিশ্বাস নেই, কিংবা চলতি প্রথায় বিরোধী যারা তাঁরাই মতুয়া"।[১৮] নন্দদুলাল মোহান্ত বলেছেন, 'শক্তি-ভক্তি-প্রেমেতে মাতোয়ারাই মতুয়া'।

হরিচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৭-১৯৩৭) মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগুরু হিসাবে ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক সংস্কার ও উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অন্যান্য বৈষ্ণব গুরুদের মতন তিনিও প্রচার করেছিলেন ব্যক্তিগত ভক্তি, জাতিভেদের অবসান ও সর্ব-সাম্যের মতাদর্শ । এই ধর্মীয় আন্দোলন যত এগোতে থাকে ততই কিন্তু এর মধ্যে চেতনার দুটি স্তর এবং কার্যাবলীর দুটি ধারা প্রকট হয়ে উঠতে থাকে— এর একটি হল সম্ভ্রান্ত নেতৃবৃন্দের যাদেরকে 'অস্পৃশ্য অভিজাত' বলা যেতে পারে। আর অন্যটি হল তাঁদের কৃষক অনুগামীদের। নেতৃবৃন্দের প্রধান দাবি ছিল দাবি ছিল পুরনো অসম্মানজনক 'চণ্ডাল' নামের পরিবর্তে তাঁদের নতুন 'নমশূদ্র' নামের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন। ১৯১১ সালের আদমশুমারিতে শেষ পর্যন্ত এই চণ্ডাল নাম মুছে যায়। নিজেরদের বর্ধিত সামাজিক এবং ধর্মীয় পদ মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা

করার জন্য যেসব পৌরাণিক উপাখ্যানের অবতারণা তারা করেছিলেন তার প্রত্যক্ষ উপাদান ছিল সেই হিন্দু শাস্ত্র। হরিচাঁদ ঠাকুরকে 'পূর্ণব্রহ্ম' 'বিষ্ণুর অবতার' ও 'চৈতন্যের রূপ' এবং গুরুচাঁদ ঠাকুরকে 'শিব অবতার' হিসাবে দেখতে লাগলেন। যে-আন্দোলন ব্রাহ্মণবিরোধী ও জাতপাত-বিরোধী হিসাবে শুরু হয়েছিল সেই আন্দোলন ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্মের অনুকরণ করতে শুরু করে। একইরকম প্রচেষ্টা দেখা যায় যুগীদের (যোগী) মধ্যেও। হিন্দু সমাজের মধ্যে যুগীরা একটি নিচু জাতি হিসাবে পরিগণিত হত। এঁরা গোরক্ষনাথ নামে এক সাধুর অনুগামী বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন, ধর্মপূজা করতেন এবং মৃতদেহ দাহ না করে তাকে কবর দিতেন। তাঁতের কাজই এঁদের কৌলিক জীবিকা ছিল। ১৮৭৭-৭৮ সালে এই যুগী জাতির প্রায় চল্লিশজন লোক নিজেদের প্রাচীন হিন্দু যোগীদের বংশধর বলে দাবি করেন, ও উপবীত ধারণ করতে আরম্ভ করেন। বিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে যুগীদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন এবং স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করার চেষ্টা দেখা যায়। ১৯০৫ সালে 'যোগীসখা' নামে এঁদের সমাজের মুখপাত্র প্রাকাশিত হতে থাকে। ১৯২১ সালে লোকগণনার সময় যুগীদের পুরোহিতরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেন, এবং দশ বৎসর পরে সমস্ত যুগী জাতিই ব্রাহ্মণত্বের দাবি করেন। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী,কোচ প্রভৃতি উপজাতির লোকেরাও ঊনবিংশ শতাব্দীতে নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেন, এবং অপেক্ষাকৃত উন্নতশীল রাজবংশীরা আরো অগ্রসর হয়ে হিন্দু গোত্রনাম গ্রহন ও উপবীত ধারণ করতে আরম্ভ করেন। প্রাচীন ভারতের হূন-গুর্জররা বোধ হয় এইভাবেই তাঁদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১৯]

ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে যে সামাজিক আন্দোলনগুলি হয়েছিল সেগুলির কোনোটাকেই জাতিভেদ-বিরোধী বলা যায় না। জাতিভেদ প্রথাকে স্বীকার করেই তার কাঠামোর ভিতর আপন আপন জনজাতির মর্যাদা আপেক্ষিকভাবে বৃদ্ধি করা এই সব আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। সমাজে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য এরা সকলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, কেউই ব্রাহ্মণদের চেয়ে উচ্চে নিজেদের স্থান করে নেবার চেষ্টা করেননি। বরং যারা নিজেদের জন্য উচ্চতর জাতি মর্যাদা দাবি করতেন, তাঁরা অনেক সময় ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চতর জাতিদের অনুকরণে নিজেদের সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন ও কিছুটা ঘটাতেন। বাল্যবিবাহ প্রবর্তন, মেয়েদের অবরোধ প্রথা স্বীকার, বিধবাবিবাহ বর্জন, অপবিত্র মাংসাহার ত্যাগ ইত্যাদি সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির উপায় হিসাবে স্বীকৃতি হত। যদিও

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়[২০] চণ্ডালদের সামাজিক আন্দোলনকে ভিন্ন চোখে দেখেছেন— তিনি বলেছেন, এম. এন. শ্রীনিবাসনের 'Sanskritisation' বা সংস্কৃতায়নের যে তত্ত্ব আছে তা দিয়ে চণ্ডালদের সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য যে কাজগুলো করত সেটা দিয়ে এই তত্ত্বকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না। তার কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন তাতে এই তত্ত্বে প্রতিবাদের দিকটিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়। আসলে এই নিম্নবর্ণের লোকেরা যা করেছিল তা হল ক্ষমতার প্রতীক কতকগুলি চিহ্নকে ধারণ করে সেগুলিকে অর্থহীন করে দেওয়া। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিক থেকে উচ্চবর্ণের জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ময়মনসিংহের গারোদের পাগলাপন্থী বিদ্রোহ (১৮২৫-১৮২৭, ১৮৩২-৩৩), ওয়াহবি আন্দোলন (১৮৩১) ফরাজি আন্দোলন (১৮৩৮-৪৮) প্রভৃতি আন্দোলন বা বিদ্রোহগুলো উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে ছিল এবং প্রতিবাদস্বরূপ ধর্মীয় ভাবনার দিকে অগ্রসর হয়েছিল।[২১] চণ্ডালদের প্রতিবাদের ধরনটা প্রথম ছিল সেটা বলা যায় না, প্রচলিত সমাজ থেকে তারা সেটা গ্রহণ করে ধর্মীয় ভাবনার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। নেতৃবর্গ যে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল 'অস্পৃশ্য অভিজাত' শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠেছিল তাঁরা কিন্তু নমঃব্রাহ্মণ বলে নিজেদের পরিচয় দিতে দ্বিধা করেনি।[২২]

রূপকুমার বর্মন তাঁর *জাতি রাজনীতি জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক* [২৩] গ্রন্থে জানিয়েছেন শ্রীনিবাসের সংস্কৃতকরণের ধারণাটি অবশ্য সম্পূর্ণ নতুন নয়। রিসলিসাহেব প্রচারিত G*radual Brahmanising of non-Aryan or casteless tribes* বা আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের *'Progressive Sanskritization'* ধারণার মধ্যেও সমাজের নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁরা (শ্রীনিবাস সহ) কেউই নিম্নবর্ণীয়দের কৃষ্টিকরণ/ সংস্কৃতকরণের পেছনের চালিকাশক্তির কথা অনুধাবন করতে পারেননি। কেন তাঁরা কৃষ্টিকরণের পথে গিয়েছিলেন? এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন এ. আর. দেশাই (*Social Background of Indian Nationalism*) ও নৃপেন্দ্র কুমার দত্ত।

১৯০৫ সালে মতুয়া ধর্মীয় সম্প্রদায় স্বদেশী আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। ১৯১২-১৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সরকার পূর্ববঙ্গে দরিদ্র ও পিছিয়ে-পড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথাগত শিক্ষা বিস্তারের তাগিদে ৯ লক্ষ ৪২ হাজার ২০০ টাকা অনুদান দেয় এবং পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র ছাত্রদের জন্য ওড়াকান্দি, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, ও বরিশালে হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করা

হয়।[২৪] ইতিমধ্যে গুরুচাঁদ ঠাকুর নিম্নবর্ণের মানুষের রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষা ও আইন সভায় নিম্নবর্ণের প্রতিনিধি প্রেরণের প্রয়োজনীতা অনুভব করেন। দেশ শাসন ও আইন প্রণয়নে মুসলিমদের দাবি মেনে নেওয়ার পর ইংরেজ সরকারের নিকট গুরুচাঁদ ঠাকুর একইরকম দাবি নিয়ে যুক্তি ও চাপ সৃষ্টি করেন। ইংরেজ সরকার সে-দাবীও বিবেচনা করতে বাধ্য হয়। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে নিম্নবর্ণের রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়। ১৯২১ বাংলার বিধান পরিষদে ১৩৯ জন সদস্যদের মধ্যে দুইজন ছিলেন নিম্নবর্ণের সদস্য, ভীষ্মদেব দাস এবং নিরোধ বিহারী মল্লিক মনোনীত হন। এঁদের মধ্যে ভীষ্মদেব দাস প্রত্যক্ষভাবে মতুয়া আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং নিরোধ বিহারী মল্লিক ছিলেন গুরুচাঁদের স্নেহধন্য।[২৫] গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনের (১৯৩০) সময় থেকেই প্রথম কংগ্রেসের অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং নিম্নবর্ণের মানুষের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার দানের জন্য 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন নিম্নবর্ণের মানুষের একটি অংশকে কাছে টানতে সমর্থ হয়েছিল। বাংলার ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৯৩৩ সালে কলিকাতার কালীঘাটের মন্দিরের নিম্নবর্ণের লোকেরা প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। "১৯৩০–এর গোড়া থেকেই নমশূদ্র নেতৃত্ব সাংবিধানিক রাজনীতিতে খুব বেশী জড়িয়ে পড়তে থাকেন। 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'-কে তাঁরা স্বাগত জানালেন, পুনা চুক্তিকে নিন্দা করলেন এই বলে যে তা 'ডঃ আম্বেদকরের রাজনৈতিক ভুল'"।[২৬] আবার পরে, অকংগ্রেসি বর্ণহিন্দুরা এই চুক্তির সমালোচনা শুরু করলে, এর সমর্থনে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হন। তবে এটা ছিল 'প্রয়োজনের চাপে, স্বেচ্ছায় নয়', কারণ এর ফলে তাঁরা পৃথক নির্বাচনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। এইভাবে নেতারা ক্রমশ প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক হয়ে উঠলে তাঁদের মধ্যে গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বও শুরু হয়ে যায় এবং ১৯৩১-এর পর থেকে আমরা দুটি সংগঠনকে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখি। যে-সমস্ত সুযোগ সুবিধা এই সংগঠনগুলি দাবী করছিল তাতে দরিদ্র গ্রামীণ শ্রেণীর উপকার হবার সম্ভবনা ছিল খুবই কম, কারণ সেগুলি কাজে লাগানোর মতো বিদ্যা বা সঙ্গতি তাঁদের ছিল না। ফলে এই আন্দোলনে গণ-আবেদনও ক্রমশ কমতে থাকে। মতুয়ারা বা নমঃশূদ্ররা তপশিলি জাতি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। "১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে The Government of India (Scheduled Caste) Order গৃহীত হওয়ার পর থেকে তপশীলি জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়ে চলেছে। ১৯৩৬ সালে বাংলায় ৭৬ টি জাতিকে তপশিলি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৩৭ সালে গুরুচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যুর পর মতুয়া-প্রভাবিত

নমঃশূদ্র আন্দোলন সামাজিক-রাজনৈতিক দিকে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যোগদান করলেও নিম্নবর্ণের লোকেদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার উন্নয়নের প্রশ্নে অনুন্নত শ্রেণীর উপযুক্ত সংরক্ষণকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে অন্যান্য নিম্নবর্ণের সঙ্গে ঐক্যমত ছিল। নমঃশূদ্র রাজনীতির এই বাস্তব দিকগুলি সুভাষচন্দ্র ও শরৎ বসু সতর্কতা ও গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করতেন এবং প্রভাবশালী মতুয়া নেতৃত্ব প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সহিত সুসম্পর্ক রেখে চলতে থাকেন। ১৯৩৮ সালের ১৩ই মার্চ কলিকাতার আলবার্ট হলে গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রথম মৃত্যবার্ষিকীতে স্মরণ সভায় কংগ্রেসের নব নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু গুরুচাঁদ ঠাকুরকে 'অতিমানব' বলে অভিহিত করেন (মনোশান্ত, ২৪৫)। ১৯৪২ সালের ১৫ই জানুয়ারি Independent Scheduled caste party-র মিটিং-এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মন্ত্রীসভায় তিনজন তপশিলি মন্ত্রী নিয়োগের প্রস্তাব, তিনজন পরিষদীয় সচিব নিয়োগ, তপশিলি ছাত্রদের জন্য শিক্ষাখাতে ৫ লক্ষ টাকা বার্ষিক অনুদান মঞ্জুর এবং তপশিলি জাতির জনসংখ্যার অনুপাতে চাকরীতে সংরক্ষণ প্রস্তাব 'শ্যামা-হক' মন্ত্রিসভা না মানলে তাঁরা তপশিলি সদস্যদের সমর্থন হারাবে। ১৯৪৩ সালের ২৮ মার্চ ফজলুল হক পদত্যাগ করলে 'শ্যামা-হক' মন্ত্রীসভার অবসান হয়। ২৪ এপ্রিল ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগ 'Independent Scheduled Caste Party'-র তিন দফা দাবী মেনে নিলে ২০ জন তপশিলি পরিষদীয় সদস্য খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগকে সমর্থন জানান এবং ১৩ সদস্যের মন্ত্রীসভায় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, প্রেমহরি বর্মণ এবং মুকুন্দ বিহারী মল্লিকের ভাই পুলিন বিহারী মল্লিক তিনজন তপশিলি মন্ত্রিসভার সদস্য হন। এর পর 'কৃষি বিল' সংক্রান্ত ভোটাভুটিতে ৯৭-১০৬ ভোটে নাজিমুদ্দিন সরকারের পতন ঘটে। তখন গভর্নর শাসন ভার গ্রহন করেন। ১৯৪৫ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তপশিলীদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে 'বিচার, আইন, এবং পূর্ত ও গৃহনির্মাণ' মন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রী সভায় যোগ দেন। ১লা মে ১৯৪৬ সালে কেন্দ্রে অন্তর্বর্তী সরকারের আইন মন্ত্রী নিয়োগের আগে পর্যন্ত তিনি মন্ত্রী সভায় আসীন ছিলেন এবং সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রী সভা চালিত সরকার ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল থেকে দেশ স্বাধীন ও বঙ্গভাগ প্রস্তাব সময়কাল পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

অন্যদিকে প্রমথরঞ্জন ঠাকুর দেশভাগ ও বঙ্গবিভাগের সমর্থক ছিলেন না। তিনি সংযুক্ত বাংলা এবং ভারতের একটি প্রদেশ হিসাবে, বাঙ্গালীদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব সম্পন্ন ঐক্য চেয়েছিলেন।

তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল যে সমস্ত তপশিলিদের প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁরা সবাই পাকিস্থানের ঘোর বিরোধী। মণ্ডলকে তিনি আহ্বান জানান বাংলার মুসলিম লীগ নেতাদের বোঝাতে যে, বাংলাকে পাকিস্থান তৈরি করার প্রস্তাব বাতিল করে ভারতের সঙ্গে অখণ্ড বাংলাপ্রদেশ স্থাপনের যেন চেষ্টা করেন।[২৭] যদিও সীমানা নির্ধারণ পুনর্বিবেচনা করার জন্য তপশিলী নেতাগণ বিভিন্ন প্রস্তাব দিলেও সেটা বিফলে যায়।

১৯৪৭ সালের আগস্টে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, খুলনা ও বরিশালের বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ দাঙ্গায় বহু হিন্দু আক্রান্ত হন, নারীর সম্মানহানি, অবাধে হত্যা, ও ধর্মান্তকরণ চলতে থাকে। প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর নমঃশূদ্রদের জীবন, সম্মান, ও ধর্মান্তকরণ রোধ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার জন্য আবেদন জানানো ছাড়া তাঁদের আর কোনও দিশা দেখাতে ব্যর্থ হন। পূর্ববঙ্গে তার শেষ জনসভা নড়াইলের জমিদার বাড়ী প্রাঙ্গনে হাজার হাজার অনুগামীদের মাঝে দেওয়া বক্তব্যে 'পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার' ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সভা শেষে তার রামদিয়ার বাড়িতে পুলিশি হানার খবর পেয়ে তিনি বাড়ি না গিয়ে কলিকাতার 'বেঙ্গল বোডিং'–এ চলে আসেন। মতুয়ারা তখনো আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল, নিজ জন্মভূমিতে ধর্ম, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা না থাকলেও গৃহ ও একটুকরো জমিই ছিল তাঁদের পরিচিতির প্রকৃত স্বত্ব, সাধারণ নিরক্ষর চাষী মজুরদের পক্ষে বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন ছেড়ে আসা সহজ ছিল না। তাছাড়া ফেডারেশনপন্থী নেতৃত্ব যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল, মুকুন্দ বিহারী মল্লিক, জগবন্ধু মণ্ডল, ধনঞ্জয় রায় প্রমুখ কর্তৃক ভারতে না আসার জন্য বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতির মাধ্যমে বোঝানো হয়। ফলত উদ্বাস্তু হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার বিষয়ে ও মতুয়ারা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর পরিচালিত মতুয়া মহাসঙ্ঘের অনুগামীগণ ও সবাইক একত্রিত ভাবে পূর্ব ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। তবে মতুয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অভিভাবক হিসাবে বাংলা ভাগের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিজ জন্মভূমিতে ধর্ম, সম্পদের নিরাপত্তাহীনতা, নারীদের সম্মান ও প্রান বাঁচানোর তাগিদে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর তাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিশেষত মতুয়া সাধু গোঁসাইদের চিঠি পত্র ও টেলিগ্রাম প্রেরণের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্থান ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে

চলে আসার জন্য আহ্বান জানান। সেদিন হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ লক্ষ হিন্দুরা তাঁদের সর্বস্ব ত্যাগ করে সীমান্ত পার হয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পাড়ি দিয়েছিল।

১.৫. দেশভাগ পরবর্তী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মতুয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধারাবাহিক ক্ষমতার সম্পর্ক

পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুরা বিশেষ করে মতুয়ারা যারা দেশভাগের পর ও পূর্ব বঙ্গে থেকে গিয়েছিল, ১৯৫০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারির পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয় নিজেই পালিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিলেন।[২৮] একদিকে ১৯৫০ সালে নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি,[২৯] অন্যদিকে ১২টি জেলায় দাঙ্গা[৩০]— ফলে তখন থেকে তাঁদের পশ্চিমবঙ্গে আগমনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতেই থাকে। রাজনৈতিকভাবে পূর্ববঙ্গে তাঁদের হয়ে কথা বলার মতো কেউ ছিল না। ১৯৬৯ সালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হয়ে গোপালগঞ্জের বিশিষ্ট মতুয়া ধর্মানুরাগী বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস গণপরিষদ নির্বাচনে তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধির জন্য আসনসংখ্যা চাইলে তৎকালীন সময়ে আওয়ামী লীগের শেখ মুজিব বলেন, 'পারিস তো আলাদা দল করে নির্বাচন কর'।[৩১] পূর্ববঙ্গে মতুয়ারা সংখ্যালঘু হিসাবে প্রধান রাজনৈতিক দলের কাছে গুরুত্ব কী ছিল সহজেই অনুমেয়। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় তাঁদের শরণার্থী হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আগমন হয়। ১৯৭৫ সালের পর থেকে বিভিন্ন শাসকের তত্ত্বাবধানে জিয়াউর রহমান (১৯৭৭-১৯৮১), হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ (১৯৮৩-১৯৯০) বাংলাদেশ 'ইসলামিক রাষ্ট্রের' দিকে ধাবিত হতে থাকে আর সংখ্যালঘু হিসাবে বিশেষত মতুয়ারা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয়। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলার সদস্য হিসাবে বেশ কিছু মতুয়া ধর্মানুরাগীরা নির্বাচিত হলেও মতুয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে সংসদে নির্বাচিত প্রতিনিধি নেই।

অন্যদিকে, প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান ঠাকুরনগরে কম দামে জমি কিনে 'ঠাকুর ল্যান্ড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লি:' নামে একটি পুনর্বাসন কলোনি তৈরি করেন এবং ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের মধ্যে প্লট আকারে জমি বণ্টন করেন। পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মতুয়ারা ধাপে ধাপে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়। প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর নতুন করে মতুয়া মহাসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বরাবর কংগ্রেসের সমর্থক তথা সাংসদ সদস্য ও ছিলেন। ১৯৬৪ সালে

কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙনের সময় তিনি বাংলা কংগ্রেস দলের সহ-সভাপতি রূপে যোগদান করেন। পরবরতিতে যদিও তার রাজনৈতিক স্বেচ্ছাবসরের পর মতুয়াদের নিয়ে রাজনৈতিক ভাবে কংগ্রেস ভাবেনি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আসা শরণার্থীদের কিছু অংশ পরবর্তীতে ফিরে গেলেও একাংশ পশ্চিমবঙ্গে থেকে যান। ১৯৭৭ সালের সংরক্ষিত নির্বাচনী কেন্দ্রে বাংলার মতুয়ারা বামফ্রন্টকে সমর্থন জানিয়েছিল। কারণ তৎকালীন সময়ে '১৯৬০-এর দশক থেকে উদ্বাস্তু সমস্যা, দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা বিরোধী আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন প্রভৃতি নানা রকম সমস্যা নিয়েও আন্দোলনের মাধ্যমে উদ্বাস্তুদের কাছে টানতে সাহায্য করেছিল । যদিও মরিচঝাপি(১৯৭৯)-র মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনা বামফ্রন্ট আমলে ঘটেছিল। ২০০৮ সালের মধ্যবর্তী সময় থেকে বর্তমান শাসক দলের মুখ্যমন্ত্রী মতুয়াদের কাছে পাওয়ার চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে মতুয়া মহাসঙ্ঘের নেতৃত্বের মধ্যে ধর্মীয় সামাজিক উন্নয়নের তাগিদে রাজনৈতিক কৌশলগত পরিবরতন ঘটে। মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারন সম্পাদক গণপতি বিশ্বাস ৫ই জানুয়ারি ২০০৮ সালে বলেছিলেন, 'আমরা কোনও রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে নই। যারা আমাদের উন্নয়ন করবে আমরা তাঁদের পক্ষে।' তবে মতুয়া মহাসঙ্ঘের এই রাজনৈতিক অবস্থান স্থায়ী ছিল না ২০০৯ সালের সেশের দিকে মতুয়া মহাসঙ্ঘ এবং বর্তমান শাসক দলের মধ্যে যোগ সাধন সম্পন্ন হয়। ২০১১ ও ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন, এবং ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করতে পারি। ২০১০ সালে বীণাপানির দেবীর নেতৃত্বে মহাজাতি সদনে 'চাই নাগরিকত্ব চাই, চাই জাতিপত্র'-র দাবীর অবস্থানে রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি বলে দেয় ভোট-রাজনীতিতে তারা কত গুরুত্বপূর্ণ।[৩২] ভারতীয় ভোটের রাজনীতিতে জাতি সম্প্রদায় কতোটা গুরুত্ব রয়েছে সেটা সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষক গবেষণা করেছেন। বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও তার ছোঁয়া লক্ষ করা যায়। 'জাতিভেদের বিরুদ্ধে একটি কথা না বলেও শ্রেণীচেতনা দিয়ে সাম্য-সন্ধান বামপন্থীদের যে এক ব্যর্থ প্রয়াস তা একজন সাধারণ মানুষেরও আজ বোধের অতীত নেই'।[৩৩] ভারতীয় রাজনীতিতে তথা রাজ্য রাজনীতিতে মতুয়ারা ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর কাছে গুরুত্ব পেলেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে মতুয়াদের স্থানীয় ক্ষেত্রে ছাড়া সংসদীয় রাজনীতিতে বর্তমান সময়েও উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। ফলে দুই দেশে রাজনীতিতে দুই রকম অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। একদিকে সংখ্যালঘু হিসাবে তেমন গুরুত্ব

নেই, আবার অন্যদিকে জাতি-সম্প্রদায় হিসাবে এবং ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে তাঁদের গুরুত্ব ভোট রাজনীতিতে লক্ষ করা যায়।

তবে এই জাতি সম্প্রদায় হোক বা ধর্মীয় সম্প্রদায় বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হোক, সম্প্রদায়ের বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নারীদের ক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রসঙ্গে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোকেই বজায় রেখেছে। সংখ্যালঘু নারী হিসাবে একটা বয়সের পর (ছেলে-মেয়ে বড়ো হবার পর, ৪০-৪৫ বছর বয়স্ক) স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করে। ভারতের ক্ষেত্রে, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নারীদের ক্ষমতায়ন দিলে ক্ষমতার উপরিভাগে থাকে পরিবারের কেউ অথবা রাজনৈতিক দলের পুরুষ।

১.৬. নারীবাদী আন্দোলনের সূচনা

বর্তমান সময়েও মতুয়া নারীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে সেটা অস্বীকার করা যায় না। যদিও ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইউরোপে ১৮৪৮ সালে 'Seneca Falls Convention'-এর[৩৪] মধ্যে নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বের যে সূচনা হয়েছিল ভোটাধিকারের দাবিকে কেন্দ্র করে, তা চরিত্রগত দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা। এই পর্বের আন্দোলনগুলি তদানীন্তন গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহিলাদের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলন হিসাবে গড়ে উঠেছিল। উত্তর-ফরাসী বিপ্লব সময়ে এই আন্দোলনগুলি সমাজের প্রতিটি স্তরে পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে নারীদের সমবেত প্রতিবাদের মঞ্চ হয়ে ওঠে। একই সময়ে বাংলায় তখন সতীদাহ প্রথা রদ হয়েছে, বিধবাবিবাহ চালু করা জন্য বিদ্যাসাগর প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। সমাজের সর্বাধিক নিষেধাজ্ঞা ও বৈসাম্যের বেড়াজাল ভেঙে আত্মপ্রতিষ্ঠার আধিকার স্থাপনের জন্য আন্দোলন কোনও দেশেই শুধুমাত্র নারীজাতির দ্বারা সম্ভব নয়, উনিশ শতকের বাংলায় তো একরকম তা অসম্ভব ছিল। কারণ এই আন্দোলন একান্ত নারীবাদী স্বয়ম্ভু কোনও ব্যাপার নয়। যে-কেউ মানবেন সামাজিক পরিবেশ, কাঠামো এবং সম্পর্ক আন্দোলনের পরিবেশ জানার পক্ষে ভীষণ জরুরি। না-হলে বোঝা যাবে না কেন একটি রক্ষণশীল, জাতিভেদে-ছিন্নভিন্ন, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারে মোড়া, সাম্প্রদায়িক, শিক্ষার জগতে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢাকা, বিন্দুমাত্র

অর্থনৈতিক অধিকার না-থাকা অবস্থায় নিজদেশে ঔপনিবেশিক পরিবেশে ঐতিহ্য বনাম প্রগতির লড়াই লক্ষ করা যায়।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই উচ্চবর্ণের নারীদের কংগ্রেসের সভায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এইভাবে উচ্চবর্ণের নারীরা ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্যোগে পুরুষদের সহযাত্রী হয়ে ওঠে। নারীরা শরিক হওয়ার ফলেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং গান্ধীর রাজনীতি বৈধতা পেয়েছিল। নারী-আন্দোলনকারী ও জাতীয় স্তরের নেতারা দাবি করেন দেশের সমগ্র নারী-সমাজই এই আন্দোলনের সামিল হয়েছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর মহিলারাই ছিল সংখ্যায় বেশী। গান্ধীজির মতাদর্শের মধ্যেই এই সীমাবদ্ধতা নিহিত আছে। তিনি দেশের পবিত্র পৌরাণিক কাহিনিগুলিই টেনে এনেছিলেন, যা সবই হিন্দুধর্মের। যার ফলে হিন্দু নারীদের এমনকি দরিদ্র, নিম্নবর্গ ও অশিক্ষিত নারীদের নামও অনুরণিত হত সীতা, সাবিত্রী বা দয়মন্তির সঙ্গে, কেননা তাঁরা ছিলেন পুরুষদের কাছে জীবন্ত চরিত্র।

১৯৪০ এর দশকে জাতীয় আন্দোলন ও ভারতীয় নারীর যে চিত্রটি তৈরি হছিল তা সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। বাম রাজনীতির শক্তি বৃদ্ধি তার অন্যতম একটি কারণ। দেশভাগজনিত কারণে উচ্চবর্ণের শিক্ষিতা নারীদের এইসময় ঘর থেকে বেরিয়ে সংসারের হাল ধরতে দেখা যায়। 'মেঘে ঢাকা তারা' সিনেমার নীতা চরিত্রটি বাস্তবিকভাবে উচ্চবর্ণের শিক্ষিতা নারীদের অবস্থান তুলে ধরে। কিন্তু নিম্নবর্ণের নারীদের কথা সেইভাবে পাওয়া যায় না। ইতিহাস-লেখক থেকে শুরু করে চলচিত্রকার— সবাই উচ্চবর্ণেরই চরিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান মেয়েদের সমানাধিকার দিয়েছে একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে, এবং রাজ্যগুলিকে ক্ষমতা দিয়েছে এ-বিষয়ে সদর্থক ভূমিকা পালনের। সংবিধান মেয়েদের সমান আইনি সুরক্ষা, সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করেছে, জনপরিসরে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করেছে। ৫০-এর দশকে পরপর বেশ কিছু আইন পাশ করে হিন্দু পার্সোনাল আইনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়, যাতে সম্পত্তি, উত্তারাধিকার বা বিবাহ-সংক্রান্ত অধিকারের প্রশ্নে মেয়েদের অধিকার বাড়ে। ১৯৫৫-৫৬ সালে হিন্দু পরিবার বিষয়ক বিভিন্ন সংস্কারের জন্য চারটি আইন প্রনয়ন করা হয়। হিন্দু বিবাহ আইন (১৯৫৫), হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অ্যাক্ট (১৯৫৬), হিন্দু দত্তক ও খোরপোষ আইন (১৯৫৬), এবং হিন্দু নাবালক ও অভিভাবকত্ব আইন (১৯৫৬)।

১৯৬০ দশকের সময় থেকে নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় ঢেউ লক্ষ করা যায়। পশ্চিমের দেশগুলিতে এক নতুন নারীবাদের অভ্যুত্থান হল, যার মূল বিষয়: নারী-নির্যাতনে পরিবারের ভূমিকা। এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি নিয়ে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হল যার সঙ্গে যুক্ত হল উপনিবেশিক সমস্যা এবং 'উন্নয়ন বনাম বণ্টন' সংক্রান্ত বিতর্ক। এইসময় নারীবাদী তত্ত্ব ও আন্দোলনে লিঙ্গ(Gender), যৌনতা (Sexuality), জাতি, ভাষা, শ্রেণীগত দিক থেকে নারীর পার্থক্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হিসাবে দেখা দেয়। ১৯৭৪ সালে ভারত সরকারের 'সমতার দিকে' (Towards Equality) নামক রিপোর্টে যা দেখা যায় তা চমকে দেওয়ার মতো। এই রিপোর্টে বলা হয় ভারত সরকারের লিঙ্গগত সমতা প্রতিষ্ঠার অধিকার অর্জন করা যায়নি।[৩৫]

১৯৭৫-১৯৮৫ আন্তর্জাতিক নারী দশক হিসাবে ঘোষিত হয়। নারীদের 'কল্যাণমূলক' ব্যবস্থার তুলনায় 'উন্নয়নমূলক' ব্যবস্থার প্রতি জোর দেওয়া হয়। বিভিন্ন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, ও আয় করার ক্ষমতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রকল্প নেওয়া হয়। এই সময়েই অর্থাৎ ১৯৮০ থেকে দলিত নারীরা পুরুষ ও মূলধারার নারী আন্দোলন থেকে পৃথকভাবে তাঁদের কথা শোনানোর জন্য সংগ্রাম করছিলেন। দলিত পুরুষ ও মূলধারার নারী আন্দোলন থেকে পৃথক ভাবে তারা তাঁদের নিজস্ব নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে শুরু করেন। ১৯৮৭ সালে ব্যাঙ্গালোরে দলিত নারীদের প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৪ সালে গঠিত হয় সারা ভারত দলিত নারী মঞ্চ[৩৬] জাতীয় দলিত নারী ফেডারেশন (NFDW-National Fedaration of Democratic Women) তৈরি হয় ১৯৯৫ সালে। ঐ বছরই NFDW বেজিং-এ অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপুঞ্জের চতুর্থ আন্তর্জাতিক নারীসম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। সেখানে উপস্থিত শতাধিক ভারতীয় নারীর মধ্যে দলিত নারীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। 'দলিত নারীরা কষ্টকে শক্তিতে পরিণত করছেন' শীর্ষক একটি আলোচনাও হয়। এইভাবে ১৯৯০-এর দশক থেকেই দলিত নারীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সংগঠিত হতে শুরু করে। ১৯৯৫ সালে দলিত গবেষক ও অধ্যাপক গোপাল গুরুর 'দলিত নারীর ভিন্নভাবে কথা বলেন' নামের একটি লেখায় নারী আন্দোলনের মধ্যে দলিত নারী প্রশ্নটি বিশেষত্ব নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর AIDWA(All India Democratic Women's Association) আয়োজিত অস্পৃশ্যতা ও দলিত নারীর উপর নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটি

কনভেনশনে নানা অতিথি বক্তা, AIDWA কর্মী ও সমর্থকদের পাশাপাশি পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ থেকে আসা বিভিন্ন দলিত নারী সমাবেশ হয়। বিভিন্ন পরিবেশ থেকে আসা বিভিন্ন বয়সের, নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও আইনি অধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন স্তরের সচেতন দলিত নারীরা বিভিন্ন মাত্রার আবেগ নিয়ে তাঁদের সমস্যা ও সংগ্রামের অভিজ্ঞতার কথা বলেন।[৩৭] কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ করলে বোঝা যাবে যে, এই দলিত নারীদের মঞ্চে বাংলা থেকে কোনও প্রতিনিধি আসেনি। তার মানে বাংলায় দলিত নারী নেই? যদি থেকেই থাকে তাহলেও কি দলিত নারীদের প্রতিনিধি নেই কেন ?

১৯৮২ সালে সাবলটার্ন স্টাডিজ নামে নিম্নবর্গের মানুষের চোখে ইতিহাসকে দেখার এক সমান্তরাল পাঠ রচনা করলেন রণজিৎ গুহ। ১৯৮৩ সালে সাবলটার্ন স্টাডিজ সম্মেলন ও আট খণ্ডে সংকলিত 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' প্রকাশের ঘটনা এই ইতিহাস-চর্চার নিরবছিন্ন প্রবাহপথটি চিহ্নিত করে, আমাদের প্রথাগত ইতিহাস থেকে সমাজের অনেক কথায় যা জানা যায় না।[৩৮] বিশ শতকের ছয়ের দশক পর্যন্ত ইতিহাস-চর্চার বেশ কয়েকটি ধারা পরিলক্ষিত হয়। যেমন— পৌরাণিক ইতিহাস চর্চার ধারা, জাতীয়াতাবাদী ইতিহাস চর্চার ধারা, কেমব্রিজ-অক্সফোর্ড ইতিহাস চর্চার ধারা, সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস চর্চার ধারা, মার্কসবাদী ইতিহাস চর্চার ধারা, নতুনভাবে সংযোজন করা হয় সাবলটার্ন ইতিহাস চর্চার ধারা। মার্কসবাদী ইতিহাস চর্চার ধারা শ্রেণীপ্রসঙ্গ নিয়ে কথা বললেও আলাদা করে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পরিচিতি খুঁজে পাওয়া গেল না, আবার তাতে নারী-সমাজের কথা পুরোপুরি উপেক্ষিত থাকল। একইরকমভাবে সাবলটার্ন ইতিহাস চর্চার ধারা কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা তুলে ধরার চেষ্টা করলেও নিম্নবর্ণের নারীরা তাতেও উপেক্ষিত থেকে গেল। যদিও নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে, পার্থ চট্টোপাধ্যায় রচনা করলেন *Community, Gender and Violence (Subaltern Studies XI)*, Columbia University Press (April 15, ISBN- 9780231123150) কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে জাতি-সম্প্রদায়গতভাবে নারীদের সমস্যা, সামাজিক বাঁধন, অর্থনৈতিক অধীনতার কারণ, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা তুলে ধরার চেষ্টা করেননি। নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার বাইরে থেকে শর্মিলা রেগে নারীবাদী ভাবধারায় রচনা করলেন *Caste and gender: the violence against women in India*, European University Institute, 1996;*Sociology of Gender: The Challenge of Feminist Sociological*

Thought, SAGE Publications India, 2003 ও *Writing Caste Writing Gender: Reading Dalit Women's Testimonios* , publishers- zubaan, 2006.

উল্লেখিত গ্রন্থগুলোতে শর্মিলা রেগে বিশিষ্ট দলিত মহিলাদের আঞ্চলিক ভাষায় প্রদত্ত বিবৃতি সন্নিবেশিত করেছেন, এবং অংশ-বিশেষের অনুবাদের মাধ্যমে ইংরেজি পাঠকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সম্পূর্ণ দলিত নারীদের ইতিহাস না হলেও, সমাজকে দলিত নারীরা কী চোখে দেখেন এবং তাঁদের সামাজিক অবস্থান ও সম্প্রদায় সম্পর্কে উচ্চবর্ণ আরোপিত ধ্যানধারনা গুলিকে কীভাবে তারা বিরোধিতা এবং পুনর্মূল্যায়ন করেন তার পরিচয় তিনি তাঁর গ্রন্থগুলিতে তুলে ধরেছেন।

১৯৯২ সাল থেকে বাংলায় দলিত নামে মতুয়া তথা নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা শুরু হয়। দলিত নারী হিসাবে আম্বেদকার ভাবধারায় অনুপ্রানিত হয়ে কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল নীড় পত্রিকার মাধ্যমে দলিত নারীদের কথা তুলে ধরতে শুরু করেন। তাকে যোগ্য সঙ্গ দিয়েছেন মনোহর মৌলী বিশ্বাস, কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, যতীণ বালা, মঞ্জু বালা, পুস্প বৈরাগ্য প্রমুখ মতুয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লেখক লেখিকারা। তাঁদের লেখায় দেশভাগে নারীদের অভিজ্ঞতার কথা জানা যায় এবং হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুর নারীদের যে ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন সেটা সম্পর্কে জানা যায়। কিন্তু মতুয়া নারীদের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান তাঁদের রচনা মাধ্যমে জানা যায় না।

১.৭. পর্যবেক্ষণ

প্রাচীন কালের জাতি ব্যবস্থার ফলে বাংলার নিম্নবর্ণের মানুষেরা শোষিত, অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়েছে। উনিশ শতকে তার ব্যতিক্রম ছিল না। এই জাতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে। এবং নতুন ধর্মীয় মতের আবির্ভাব ঘটে। ধীরে ধীরে নিম্নবর্ণের মানুষেরা তাদের প্রতি বৈষম্য হচ্ছে তাঁরা বুঝতে পারে কিন্তু টা সত্ত্বেও দেখা যায় বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে সেই জাতি ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। এবং উচ্চবর্ণের সংস্কৃতির ন্যায় নিজের নারীদের পূর্বে যে স্বাধীনতা ছিল সেটরা বাধা হয়ে দাড়ায়। ইউরোপে নারীবাদী আন্দোলনের রেশ ধরে বাংলায়ও উচ্চবর্ণের নারীরা সামাজিক , রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশ গ্রহন করতে শুরু করে। তাঁদের মতামত পারিবারিক ক্ষেত্রে মর্যাদা পেতে শুরু করে। কিন্ত নিম্নবর্ণের নারীরা ধর্মীয় ব্যতীত সব ধরনের অধিকার হারিয়ে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। উচ্চবর্ণের নারীরা লেখনীর মধ্যে দিয়ে তাঁদের অবস্থা নিজেদের মতো বলতে পারলেও নিম্নবর্ণের নারীদের ক্ষেত্রে তাঁদের হয়ে কেউ এগিয়ে আসেনি।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. দীপঙ্কর চক্রবর্তী: *নারী সমস্যা নারী মুক্তি*, (কলকাতা, 'অনীক', সংখ্যা ৩-৪, Sep-Oct, ২০১৩), পৃ. ৩০।

২. B.R. Ambedkar: *Writtings and Speeches' Vol-vii*, (Education Dept. Govt. of Maharastra, 1990), পৃ. ২৭৯।

৩. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ দাশগুপ্ত: *জাতি, বর্ণ ও বাঙালী সমাজ,* (icbs, ISBN 81-7074-170-X, জানুয়ারি ১৯৯৮), পৃ. ৭।

৪. সুকোমল সেন: *ভারতের সভ্যতা ও সমাজ বিকাশে ধর্ম, শ্রেণী ও জাতিভেদ*, (কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১৯১২), পৃ. ১২৭।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২।

৬. Richard M Eaton: 'Mass Conversion to Islam: Theroies and Protagonists', *The Rise of Islam and The Bengal Frontier(1204-1760)*, (University of California Press, july 1996)।

৭. হিতেশরঞ্জন সান্যাল: *বাঙলা কীর্তনের ইতিহাস*, (কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৮৯), পৃ. ৫১।

৮. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পা.): *জাতি, বর্ণ ও বাঙালী সমাজ*, (দিল্লি, আই সি বি এস, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮)।

৯. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়: *উন্নয়ন, বিভাজন ও জাতি: বাংলায় নমঃশূদ্র আন্দোলন, ১৮৭২-১৯৪৭*, পৃ. ১২৭।

১০. অধ্যাপক অমিতাভ মুখোপাধ্যায়: *জাতিভেদ প্রথা ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ*, (কলকাতা ৭০০০১২, কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানি, ১৯৮১), পৃ. ৬০-৬১ ।

১১. নীহাররঞ্জন রায়: *বাঙ্গালী হিন্দুর বর্ণভেদ*, (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়) পৃ. ৮৯-৯০ ।

১২. *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৯২-৯৪ ।

১৩. Sekhar Bandyopadhyay: *Caste, Protest And Identity In Colonial Bengal: The Namashudras Of Bengal, 1872-1947*, p. 17-18।

১৪. স্বপন কুমার বাগ (সম্পা.), রূপ কুমার বর্মণ: *বাংলার নিম্নবর্ণীয় (তফশিল) মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান, বিকাশ ও বর্তমান পরিস্থিতি*, ('অন্তরমুখ' বাংলা গবেষণা পত্রিকা, পরব-৩, সংখ্যা-৩, জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৪), পৃ. ১০৯।

১৫. মনোশান্ত বিশ্বাস: *বাংলার মতুয়া আন্দোলন— সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি*, (কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, মে ২০১৬), পৃ. ২৩ ।

১৬. তারক চন্দ্র সরকার: *শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত*, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, (খুলনা, মতুয়া মিশন, শ্রী পদ্মনাভ ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত, ১৪২১ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৬৭ ।

১৭. প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর: *আত্মচরিত বা পূর্বস্মৃতি*, (ঠাকুরনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৯৯৫), পৃ. ১০২

১৮. কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর: *গুরুচাঁদ ও অন্ত্যজ বাংলার জাগরণ*, (কলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া, ১৯৯৮), পৃ. ১ ।

১৯. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়: *জাতিভেদ প্রথা ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ*, পৃ.পৃ. ২৪-২৫ ।

২০. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়: 'উন্নয়ন, বিভাজন ও জাতি: বাংলায় নমঃশূদ্র আন্দোলন, ১৮৭২-১৯৪৭',. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পা.): *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ*, (দিল্লি, আই সি বি এস, ১৯৯৮), পৃ. ১৩১ ।

২১. সুপ্রকাশ রায়: *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, (কলকাতা, ডি এন বি ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৬৬) পৃ-১৩ ।

২২. আনন্দনাথ রায়: *ফরিদপুরের ইতিহাস*, (কলকাতা, দে'জ, প্রথম প্রকাশ ২০০৬), পৃ. ৪৫৪

২৩. রূপ কুমার বর্মন: *জাতি–রাজনীতি,জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান(*কলকাতা, অ্যালফাবেট,২০১৯)পৃ.২৭ ।

২৪. Sekhar Bandyopadhyay: *Caste, Politics And The Raj: Bengal, 1872-1937*, (Calcutta, 1991), p. 56 ।

২৫. কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর: *কৃষক আন্দোলনে গুরুচাঁদ ও মতুয়া সমাজ,* (ঢাকা, 'গণমুক্তি' ১ম বর্ষ, মহা বারুণী সংখ্যা, ২০০৮), পৃ. ০৩ ।

২৬. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৩০ ।

২৭. কপিল কৃষ্ণ বিশ্বাস: *৪৭-এর বঙ্গভঙ্গ ও প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর,* (নিখিলভারত, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০০৭), পৃ. ১১ ।

২৮. ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ: *১৯৫০: রক্ত রঞ্জিত ঢাকা বরিশাল এবং,* (কলকাতা, কোডেক্স, প্রথম প্রকাশ), পৃ. ২২ ।

২৯. শ্রী দেবজ্যোতি রায়: *কেন উদ্বাস্তু হতে হল,* (কলকাতা, প্রকাশক: শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস, ২০০১) পৃ.১৬ ।

৩০. দীনেশচন্দ্র সিংহ: *প্রাগুক্ত,* পৃ.৪৩ ।

৩১. তপন বাগচী (সম্পা.): *আনন্দনাথ রায়ের ফরিদপুরের ইতিহাস ১ম ও দ্বিতীয় খণ্ড,* (কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল, ২০০০), পৃ. ৩২৪ ।

৩২. Prasknava Sinharay: *Caste, migration and identity*, http://www.india-seminar.com/2013/645/645_praskanva_siharay.htm

৩৩. মনোহর মৌলী বিশ্বাস: *দলিত সাহিত্যের রূপরেখা,* (কলকাতা, প্রকাশক অবীন্দ্রনাথ বেরা, প্রথম প্রকাশ ২০০৭), পৃ. ১৫০ ।

৩৪. সঞ্চারী রায় মুখার্জি: 'নারীবাদী আন্দোলন', রাজশ্রী বসু, বাসবি চক্রবর্তী: *প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা,* পৃ. ৬৩ ।

৩৫. দেবী চ্যাটার্জী: *দলিত নারী: বেঁচে থাকার সংগ্রাম,* (অণীক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৩, সম্পাদক দীপঙ্কর চক্রবর্তী), পৃ. ৭৪ ।

৩৬. *তদেব* পৃ. ৭৭

৩৭. *তদেব* পৃ. ৭৮

৩৮. পার্থ চট্টোপাধ্যায়: 'নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস', গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.) *নিম্নবর্গের ইতিহাস,* (কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫), পৃ. ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

মতুয়া নারীদের অবস্থা (১৮৭২-১৯৪৬)

২.১. উচ্চবর্ণীয় নারীদের সামাজিক অবস্থা

... হিন্দুরা তাঁদের ঘরের নারীদের প্রতি যে ধরনের বিদ্বেষ পোষণ করতে অভ্যস্ত তাঁর চেয়ে বেশি বিদ্বেষ পোষণ করা সম্ভব নয়। ...তাঁদের জন্য বরাদ্দ চরম অমর্যাদা, তাঁরা বঞ্চিত পবিত্র গ্রন্থ, শিক্ষা ও পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে।...স্ত্রী তাঁর স্বামীর সঙ্গে খাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত- এমন অদ্ভুত বর্বরতা হিন্দুস্থানে দেখা যায়।[১]

উপরের উল্লেখিত বক্তব্যটি প্রাচ্যবাদী ঐতিহাসিক জেমস মিল তাঁর *History of British India*- নামক গ্রন্থে ভারতীয় নারীদের সম্পর্কে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং তিনি বলেছেন- হিন্দু সমাজের অধঃপতন এবং হিন্দু মেয়েদের শোচনীয় অবস্থার জন্যই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের 'সুরক্ষা ও হস্তক্ষেপ' প্রয়োজন।[২] প্রাচ্যবাদীদের এই বক্তব্য দেওয়ার সময় বাংলার সমাজে নারীদের অবস্থা কেমন ছিল? সমাজ ব্যবস্থায় তখনো সতীদাহ প্রথা, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ, পর্দা প্রথার[৩] মতো কুপ্রথাগুলির দ্বারা নারীদের জীবন দুর্বিষহ ছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদের রীতিনীতি নারীদের মনে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে, সতী হওয়ার জন্য অনেক সময় নারীরাই উৎসাহী হত। সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী তার *অন্দরে-অন্তরে* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, বারুইপুরে ও চব্বিশ পরগণাতে স্বেচ্ছায় সতী হওয়ার ঘটনা অযৌক্তিক ছিল না। সতীদাহতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পাশাপাশি আত্মীয় স্বজনরাও খুব খুশি হতেন।সতী হওয়া নারী নিজের 'পুণ্যি অর্জিত' হবে ভেবেও অনেক সময় সতী হতেন।[৪]

এই ধর্মীয় বাঁধন আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তাদের সতীদাহের প্রতি মোহ করে তুলেছিল। তাদের হয়ে কথা বলার মতো কেউ ছিল না। তারা নিজেরাও কখনো কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ টুকু করেনি। সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ইংরেজ সৃষ্ট শিক্ষিত ভদ্রলোক উনিশ শতকে বেশ কিছু ব্যক্তি এবং ইউরোপীয় খ্রিস্টান মিশনারীদের চেষ্টা ও সরকারী উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। আর এখানেই প্রাচ্যবাদী ঐতিহাসিকদের ভারতীয় পুরুষদের মানসিকতায় নারীদের প্রতি যে অমানবিক ছিল তার মান্যতা পায়।

'রামমোহনের পূর্বে খ্রিস্টান মিশনারীগণ ও বিশেষভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার বুকানন সতী প্রথার নির্মমতার বিরুদ্ধে আন্দোলন তুলিয়াছিলেন। ডাক্তার বুকাননের চেষ্টায় উক্ত কলেজের অধ্যাপক কোলব্রুক ও কেরির তত্ত্বাবধানে ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে কলেজের ১০ জন হিন্দু পণ্ডিত ছয় মাসের জন্য বিভিন্ন শ্মশান ঘাটে দাহকারীদের শাস্ত্রপ্রমান ও বিচার দ্বারা নিবৃত্ত করিতে থাকেন। এই সমস্ত শাস্ত্র প্রমান *"শুদ্ধি প্রমান"* নামে একটি পুস্তিকায় প্রকাশ করেন'।[৫]

প্রাথমিক ভাবে, সরকারী উদ্যোগ ও লক্ষ্য করা যায় সতীদাহ প্রথার প্রতি ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলীর মনে এই " অস্বাভাবিক ও নৃংশস প্রথা সম্পূর্ণভাবে রহিত করা যাইতে পারে কিনা"- সেই সম্বন্ধে স্পৃহা জাগে।[৬]

অন্যদিকে ভারতীয়দের মধ্যে, সতীদাহের বিরুদ্ধে জোরালো সওয়াল করেছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। রামমোহন ও মৃত্যুঞ্জয় দুজনে মিলে এ ব্যাপারে একটা অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিতর্কের সূচনা করলেন। অবশেষে সামাজিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই ১৮২৯ সালে ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীতে সতীদাহ প্রথাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল ঘোষণা করা হয়।[৭]

সতীদাহ প্রথার বিলোপের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল সমাজ গর্জে উঠলেও সরকারী চেষ্টা এবং তৎকালীন সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর পাশে জনসাধারন দাঁড়িয়েছিল। লোকশিল্পীদের রচিত সতীদাহ প্রথা বিরোধী প্রচারক বিষয়ক গান ছিল এই রকম:

'শোন শোন শোন সবে নরনারীগন
সহমরণ পেরথা নারী বধেরই কারন ।
নারী হত্যে মহাপাপ শাস্ত্রের বচন
নারী রক্ষ্যে মহাকার্জ মহৎ কারন।
ওগো সতী ,স্বামী মরলে তোমাদের চিতেয় যেতে হয়,
তোমরা মরলে পুরুষ তো কেউ সঙ্গেতে না যায় ।
সতী গভভে সন্তান রেখে যদি স্বামী চলে যায়,
বল কোন দোষে নরশিশু যাবে যমালয়ে।
খুন করলে খুনি ফাঁসিতে লটকায়,
জ্যান্ত মানুষ পুড়িয়ে মারলে যেন নরকগামী হয়।

তাই কলির রামমোহন দিয়েচেন ডাক

নারীর বধ রোধ তবে বাজও তবে ঢাক'।[৮]

সেকালে কুলীনরা বহুবিবাহ করতেন, সেই কারনে এক ব্যক্তির মৃত্যুতে, বহুনারীকে বৈধব্য যন্ত্রনা ভোগ করতে হত। উনবিংশ শতকের সামাজিক পটভূমিকায় নারীদের অবস্থা সম্পর্কে বিশদে জানা যায় বিদ্যাসাগরের *'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিবিষয়ক প্রস্তাব* গ্রন্থ টি থেকে। বিদাসাগরের মানবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি তাকে এই সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করতে উদ্ধুদ্ধ করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বে ও বহুবিবাহ প্রথা সমাজে বেশী না হলেও সেটা ছিল তাঁর সমর্থন পাওয়া যায় শমিতা সেনের প্রবন্ধে:

'সতী দাহ প্রথা রদের কুড়ি বছর পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ এবং কুলীনদের বহুবিবাহ রোধ করার জন্য প্রচার শুরু করেন।তিনি ব্রিটিশ সরকারকে দিয়ে বিধবা বিবাহ অনুমোদনে আইন প্রনয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন(*দ্য হিন্দু উইডো'স রিম্যারেজ অ্যাক্ট,* ১৮৫৬ আইনটি ২৬ জুলাই ১৮৫৬ এ আইন প্রণয়ন করেছিল) কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রানপণ চেষ্টা সত্ত্বেও তার আশেপাশের সমাজে এই পরিবর্তন গৃহীত হয়নি'।[৯]

এই সময়ে সমাজে মেয়েদের খুব অল্প বয়সে বিয়ে হত। যে বয়সে তাঁদের বিয়ে হতো সেই বয়সে তাঁদের বুদ্ধি, যুক্তির কোন বিকাশই ঘটত না । সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন:

'তাঁরা মায়ের 'জেনানা' থেকে নিজেদের 'জেনানায়' সরাসরি প্রবেশ করে। গ্রান্ট এই জীবনকে 'animals of a lower species'- দের জীবনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ১৮১১ থেকে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত এক প্রতক্ষ্যদর্শীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিন চার বছরের মধ্যে ছেলে-মেয়েদের বিয়ে স্থির হয়ে যেত। এমনকি কোলের শিশুর ও বিয়ে হত এমন উদাহরণ আছে বলে এই গ্রন্থে লেখা হয়'।[১০]

তৎকালীন সমাজে বাল্য বিবাহ বিবাহ প্রথা যে ছিল সেটা আর ভাল জানা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *পরিত্যক্ত* কবিতার মাধ্যমে:

'সানাই বাজয়ে ঘরে নিয়ে আসি

আট বর্ষের বধূ,

শৈশবকুঁড়ি ছিঁড়িয়া বাহির

করি যৌবনমধু!
ফুটন্ত নবজীবনের ‘পরে
চাপায়ে শাস্ত্রভার
জীর্ণ যুগের ধূলিসাথে তারে
করে দিই একাকার!’[১১]

বাল্য বিবাহের থেকেও সামাজিক আরও বড় কুপ্রথা ছিল কৌলান্য প্রথা। দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলান্য প্রথা ধীরে ধীরে তার সামাজিক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে এক ধরনের বিবাহ ব্যবসায় পরিণত হয়েছিল। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। কুলীন স্বামী পাওয়া তৎকালীন সময়ে কঠিন ছিল। ফলে অল্প বয়স্ক মেয়ে-ছেলেদের বিয়ে দেওয়া হত। অনেক সময় ছেলে পাওয়া যেত না, যার ফলে বয়স্ক মেয়েদের কে অল্প বয়সের ছেলেদের সাথে বিয়ে দেওয়া হত। তার সমর্থন পাওয়া যায় মঞ্জুশ্রী সিংহ গ্রন্থে:

‘ আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে।
যদি বা হইল বিয়া কতদিন বই
বয়স বুঝিলে তাঁর বর দিদি হই’[১২]

এর ফলে তখন সমাজে পণ প্রথার প্রচলন হয়। বাংলার শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণী বা অশিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা বিয়ের সময় কন্যার পিতার থেকে অর্থ নেওয়া হত। কন্যাকে একটা নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে বিবাহ দিতে বাধ্য থাকে ফলে বরের পনের পরিমান ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। হিন্দুদের সবচেয়ে ‘উৎকৃষ্ট বন্ধন’ কেনাবেচার মধ্যে দিয়ে শুরু হত, যারা পরবর্তীতে আত্মীয়তার বন্ধন আবদ্ধ হবে।

এই ছিল উনিশ শতকের সামাজিক কুপ্রথা দূরীকরণে ব্রিটিশ সরকার কখন-প্রথা এবং কু-সহায়তা করেছে আবার কখনো উন্নত জাতের ইংরেজি ,শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণী উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করেছেন। সামাজিক কুপ্রথা দূরীকরণে কখনোই নারীরা বেরিয়ে আসে নি। তবে তাঁদের -

যখন দেশীয় এবং ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা হল তখন উচ্চবর্ণের নারীদের মধ্যে থেকে এক ধরনের উন্নত জাতের নারী তৈরি হল যারা শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা নামে পরিচিতি পেল।

'ভদ্রমহিলা' –নিয়ে Meredith Borthwick তাঁর *The Changing Role of Women in Bengal, 1849–1905*[১৩] গ্রন্থে বলেছেন:

'সূচনায় ভদ্রলোক পরিবারের নারী অর্থে ভদ্র মহিলা কথাটি ব্যবহৃত হলেও পরবর্তী কালে এটি এক ধরনের আদর্শ মহিলা বোঝাতেই ব্যবহৃত হতো। শুধু ভদ্রকুল বালা নন, ভদ্র মহিলা ছিলেন কয়েকটি সুনির্দিষ্ট গুণাবলির অধিকারিণী ও এক বিশেষ ধরনের জীবন যাত্রার প্রতিমূর্তি। যাদের মধ্যে গত শতকের শেষ ভাগ থেকে কয়েকজন শিক্ষিতা মহিলা নিজেদের কথা লিখতে শুরু করেছেন।[১৪]

২.২. উচ্চবর্ণীয় নারীদের শিক্ষা

উনিশ শতকে, 'পুরুষ নারীকে শিক্ষা দিয়েছে নিজেদের স্বার্থে, নিজেদের সুবিধার জন্যে, নারীর স্বার্থে নয়। তাঁরা চেয়েছে সমাজের সব কিছু থাকবে অক্ষুণ্ণ, অটুট থাকবে শোষণের ব্যবস্থা, পুরুষ থাকবে প্রভু নারী থাকবে তাঁর অধীন, কিন্তু নারী কিছুটা শিক্ষা পাবে। শিখবে লেখাপড়া, পাশ ও করবে, কিন্তু থাকবে প্রথাগত পদানত নারী। পুরুষ চেয়েছে নারী তাঁর ভূমিকা পালন করে যাবে, হবে সহচারী উন্নত জাতের শয্যাসঙ্গিনী,প্রসবকারিণী,ধাত্রী; হবে শিক্ষিতা পরিচারিকা। উনিশ শতকে উৎপন্ন হয় এক নতুন জাতের নারী, যার সাথে মিল নেই তাঁর পূর্বপ্রজাতির। যে প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় তারা,তার নাম শিক্ষা। শিক্ষার ফলে উৎপন্ন অভিনব নারীদের বোঝানোর জন্যে দরকার পড়ে অভিনব শব্দ,তাদের জন্যে ইংরেজির অনুকরনে তৈরি করা হয় অভিনব শব্দ: ভদ্রমহিলা।উনিশ শতকে তাঁরা ছিল সমগ্র বাঙালী নারী সমাজের একটি ছোটো সুবিধাভোগী অংশ,তারাও ছিল তেমনই। সমাজ তাঁদের চেয়েছে এবং চায়নি , আজো যেমন সমাজ তাঁদের চায় না'।[১৫]

তবে নারীদের শিক্ষা নিয়ে তৎকালীন সময়ে বঙ্গের রসিক কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের ব্যঙ্গ মূলক কবিতাটি কারো চোখ এড়াইনি –

'যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্চে যবে,
এ বি শিখে, বিবী সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে;

আর কিছু দিন থাকরে ভাই! পাবেই পাবে দেখতে পাবে,
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে'।[১৬]

উনিশ শতকে স্বল্প সংখ্যক নারী শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিল। ছবি রায় সেই সম্পর্কে লিখেছেনঃ "উনিশ শতকের শেষার্ধে বাঙলার প্রগতিবাদী সমাজের এক অংশ থেকে এগিয়ে এসে যে সমস্ত মেয়েরা পরবর্তীকালের মেয়েদের জীবনযাত্রার রূপকে নতুন ভঙ্গিমায় প্রকাশ করতে প্রয়াস করেছেন তাঁদের অনন্য অবদান আজ বাঙলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য"[১৭]

তাঁর মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবদান ছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- রাসুসুন্দরী দেবীর(১৮১০-১৮৯০) লেখা- আমার জীবন(১৮৭৬) , কৃষ্ণ ভাবিনী দাস-এর লেখা ইংল্যান্ডে বঙ্গ মহিলা, স্বর্ণ কুমারী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী , রাজকুমারী দেবী বিশেষ ভাবে তাঁদের লেখায় তৎকালীন সময়য়ের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের শোষণের চিত্র ফুটে ওঠে। এই নারীদের উত্থানে বঙ্গ মহিলা সমাজ(১৮৭৯), খ্রিস্ট মহিলা সমিতি(১৮৮১), সখী সমিতি (১৮৮৬), নারী শিক্ষা সমিতি(১৯১৯)। এক কথায়, উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে বিংশ শতকের শুরু থেকে উচ্চবর্ণের মেয়েরা পর্দার আড়াল ভেদ করে নিজেদেরকে সংযুক্ত করল সমাজের সাথে।

যদিও অন্তপুরে অথবা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে মহিলাদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে সরকার প্রথমদিকে খুব কমই উদ্যোগ নিয়েছিলো। বরং ইংরেজি শিক্ষিত তরুণরা এবং ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যরা এ ব্যাপারে উৎসাহ ছিল বেশী দেখিয়েছিলেন। তাও ছাত্রীদের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছিল:

বালিকা বিদ্যালয় ও ছাত্রীর সংখ্যাঃ ১৮৬৩- ১৮৯০[১৮]

বছর	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্রীদের সংখ্যা
১৮৬৩	৯৫	২,৪৮৬
১৮৭১	৩৪৪	৬,৭১৭
১৮৮১	১,০৪২	৪৪,০৯৬
১৮৯০	২,২৩৮	৭৮,৮৬৫

উচ্চবর্ণের হিন্দু নারীদের ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি সামগ্রিক তাঁদের শিক্ষার হার ছিল:

উচ্চবর্ণের হিন্দু নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার, ১৯০১[১৯]

বর্ণ	শিক্ষার হার %	ইংরেজি শিক্ষার হার %
ব্রাহ্মণ	৫.৬	০.১
কায়স্থ	৮.০	০.৪
বৈদ্য	২৫.৯	০.৮
ব্রাহ্ম	৫৫.৬	৩০.৯

২.৩. উচ্চবর্ণীয় নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

আমরা গোড়াতেই লক্ষ্য করেছি যে, মেয়েদের শিক্ষার দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, তাঁরা যাতে শিক্ষিত স্বামীর যথার্থ জীবনসঙ্গিনী হয়ে উঠতে পারেন এবং সন্তানকে ও সুশিক্ষিত করে তুলতে পারেন। কিন্তু একবার তাঁদের মধ্যে শিক্ষা অনুপ্রবেশ করার পর শিক্ষা জীবন শেষে তাঁরা কি করবেন, এটাও একটা সমস্যা দেখা দেয়। কারো কারো কাছে কেবল ঘর সংসারের কাজ করা, গল্পের বই পড়া, এবং উল ও কার্পেট বোনানোর মতো শখের কাজ যথেষ্ট সন্তোষজনক মনে হয় নি।তাছাড়া, তখনকার সমাজ সংস্কারকরা মনে করলেন, পুরুষ শিক্ষকদের পরিবর্তে যদি নারী শিক্ষিকা করা যায় তাহলে নারী শিক্ষার আরো দ্রুতগতিতে হওয়া সম্ভব।গোলাম মুর্শিদ হাজার বছরের বাঙ্গালী সংস্কৃতি[২০] গ্রন্থে বলেছেন:

‘বামাবোধিনী পত্রিকার খবর থেকে জানা যায় যে, ঢাকার রাধামনি দেবী নামে এক মহিলা ১৮৬৬ সালে শেরপুর স্ত্রীশিক্ষা বিধায়িনী সভায় ৪০ টাকা বেতনে চাকরি পান। তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন তাঁর তিন বছর আগে স্থাপিত ঢাকার মহিলা নর্মাল স্কুলে। তার কয়েক বছর পড়ে রামতনু লাহিড়ীর ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধারানী লাহিড়ী সাহস করে কলকাতার একটি স্কুলে শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন। পরে তিনি বেথুন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হয়েছিলেন। বরিশালের মনোরমা মজুমদারও ৭০-এর দশকের গোঁড়ার দিকে শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন। শিক্ষকতার বাইরে সবচেয়ে সম্মান জনক চাকরি ছিল চিকিৎসার। মহিলা ডাক্তারের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী হলেও, সমাজ সহজে মহিলা ডাক্তারদের স্বীকার করে নেয় নি। কাদম্বিনী বসু ডাক্তারি পড়তে যান ইংল্যান্ডে এবং ফিরে এসে চিকিৎসক হিসাবে কাজ শুরু করেন, কিন্তু পত্রপত্রিকায় তাঁর অনেক নিন্দা করা হয়েছিল এবং তা নিয়ে আদালতে মামলাও হয়েছিল। কামিনি সেনের বোন যামিনী

সেনও কয়েক বছর পর প্রথমে দেশে এবং পড়ে বিলেতের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে ডাক্তারি শুরু করেন। তাঁরও সমালোচনা হয়েছিল। তাছাড়া তাঁর বিয়ে ও হয়নি। খ্রিস্টান সমাজের সদস্য হিসাবে ডাক্তারি করতে সমর্থ হয়েছিলেন চন্দ্রমুখীর বসুর বোন বিধুমুখী বসু, আর ভায়লেট মেরী মিত্র। সেই পর্যায়ে ব্রাহ্ম এবং খ্রিস্টান সমাজের বাইরে ডাক্তারি করতে অন্য কেউ এগিয়ে আসে নি।

২.৩. উচ্চবর্ণীয় নারীদের রাজনীতিতে আগমন

উনবিংশ শতকের শেষের দিকে পুরুষপ্রাধান্য কংগ্রেস (১৮৮৫ খ্রিঃ) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতীয়রা আংশিকভাবে রাজনীতিতে ক্ষমতার স্বাদ পেতে শুরু করে। কিন্তু এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে দেশভাগের পূর্ব অবধি বাংলার সামান্য কিছু মহিলারা রাজনীতিতে অংশ গ্রহন করেছে। এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছিল গান্ধীজীর রাজনীতিতে আগমনের কিছু সময় পরে। লেখাপড়ায় সীমিত বিকাশ সত্ত্বেও স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫ খ্রিঃ-১৯৩২ খ্রিঃ) এবং কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর (১৮৬১ খ্রিঃ -১৯২৩ খ্রিঃ) কথা জানা যায়। সরলা দেবী(১৮৭২খ্রিঃ-১৯৪৫খ্রিঃ) তাঁর মা স্বর্ণকুমারী দেবীর থেকে বেশী রাজনৈতিক সচেতন ছিলেন । তিনি দেশের লোকের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ জোরদার করার জন্যে প্রতাপাদিত্য উৎসব , বীরাষ্টমী ব্রত ইত্যাদি অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। দেশের পন্য এবং শিল্প সম্পর্কেও তিনি সাধারণ মানুষের উৎসাহ বাড়াতে চেষ্টা করেছিলেন। এক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬১খ্রিঃ-১৯১১খ্রিঃ) জন্মসুত্রে ভারতীয় না হয়ে ও তাঁর সমাজ সেবা এবং রাজনীতিতে তাঁর অনুপ্রেরণা অনেক মহিলা। ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনায় তিনি মুখর ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ কে কেন্দ্র করে যে-স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়,তাতেই মহিলারা সত্যিকারভাবে প্রথম ভাবে রাজনীতিতে এবং সংগ্রামী চেতনায় উদ্ধুত হতে দেখা যায়। গোলাম মুর্শিদ *হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি*[২১] নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

'কুমুদিনী মিত্র হেমাঙ্গিনী দাস, সরলা দাস দেবীর বোন হিরণ্ময়ী দেবী প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। অশ্বিনী কুমার দত্তের নেতৃত্বে বরিশালে স্বদেশী আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং তাতে অনেক মহিলাই স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশ নিয়েছিল। মহিলা কবি-সাহিত্যিকেও এ সময়ে স্বাদেশিকতার মনোভাব জোরদার করার জন্যে অনেক রচনা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে স্বর্ণ কুমারী দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দাস, গিরীন্দ্রমোহনী দাসী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু,

হিরণ্ময়ী দেবীর প্রমুখ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও আরম্ভ হয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে। সে আন্দোলনে মহিলারা তরুণ সন্ত্রাসবাদীদের কেবল উৎসাহ দেননি, সেই সঙ্গে আশ্রয় দিয়েও সহায়তা দিয়েছেন। এ রকমের একজন মহিলা বীরভূমের দুকড়ী বালা। তাঁর বাড়ীতে সন্ত্রাসবাদীদের একটি পিস্তল পাওয়ায় তাঁর তিন বছরের কারাদণ্ড হয়েছিলো ১৯১৬ সালে। রাজনৈতিক কারনে তিনিই সম্ভবত বাঙালী মহিলাদের মধ্যে প্রথম কারারুদ্ধ হন'।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ছিল স্পষ্টই হিন্দু- মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জনগনের প্রতিরোধকে দুর্বল করে তোলার ব্রিটিশ ষড়যন্ত্র।এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদেশী পণ্য বর্জনের মাধ্যমে ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়। সমকালীন বাঙ্গালী রমণীর বেশিরভাগই পর্দার আড়ালে কঠোরভাবে অন্তঃপুরে থাকা সত্ত্বেও উৎসাহ ভরে নারীদের একাংশ এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। অন্যান্য অনেক কিছুর মধ্যে এই আন্দোলনে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহনের অন্যতম প্রমান হল এই যে তারা সুতো কেটে, তাঁত বুনে নিজেদের কাপড় নিজেরাই তৈরি করতে শুরু করে বিদেশী বস্ত্র বর্জনের উদ্দেশ্যে।এবং এটা তারা শুরু করেছিল গান্ধীর রাজনীতিতে আসার অনেক আগে থেকে।[২২] স্বদেশী আন্দোলনের সময়, একদিনের অরন্ধন ও উপবাসের ডাকে তারা বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। গ্রামে গ্রামে রমণীকূল সেদিন উনুন জ্বালাতে অস্বীকার করেছিলেন উৎসাহভরে।এভাবেই বাংলার নারীদের একাংশ স্বদেশী আন্দোলনের সময় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নারী ধর্মঘটের মতো একটা ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। মহিলাদের অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য হয়েছিল বরিশাল জেলায় যেখানে বিদেশী পণ্য বর্জন আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। এমনকি বলা হয়ে থাকে জঙ্গি 'মনোরমা মাসিমা' বরিশাল শহরে এক নারী বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[২৩]

গোলাম মুর্শিদ *হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে- '১৯২০-এর দশকে যখন অসহযোগ আন্দোলনে চিত্তরঞ্জন দাশ যে অবদান রাখেন, তাতে কেবল পুরুষদের নয়, তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী সহ মহিলাদেরও সমর্থন লাভ করেন।তাঁর ভগ্নী ঊর্মিলা দেবী এবং হেমপ্রভা মজুমদারও তাঁর সহায় হয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন সহ বাংলার প্রধান নেতারা যখন কারারুদ্ধ হন, তখন বাসন্তী দেবী প্রাদেশিক কংগ্রেসের দায়িত্ব পালন করেন। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলিও ১৯২০ এবং ৩০-এর দশকে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের স্ত্রী

নেলী সেনগুপ্ত ও অসহযোগ আন্দোলনে পূর্ববঙ্গে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। সাংবিধানিক রাজনীতিতেও তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। হেমপ্রভা মজুমদার পূর্ব বঙ্গের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩০ সাল নাগাদ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে কল্পানা দত্ত, প্রীতি লতা ওয়াদ্দেদার নাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গভর্নর জ্যাকসনকে গুলি করেন বীণা দাস। কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলনে নারীদের অংশ গ্রহন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য'।[২৪]

১৯৩০সালে লবন তৈরি ও সংগ্রহের ওপর ইংরেজ আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে গান্ধী তাঁর আন্দোলন শুরু করেন।এখানেও মহিলাদের অংশ গ্রহন ছিল পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী। বুর্জোয়া ও পিতৃতান্ত্রিক পক্ষপাত যাইহোক না কেন এই আন্দোলনে মহিলাদের সক্রিয়ভাবে নিয়ে আসতে পেরেছিল এটিই গান্ধীর কৃতিত্ব, কারণ তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু রূপে বেছে নিয়েছিলেন মহিলাদের দৈনন্দিন জীবনের আপাত গুরুত্বহীন অথচ অপরিহার্য সামগ্রী নুনকে।অসংখ্য মহিলা গান্ধীজীর ডাণ্ডি অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ত্রিশের দশকের গোঁড়ায় দিকের অসহযোগ আন্দোলন ও পরবর্তী সময়ে ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় থেকেই মহিলারা স্থানীয় নেতৃত্বে আসতে শুরু করে। এক্ষেত্রে সাবিত্রী দেবী ও ননীবালা দেবীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যারা রাষ্ট্র শক্তির দমনপীড়ন অগ্রাহ্যকরে সত্যাগ্রহ অন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

চল্লিশের দশকে, তেভাগা আন্দোলনে নিম্নবর্ণের নারীদের অংশ গ্রহণ ছিল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে এই আন্দোলনে নেত্রী হিসাবে ইলা মিত্রের নাম বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কেবল জেলে যান নি, সেখানে দারুণ লাঞ্ছনার শিকার হয়েছিলেন।পূর্বে যদি উচ্চবর্ণের শিক্ষিতা নারীদের উত্থান ঘটে থাকে তেভাগা আন্দোলন পারিবারিক ভাবে অত্যাচারিত, অর্থহীন শ্রমে শোষিত নিম্নবর্ণের নারীদের উত্থান ঘটেছিল। দেশভাগের পূর্ববর্তী নারীদের রাজনীতিতে আসাটা নির্ভর করেছে বরাবর পারিবারিক ইচ্ছে অনিচ্ছার উপর, এবং তাঁদের রাজনৈতিক কার্যাবলীও ছিল সীমাবদ্ধ। তবে এই ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের নারীরা যা পেয়েছিল সেটা নিচু বর্ণের নারীদের ভাগ্যে সেটাও জোটেনি। তাঁর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় শমিতা সেন-এর প্রবন্ধে-

'উনিশ শতকের অগ্রগতির মধ্যে দুটি ঘটনা বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রথম, বিবাহ রীতিকে কেন্দ্র করে যে সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত তা নারীর মধ্যে বৈষম্যকে আরও গভীরতর করল। মধ্যবিত্ত নারীরা সংস্কার আন্দোলনের সূত্রে অর্ধেক নতুন অধিকার অর্জন করল। চালু হলো 'সঙ্গী- ধর্মী- বিবাহের' ধারনা, নারীর ওপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন বন্ধ হলো, নারী পেল শিক্ষা ও কাজের সুযোগ এবং চূড়ান্ত রাজনীতিতে প্রবেশাধিকার। কিন্তু সব নারীই এইরকম ভাগ্যবতী ছিল না। সমাজের নিচুতলার মেয়েরা প্রাপ্তির তুলনায় হারিয়েছিল বেশি'।[২৫]

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের নারীদের মধ্যেও একই রকম ভাবে সীমাবদ্ধতা ছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে তখনো তাঁদের পুরুষের অধীনে থাকতে হতো। পুরুষ শাসিত সমাজে তাঁদের সামাজিক ক্ষেত্রে যেটুকু স্বাধীনতা দেওয়া হতো তাঁরা সেইটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকতে হতো।

২.৪. নিম্নবর্গের নারীদের সামাজিক জীবন

উনিশ শতক থেকে বাংলা সাহিত্যের যে সম্ভার গড়ে উঠেছিল,তাতে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অবদান অনস্বীকার্য। তাঁদের লেখায় যেমন ছিল ভদ্রশ্রেণীর মহিলারা, তেমনি ছিল নিম্নবর্ণের নারীরা। তবে সাহিত্যে তাঁদের যে ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে সেটা দেখলে বোঝা যায় নিম্নবর্ণের নারীদের তাঁরা কি চোখে দেখতেন। অধ্যাপক রূপ কুমার বর্মণ *'বাঙালি নিম্নবর্ণ মানুষের সামাজিক অবস্থান ও অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম: সমাজ ও সাহিত্যের তুলনাত্মক বিশ্লেষণ' নামক প্রবন্ধে*[২৬] উচ্চবর্ণের সাহিত্য বিশরদের লেখনীতে নিম্নবর্ণের নারীদের অবস্থান কিভাবে তুলে ধরা হতো তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, এইভাবে:

'নিম্নবর্ণীয়দের সম্পর্কে ও তাদের সৃষ্ট সাহিত্যকে বা দলিত সাহিত্যকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে।প্রথমত, উচ্চবর্ণীয় সাহিত্যিকদের রচনায় দলিতদের 'অসম্মানজনক' পরিচিতি নির্মাণ। দ্বিতীয়ত, অ-দলিতদের সৃষ্টি দলিতদের সহানুভূতিশীল অবস্থান। এবং তৃতীয় ভাগটি হল নিম্নবর্ণীয়দের স্বকথিত বিবরণ। প্রথম ভাগের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সফল ঔপন্যাসিক সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য থেকে উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে।তিনি নিম্নবর্ণীয়দের ইতিহাস লেখেননি বা তার সাহিত্যে নিম্নবর্ণীয়দের অবস্থান খুবই কম ।

কিন্তু তার দু-একটি বাক্যই নিম্নবর্ণীয়দের অসম্মানজনক অবস্থান নির্মাণের পক্ষে যথেষ্ট। 'দেবী চৌধুরানী'তে তিনি লিখেছেনঃ "পুকুরে পুকুরে,মাছ মহলে ভারী হুটহুট, ছুটাছুটি পড়িয়া গেল।... জেলে মাগীদের হাঁটাহাঁটিতে পুকুরের জল কালী হইয়া যাইতে লাগিল...'। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালি(১৯২৯) ও ইছামতি(১৯৫০) উপন্যাসেও উনবিংশ ও বিংশ শতকের বাংলার সমাজ জীবনের প্রায় অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। 'পথের পাঁচালি' তে তিনি লিখেছেন-...মাথাটার ছিরি দ্যাখ না! না একটু তেল দেওয়া, না একটু চিরুনি ছোঁয়ানো- কে বলবে বামুনের মেয়ে, ঠিক যেন দুলে বাগদীদের কেউ- বিয়েও হবে ওই দুলে বাগদীদের বাড়ীতেই- অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের কাছে দুলে বাগদী 'অশ্লীল' শব্দ'।

নিম্নবর্ণের নারীদের উচ্চবর্ণের পুরুষদের চোখে কেমন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। ফলে উনবিংশ শতকের শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার নিম্নবর্ণের নারীদের যে ছোঁয়া লাগে নি তা বোঝা যায়। নিম্নবর্ণের মানুষ উচ্চবর্ণের সামাজিক প্রথা বিভিন্ন ভাবে যতোটুকু পেরেছিল গ্রহন করেছিল। কারন তাদের কাছে উচ্চবর্ণের সামাজিক প্রথা গুলোই উৎকৃষ্ট, সমাজে মর্যাদাপূর্ণ ভাবে বেঁচে থাকতে যা অতি প্রয়োজনীয় বলে তাদের মনে হয়েছিল। নিজেদের সামাজিক সংস্কৃতি ধর্মীয় অবস্থার পাশাপাশি কখনো উচ্চবর্ণের প্রথা গুলি গ্রহন করেছে, আবার তাদের দেখাদেখি সেগুলো বন্ধও করেছে। তবে নিম্নবর্ণের নারীদের মধ্যে পার্থক্য ছিল সেটা কখনো অস্বীকার করা যায় না।

ধর্ম ও জাতিগত পার্থক্য নারীদের একজন থেকে অন্যজনকে অনেক দূরে ঠেলে দেয়। জাতি –ধর্ম- বর্ণের পার্থক্য নারীর জীবন, সামাজিক- সাংস্কৃতিক- অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থান ও ভিন্ন করে তোলে। উচ্চবর্ণের নারীদের জীবন যেমন পর্দার ভিতরে ছিল, নিম্নবর্ণের নারীদের জীবন সেই রকম ছিল না বলে উল্লেখ করেছেন, গোলাম মুর্শিদ *সংকোচের বিহ্বলতার অভিঘাতে বঙ্গ রমণীর প্রতিক্রিয়া(১৮৪৯-১৯০৫)*[২৭]গ্রন্থে বলেছেন:

'নিম্নশ্রেণীর মহিলাদের অবস্থা অবশ্য তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিলো,- অন্তত উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের মতো তাঁরা অন্তঃপুরে বন্দী ছিলেন না অথবা সতীদাহ, কুলীন বহুবিবাহ, একান্নবর্তীটা ইত্যাদি মহিলা-নির্যাতনমূলক প্রথার শিকার ছিলেন না। তাছাড়া, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের সময়ে তাঁদের বক্তব্য বিবেচিত হতো। এর সবচেয়ে বড়ো কারন

বোধহয় এই যে, তাঁরা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সহায়তা করতেন।অপর পক্ষে, ভদ্রলোক পরিবারের মহিলারা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে অংশগ্রহন করবেন,- এমন প্রত্যাশিত ছিলো না। ফলে, তাঁদের অন্তঃপুরের বাইরে আসার প্রয়োজন হয় না। তাঁরা ছিলেন বরং অলঙ্কারের মতো- স্বযত্নে রক্ষিত; অথবা এমন ' পরিচালিকার' মতো যিনি সন্তান ধারণ লালন-পালন করবেন, সঙ্গ দেবেন এবং বড়জোর গৃহ রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। নিম্নশ্রেণীর মহিলাদের যেটুকু স্বাধীনতা ছিলো, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা নগণ্য হওয়ায় অথবা আদৌ তেমন কোনো ভূমিকা না থাকায়,ভদ্রলোক পরিবারের মহিলাদের তাও ছিলো না। H.A.D Philips(Our Administration in India with Special Reference to the Work and Duties of a District Officer in Bengal) নামক সে সময়কার একজন সিভিলিয়ান যথার্থই লক্ষ্য করেন-

'নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যখন ধনী ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে, তখনই মহিলাদেরকে অন্যের কাছ থেকে ঈর্ষার সঙ্গে রক্ষা করার প্রয়াস তথা পর্দা প্রথা কঠোর হয়ে ওঠে।...উচ্চশ্রেণীর চাষীরা ক্রমশ কঠোরতর অবরোধ প্রথা চালু করছে। নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিরা স্বচ্ছল হয়ে ওঠার পর প্রায় কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই দেয়াল-ঘেরা বাড়ী ও নিজস্ব শৌচাগার তৈরি করে এবং বাড়ীর আঙিনার মধ্যে একটি কূপ খনন করে- যাতে মহিলাদের বাড়ীর বাইরে যেতে না হয়'।

কিন্তু গোলাম মুর্শিদ তার লেখায় তিনি যে দেখিয়েছেন নিম্নশ্রেণির মধ্যে সতীদাহ প্রথা ছিল না, অন্য দিকে সমুদ্ধ চক্রবর্তী[২৮] তার গ্রন্থে দেখিয়েছেন:

'১৮২২ খ্রিঃ কোলকাতা বিভাগের অন্তর্গত কয়েকটি জেলা ও শহরের ম্যাজিস্ট্রেটরা যে প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন, তা থেকে দেখা যায় যে, সহমৃতার তালিকায় ব্রাহ্মন,কায়স্থ ছাড়াও ছিল বাগদি,তাঁতি, চণ্ডাল, ময়রা,কুরী, কৈবর্ত, চাষা, আগুড়ী, সদগোপ, শুঁড়ী, গোয়ালা, কালওয়ার, শাঁখারি, তাম্বুলি, কুমোর, ডোম, মালি, মুচি, প্রভৃতি জাতির অন্তর্গত বিধবারা। এর দুই বছর আগে(১৮২০) বর্ধমানে যে সাতান্নটি সতীদাহের বিবরন পাওয়া যায় তার মধ্যেও নফর,বাগদি, যুগী(যোগী), গোয়ালা, মুচি, ছুতোর, কৈবর্ত, মোদক, চাষা প্রভৃতি জাতির উল্লেখ আছে। ঐ একই বছরে হুগলী জেলায় তিরানব্বইটি সতীদাহের ঘটনার মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবাদের সঙ্গে পাইক, কলু, লোহার, মুঠি, বারুই, ময়রা, কুমোর, তুলী, তাঁতি, পোদ, মালি, বুদি,

হাড়ি, প্রভৃতি জাতের অন্তর্ভুক্ত বিধবারাও উপস্থিত ছিল। সামাজিক মর্যাদার বিচারে জমিদার বা পণ্ডিতের বাড়ী থেকে ভিখারি, দেশীয় রাজকর্মচারী, এবং বিত্তবান পরিবার থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক ভাবে শোচনীয় দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তির স্ত্রীকেও সহমৃতা হতে দেখা যেত'।

এছাড়া, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় *Caste,Culture and Hegemony:Social Domiance in Colonial Bengal*[২৯] গ্রন্থে দেখিয়েছেন নিম্নবর্গের মধ্যে সামাজিক উদ্ধগামীতার জন্য সতীদাহ প্রথা তাঁদের মধ্যে প্রচলিত ছিল:

> 'According to one estimate, 45 percent of the widows burnt in Bengal Proper in 1815–16 came from the lower social groups, especially the Sadgops, Tilis, Mahishyas, Goalas, Sahas, Aguris, including a dalit group—the Namasudras.This remained a more or less constant trend, as another study shows that between 1815 and 1827, in more than 42 per cent of the *sati* cases the families involved belonged to castes other than the three traditional higher castes of the region. The most prominent among them were some peasant castes like the Sadgops, Aguris and Mahishyas, some trading castes like the Tilis, and some dalit groups like the Rajbansis and Namasudras. According to this same study, about 65 per cent of the families where a case of *sati* had actually occurred during this period (1915–27) were either rich or had a reasonable income, and about 46 per cent belonged to the literate category'.

ফলে, নিম্নবর্ণের মধ্যে সতীদাহ প্রথাও উনিশ শতকের ত্রিশ-এর দশক অবধি বজায় ছিল। তবে তাঁদের মধ্যে স্বাধীনতা ছিল সেটা অস্বীকার করা যায় না। কাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ-এর মতো ঘটনা গুলি মহিলাদেরও সিদ্ধান্ত গ্রহনের অধিকার ছিল। কাহার সম্প্রদায়ের মহিলারা উচ্চবর্ণের পুরুষদের দ্বারা যৌন নিপীড়নের শিকার হতো। এই সম্প্রদায়ের মেয়েরা বা মহিলারা পছন্দ মতো পাত্র ঠিক করতো, সমাজ বা সম্প্রদায় তাঁদের মেনে না নিলে তাঁরা পালিয়ে অন্য জায়গায় বসবাস করতো। একই রকম দেখা যায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা উত্তর বাংলায় বসতি ছিল। তাঁদের সম্পর্কে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়[৩০]বলেছেন:

The Rajbansis there had been in existence various forms of tribal marriage, which defied stricter rules of patriarchal endogamy, and allowed women a considerable amount of freedom in choosing their life partners. Paying a 'bride-price' was the usual practice, but poor men had the option of paying with manual labour which they performed for the bride's family, instead of paying in cash.One particular form of marriage, known as *chotrudani*, even speaks of polyandry, allowing a married woman to marry again. Divorce was allowed and widow remarriage was freely permissible, and in some cases widows could choose their new partners and live together without going through any formal marriage procedure. But towards the early twentieth century, the Rajbansis attempted to discontinue all such practices, they adopted the more ritualised and structured forms of marriage; sought to restrain their women in monogamous relations; and introduced the purdah system as a mark of social respectability and for the purposes of claiming a genealogy of ritual purity. However, one should add the caveat here, that these changes were easier to enforce among the richer *jotdar* (landholding) Rajbansi families, than among the less prosperous sections who could hardly afford the luxury of women's seclusion or their abstention from productive labour. Therefore, even in the early twentieth century, a Rajbansi woman vending her wares in the weekly market or smoking in public was by no means a rare or abnormal sight.

নিম্নবর্ণের সমাজের মধ্যেও বাল্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিল পাশ হওয়ার পরে বাল্য বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়া হতো। নিম্নবর্ণের মধ্যে সতীদাহ প্রথা থাকলেও তাঁর সাথে অনেকে এই প্রথাকে মানত না , তাঁরা পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতো। যদি তাঁদের সমাজ ব্যবস্থা এই বিবাহ কে মেনে না নিত তাহলে পছন্দমতো পাত্রকে নিয়ে মহিলা পালিয়ে দূরে গিয়ে বসবাস করতে পারতো। মেয়ে বিবাহ দেওয়ার বয়স ছিল ১০ বছরের মধ্যে অনেক সময় সদ্যজাত সন্তানের বিবাহ ঠিক করে রাখা হতো। ১৮৯১ সালে Age of Consent Bill পাশ হওয়ার পর মেয়েদের বিবাহের বয়স ধার্য করা হয় ১২। কিন্তু তাতেও মেয়েদের বাল্য

বিবাহ দেওয়া হতো। নিম্নবর্ণের মধ্যেও বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় *Caste,Culture and Hegemony:Social Domiance in Colonial Bengal*[৩১] গ্রন্থে নিম্নবর্ণের মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রথা ছিল সেই সম্পর্কে এই ভাবে তুলে ধরেছেন:

Percentage of married women and widows among the females of each caste in the age group of 5-12	
Castes	percentage
Baidya	5.1
Kayastha	8.8
Subarnabanik	11.1
Brahman	16.0
Gandhabanik	16.3
Jalia kaibartta	18.3
Namasudra	22.2
Kamar	23.3
Chasi kaibartta (Mahishya)	25.9
Sundi or saha	28.2
Sadgop	29.3
Tili and teli	32.2
Goala	32.7
Pod	35.7

বাল্য বিবাহের পাশাপাশি নিম্নবর্ণের মধ্যে পণপ্রথা ও প্রচলিত ছিল- আগুরি, সদগোপদের মতো অস্পৃশ্য বলে পরিচিত নমশূদ্র, রাজবংশীদের মধ্যে পাত্রপক্ষকে পণ দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। অনেক সময় মেয়ের বিয়ের বয়স পেরিয়ে (১২ বৎসর) যেতো সমাজের চোখে মেয়ের

পরিবার সম্মান হারাতো।তার ফলে অনেক মেয়ে আত্মহত্যাও করতো। আবার অনেক সময় মেয়ের পক্ষকে পণ দেওয়া হতো, ফলে এই দুই ধরনের দেওয়া নেওয়ার প্রথা তৎকালীন নিম্নবর্ণের মধ্যে ছিল। মালেকা বেগম *নারীমুক্তি আন্দোলন*[৩২] গ্রন্থে পণপ্রথা যে ছিল সেটা তুলে ধরেছেন এই ভাবে:

‘এত টাকা নিলে বাবা ছাঁদনাতলায় বসে।
এখন কেন কাঁদ বাবা গামছা মুখে দিয়ে।।
আমরা যাব পরের ঘর পর-অধীন হয়ে।
পরের বেটি মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে।
দুই চক্ষের জল পড়বে বসু ধারা দিয়ে।।

নারীদের যে অবজ্ঞার চোখে দেখা হতো তার প্রমান ও পাওয়া যায় এই রূপ-

মেয়ের নাম ফেলি
পরে নিলে ও গেলি
যমে নিলেও গেলি।

নারী নির্যাতন সমাজের সব স্তরের মধ্যে ছিল, তারও আভাস পাওয়া যায় এই রূপ-

অম্লমধুর দুধের স্বর
কাল যাব গো পরের ঘর
পরের বেটা মারলো চড়
কানতে কানতে খুড়োর ঘর।।
খুড়ো দিল বুড়ো বর।।
হেই খুড়ো তোর পায়ে ধরি।
থুয়ে আয়গা মায়ের বাড়ী।।
মায়ে দিল সরু শাঁখা, বাপে দিল শাড়ি
ভাই দিল হুড়কো ঠেঙা চল শ্বশুরবাড়ি।

মহারাষ্ট্রের অস্পৃশ্যদের মধ্যেও বাল্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। জ্যোতিবা ফুলে[৩৩] বলেছেন: ‘ছেলেমেয়েকে শৈশবে বিয়ে দিয়ে দেওয়া পিতা-মাতার ওপর বিশেষ কর বসানোর পরামর্শ তিনি দিয়েছেন’। ফলে সহজেই অনুমেয় সারা ভারতবর্ষে উচ্চবর্ণের ন্যায় নিম্নবর্ণের মধ্যেও বাল্য বিবাহ প্রথা তৎকালীন সমাজে কতোটা প্রকোপ ছিল।

উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে নিম্নবর্ণ পেশা পরিবর্তনের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হতে শুরু করলো তেমনি তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রথমেই তাঁরা নারীদের সব ধরনের স্বাধীনতা হরন করতে শুরু করলো তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য নমঃশূদ্র আর রাজবংশী। চণ্ডাল জাতি সম্প্রদায় প্রথমে তাঁরা নমঃশূদ্র হওয়ার জন্য দাবী জানাতে থাকলো তেমনি তাঁদের মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় ,তাঁরা একটি আদর্শ পরিবার গঠনের দিকে অগ্রসর হয় যা পরোক্ষ ভাবে নারীদের স্বাধীনতা খর্ব হতে শুরু করে। 'আদর্শ নারী' বলতে তৎকালীন সময়ে উচ্চবর্ণের নারীরা যেমন আচার-আচারন, দায়িত্ব, কর্তব্য পালন করতো ঠিক তেমনি ভাবে নিম্নবর্ণের নারীদেরও 'আদর্শ নারী' হওয়ার জন্য পুরুষরাই প্রলুব্ধ করতো। নিম্নবর্ণের নারীদের ক্ষেত্রে শ্রীনিবাসনের 'সংস্কৃতয়নের' তত্ত্বটি পুরোপুরি তাঁদের সাথে খাপ খেয়েছে বলে মনে হলেও সেটা কিন্তু নয়, নিম্নবর্ণের নারীরা পাশাপাশি তাদের পূর্বেকার বিভিন্ন পূজাপার্বণের মাধ্যমে পুরনো সংস্কৃতিকে ও পালন করেছে। যেমন হ্যাচড়া পুজো , বিভিন্ন পুজোর মাধ্যমে পুরনো ধর্মীয় উৎসব কে ভুলে যাই নি। এবং বিশেষ করে ষোড়শ শতাব্দীর থেকে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় সেটা বর্তমান সময়ে তাদের মধ্যে বজায় রয়েছে। বাংলার অস্পৃশ্যরা এই ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিল সেটা জানা যায় হিতেশ রঞ্জন সান্যাল[৩৪] বাঙলা কীর্তনের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে:

'স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবনেও না করিলা বিদিত সংসারে।।
অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গনাগর হেন স্তব নাহি বলে'।।

শুধু তাই নয়,রমাকান্ত চক্রবর্তী অনুরূপ কথা বলেছেন:

কার উপদেশ প্রভু গ্রাহ্য যোগ্য নয়।
স্ত্রী শূদ্র পতিত ব্রাহ্মণের বেদে কয়।।
স্ত্রীজাতির উপদেশে কিবা অনর্থ হয়।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ভক্তি আদি ক্ষয়।।[৩৫]

উনিশ শতকের সাতের দশক অবধি নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য জাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব কিছুটা হলেও কমে যায়। এর কারন ছিল বাংলার বাংলার বৃহত্তর অস্পৃশ্য চণ্ডাল জাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের অনুকরণে 'মতুয়া ধর্মীয়' সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। যেখানে নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে বর্জন দিয়ে শুধু পুরুষতন্ত্রের অধীনে ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করেছিল। বিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বাংলার জাতি সম্প্রদায় গুলি তপশিলি জাতি কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে নিম্নবর্ণের নারীগণ উচ্চবর্ণের ন্যায় গৃহের অন্তঃপুরে থেকে সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুসরন করতে শুরু করে।

বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে, বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায় গুলি হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্তি হওয়ার ফলে নিম্নবর্ণের নারীপুরুষ উভয়ের কাছে প্রাচীন হিন্দু ধর্মের আদর্শ মহিলা বলতে যাদের বোঝানো হতো তাদের মতো করে জীবন চর্চা শুরু করেছিল। এই রকম প্রবাদ বাক্য প্রচলিত ছিল যে-"সেই ই সতী নারী,যে স্বামীর চরন সেবা করে"। ফলে নিম্নবর্ণের নারীরা আরও বেশী করে নিজেকে আদর্শ নারী হিসাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করতে থাকে। নিজেদেরকে সামাজিক,অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। তাদের সমাজের পুরুষ তন্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয়েছে। আদর্শ গার্হস্থ্য সংসার বলতে বোঝায় স্বামী সংসারের প্রধান, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবেন আর স্ত্রী সাংসারিক কাজ কর্ম ও সন্তান পালন করবেন। আর বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ের যে ধর্মীয় মতাদর্শ ছিল সেই অনুযায়ী নারীদের ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে সমানাধিকার দেওয়া হয়েছিল তারা সেই ধর্ম পালনের মাধ্যমে দিন অতিবাহিত করত।

চল্লিশের দশকে খাদ্যাভাবের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত নিম্নবর্ণের নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। লঙ্গরখানা গুলিতে ছিল নারী ও শিশুদের ভিড়। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় (পেটের দায়ে বা পাচার হয়ে) বেশ কিছু দরিদ্র মেয়ে বেশ্যাবৃত্তিকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিতে থাকে। খাদ্য ও বস্ত্র থেকে বঞ্চিত নারীদের চিত্র তুলে ধরেছেন শিল্পী কুদরত-ই-খুদা (১৯০০-১৯৭৭)। এই শিল্পীর আঁকা ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের ছবি দিয়ে সারা বিশ্বে তৎকালীন সময়ে ভারতীয় নিম্নবর্ণের মানুষের চেহারা তুলে ধরেছেন। আরেক জন তার এই ছবির মতোই লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তুলসি লাহিড়ী তার ছেঁড়া তার নামক নাটকের মধ্যে দিয়ে। এই সমস্ত সংকটের মধ্যেই নিম্নবর্ণের নারীদের ওপর জোতদারের প্রভাব ছিল অবশ্যগ্রাহ্য। রায়তের বিয়ের সময় জোতদারের মতামত নিতেই হত;

সবকিছুই নির্ভর করত তাঁর সম্মতি অসম্মতির ওপর। কনের ওপর ছিল তাঁর ইচ্ছেমত দখল। সামন্ত প্রথা অনুসারে স্বামীর আগে নববধূর সঙ্গে সহবাসের অধিকার ছিল তার।[৩৬] অসংখ্য বিবাহিতা নারীর ওপর এই ধরনের যৌন অত্যাচার চালিয়ে যেত। কোন নিম্নবর্ণের সুন্দরী মেয়ে পরিবারে থাকলে তাকে জোতদারের 'কাচারী' ঘরে যাওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। এছাড়া বিধবারা ছিল জোতদারের কাছে ক্রীতদাসীর মতো- সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর রাতে তার মনিবকে শয্যায় সঙ্গ দিতে হতো। তেভাগার একজন প্রাক্তন মহিলা ক্যাডারের কথাগুলি তাই অতিশয়োক্তি বলে মনে হবে না-

'ভাগ চাষির গাছের আম, কলা কিম্বা অন্য ফলের মত তার বেটিও ছিল জমিদারের সম্পত্তি'[৩৭]

মেয়েরা বিয়ের আগে হোক আর পরে হোক জোতদারের যৌন অত্যাচারের শিকার হতো। বিয়ের পর স্বামীর সম্পত্তি-তে পরিণত হত।

অস্পৃশ্য জাতি সম্প্রদায় গুলো হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ প্রথার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের দাঙ্গার প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯২৯ সালের গোপালপুর-পদ্মবিলা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর থেকে মহিলাদেরকে লক্ষ্য বস্তু করা হতে থাকে,এবং দেখা যায় তাঁর ফলে নারীদের আরো অন্তঃ পুরে অবরোধ করে দেওয়া হয়। ১৯৪৬ সাল থেকে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, খুলনা, ও বরিশালের বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ দাঙ্গায় বহু হিন্দু আক্রান্ত হন, নারীর সম্মানহানি অবাধে হত্যা, ও ধর্মান্তকরণ চলতে থাকে। প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর জীবন, সম্মান, ও ধর্মান্তকরণ রোধ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার জন্য আবেদন জানানো ছাড়া তাঁদের আর কোন দিশা দেখাতে ব্যর্থ হন। হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ লক্ষ হিন্দুরা তাঁদের সর্বস্ব ত্যাগ করে সীমান্ত পার হয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পাড়ি দিয়েছিল। ফলে অবিভক্ত বাংলায় পূর্ববঙ্গের মতুয়াদের নেতৃত্বে নমশুদ্রদের মধ্যে যে আর্থ –সামাজিক আত্মমর্যাদা ও ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক অস্তিত্বের জাগরণ ঘটেছিল, তা ১৯৪৭ সালের বঙ্গ-বিভাগ ও স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে দ্বিধা বিভক্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে।[৩৮]

অমিতাভ চক্রবর্তী তাঁর কবিতায় দেশ ভাগে নারীদের যে লাঞ্ছনা করা হয়েছে সেটা তুলে ধরেছেন মহাত্মজীর প্রতি উদ্দেশ্য করে তাঁর লেখা:

‘ আপনার নীতি
আপনার পাথরের মূর্তি
ধুলায় গড়াচ্ছে
আপনি কি দেখছেন?
হে অসমর্থ জাতির জনক,
বিভেদের আগুন
লাঞ্ছিতা নারীর অসম্মান
লজ্জায় আপনার মর্মর মূর্তিও
মাথা নুয়েছে
কোথায় রাখব আমরা এ লজ্জা!’

কবি সুশীল পাঁজা লেখেন ‘ ঘৃনা করি সন্ত্রাস ও দাঙ্গাঃ

বসন্ত দিনে দাঙ্গা বর্ষায় দাঙ্গা
নেই দাঙ্গার কোনো ঋতু, তফাত নেই রাত্রিদিনে...।[৩৯]

২.৫. নিম্নবর্ণীয় নারীদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ

উনবিংশ শতকের শেষের দিক থেকে বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে পেশাগত পরিবর্তনের ফলে আর্থিক স্বচ্চলতা বৃদ্ধির ফলে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির অজুহাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুকরণে প্রথমেই তাঁরা নারীদের যে স্বাধীনতা ছিল সেটা ধীরে ধীরে খর্ব করে নিম্নবর্ণের নারীদের সংস্কৃতায়নের দিকে অগ্রসর করে। ফলে নিম্নবর্ণের নারীদের স্বাধীনতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। উনবিংশ শতকে চণ্ডাল নামে একটি জাতি সম্প্রদায় যারা কৃষিজীবী হিসাবে এই শতকের শেষের দিকে যাদের আবির্ভাব ঘটে, যারা নিজেদের সামাজিক মর্যাদার জন্য নারীদের হাটে বাজারে বা কৃষিকাজে তাঁদের যে ভূমিকা ছিল সেটা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। এবং একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি আদর্শ পরিবার কাঠামো গঠনের মাধ্যমে নারীদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করে।

বিংশ শতকের প্রথম দশকের সময় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের নারীদের কীভাবে শোষণ করত তার আভাস পাওয়া যায় ১৯১৫ সালে শ্রী হরিদাস

পালিত রচিত *বঙ্গীয় পতিত জাতির কর্মী*[৩০] নামক আত্মচরিত থেকে। তিনি নিজে একজন বর্ধমানের স্বাধীনপুরে মনিবের জমিতে বসবাসরত নমঃশূদ্র। তিনি, তার দিদি ও মা- কে নিয়ে তার পরিবার। মা ও দিদি মনিবের বাড়ীতে যথাক্রমে চাকরানী ও মনিবের ছোট ছেলের দেখভাল করেন। তিনি এবং তার দিদি মনিবের বাড়ীর পরিত্যক্ত খাবার খেতেন। তাতে মনিবের স্ত্রী অসন্তুষ্ট হয়ে লেখকের মা-কে গালি দিতেন- 'মুরগির পাল নিয়ে কি পরের বাড়ী কাজ কর্ম চলে- এ মুরগির পাল পোষা কি যায়!'।লেখকের মায়ের মাসিক বেতন ছিল আট আনা, আর তার দিদি পেতেন দুই আনা। লেখকের মনিবের স্ত্রীর দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হন। তাঁর মা তাকে সেবা করলে মনিব অভয় ঘোষ বলেন-" শুয়োরের পাল নিয়ে খাবেন আর ন্যাকামি! বেরো মাগী বাড়ী থেকে"।[৪১] পরিবারের প্রধান হয়ে লেখকের মা- কে আর্থিক দিক দিয়ে দারিদ্যতার সাথে যেমন লড়াই করতে হয়েছে তেমনি জাতিভেদের সাথে সাথে উচ্চবর্ণের পিতৃতন্ত্রের সাথে লড়াই করতে হয়েছে।

২.৬. নিম্নবর্ণীয় নারীদের শিক্ষা

উনবিংশ শতকে বাংলায় প্রথম থেকে উচ্চবর্ণের শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণীর চেষ্টায় শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা তৈরির যে প্রয়াস গ্রহন করেছিলেন তাতে নিম্নবর্ণের পুরুষদের কি নারীদের ও ঠাই হয় নি। কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় *নারী শ্রেণী ও বর্ণ*[৪২] গ্রন্থে আভাস দিয়েছেন:

...উনিশ শতকের মধ্যভাগে অর্থাৎ ১৮৫৬ সালে বেথুন স্কুলের সাম্মানিক সম্পাদক হিসাবে কোলকাতা এবং আশেপাশের অঞ্চলের হিন্দু বালিকাদের বেথুন স্কুলে ভর্তি করাবার জন্য বিদ্যাসাগর যে আবেদন পত্র বিলি করেছিলেন, তাতে লেখা ছিল " None but the daughters of respectable Hindus are taken in... These who live at a distance from the school...Will be allowed free use of the carriages and palankeens of the school.

অর্থাৎ, শুধু সম্ভ্রান্ত হিন্দু বালিকাদেরই ভর্তি করানো হয় এই আশ্বাস দিয়ে এবং সেই সঙ্গে বিদ্যালয়ের গাড়ী ও পাল্কী পাঠিয়ে বালিকাদের বাড়ী থেকে স্কুলে আসাযাওয়ার ব্যবস্থার অঙ্গীকার করে বিদ্যাসাগরকে তখন বেথুন স্কুলে ছাত্রী ভর্তির চেষ্টা করতে হয়েছিল। সেখানে অস্পৃশ্য তথা নিম্নবর্ণের নারীদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। ভারত সরকারের The Committee on the

Status of-এর রিপোর্ট অনুসারে "Only a few thousand girls, mostly families entered the formal system of education between 1850 and 1870"।[৪৩] উনবিংশ শতকে ভদ্রমহিলা তৈরির জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে নজাগরণ ঘটেছিল বলে মনে করা হয় তাতে শুধুমাত্র এক সামান্য অংশ সেই সুযোগ তা পেয়েছিল বলা যায়। আর সেখানে অস্পৃশ্য নারীদের শিক্ষার সুযোগ ছিল অবাস্তব। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতি-সম্প্রদায় যতক্ষণ না নিজেদের নারীদের শিক্ষা তথা সামগ্রিক উন্নয়নে নজর দেয় নি ততদিন তাদের অবস্থা সত্যিকারে অন্ধকারে ছিল।

তবে ভারতের অন্য প্রান্তে উনিশ শতকের মধ্যভাগে অস্পৃশ্য নারীদের শিক্ষা দানে এগিয়ে এসেছিলেন জ্যোতিরাও গোবিন্দরাও ফুলে(১৮২৭-১৮৯০)। প্রসেনজিৎ চৌধুরী *মহারাষ্ট্রীয় নবজাগরণ ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন ও নারী জাগরনের এক অধ্যায়*[৪৪] গ্রন্থে বলেছেন:

'তিনি (জ্যোতিরাও গোবিন্দরাও ফুলে) ১৮৪৮ সনে আহমেদনগরের আমেরিকান মিশন নিম্নজাতের মেয়েদের জন্য খোলা স্কুলটি দেখেন। সেই বছরই তিনি পুনেতে শুদ্র-অতিশুদ্র মেয়েদের জন্য একটি স্কুল আরম্ভ করেন।ফুলের জীবনীকারের মতে মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করা প্রথম ভারতীয় ভারতীয় জ্যোতিরাও গোবিন্দরাও ফুলে।এই স্কুলটি খোলার জন্য পিতা অসন্তুষ্ট হন এবং অবশেষে ফুলে এবং তাঁর স্ত্রী বাড়ী ছেড়ে যেতে বাধ্য করেন'।

স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে তাল রেখে নারীর অবস্থাও উন্নত হবে বলে ফুলে বিশ্বাস করতেন। স্বার্থপর পুরুষের নারীকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার আড়ালে অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে আসলে নিজের নিজের অধিকার সম্পর্কে নারীর সচেতন হওয়াটা পুরুষ চায় না।

তৎকালীন সময়ে অস্পৃশ্যদের জন্য কাজ করাও সমাজ ভাল ভাবে মেনে নিত না। কিন্তু ফুলে দমে না গিয়ে সমস্ত মেয়েদের জন্য আর একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উপর মিশনারিদের যে প্রভাব পড়েছিল সেটা অস্বীকার করা যায় না। বাংলার ক্ষেত্রেও মিশনারীদের প্রভাব ছিল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অস্ট্রেলীয় মিশনারির অন্যতম সী.এস. মীড (১৮৬০-১৯৪০) যার প্রচেষ্টায় এবং মতুয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রধান গুরুচাঁদ ঠাকুরের সহযোগিতায় বাংলার নমঃশূদ্রদের জন্য অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাংলার নমঃশুদ্রদের মধ্যে শিক্ষার হার ১৯০১ থেকে ১৯৪১ সাল অবধি কত ছিল সেটা জানা যায় মনোশান্ত বিশ্বাস রচিত *বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ, সংস্কৃত, রাজনীতি*[৪৫] নামক গ্রন্থ থেকে:

‘১৯০১ সালে আদমশুমারীতে যেখানে নমশুদ্রদের মোট শিক্ষার হার ছিল ৩.৩০ শতাংশ, তখন পুরুষদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার বেশী ঘটেছিল। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে নানান প্রতিবন্ধকতা থাকায় তেমনভাবে নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটেনি। ১৯৩১ সালের আদমশুমারীতে নারী শিক্ষার প্রভাব মোটামুটি লক্ষ্য করা যায়। ...নারী শিক্ষার হার ছিল নমঃশূদ্রদের মধ্যে ৩.৬৫ শতাংশ। ১৯৪১ সালে নারী শিক্ষার হার দাড়ায় নমশুদ্রদের মধ্যে ৯.৪১ শতাংশ’।

দেশভাগের পূর্বঅব্দি নমঃশূদ্র নারীদের শিক্ষার হার ছিল খুবই কম। এবং দেখা যায় যে উনিশ শতকের প্রারম্ভে যেখানে নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটছে সেখানে বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নারীদের শিক্ষা লাভ করতে এক শতক আরো অপেক্ষা করতে হয়েছে।

২.৭. নিম্নবর্ণীয় নারীদের রাজনৈতিক অবস্থা

১৯৪৩-এর মন্বন্তর একার্থে মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করে। দীপশ্বরী, সরলা (যশোর) বিমলা মাজী (মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম) -দের দুর্ধর্ষ নেতৃত্বের পরিচয় আমরা তাঁর লেখাতে পাই। প্রত্যেক গ্রামে সংগ্রাম কমিটির দু’টো শাখা ছিল- কৃষক যুবকদের ভলান্টিয়ার বাহিনী ও নারী বাহিনী। ধান কেটে পঞ্চায়েত খামারে তোলার সময়ে ভূপাল পান্ডার নেতৃত্বাধীন দল পুলিশের কাছে পরাস্ত হয়। এর ফলে জোতদার ও পুলিশের মনোবল বেড়ে গিয়েছিল। “কিন্তু কমরেড বিমলা মাজীর নেতৃত্বে জঙ্গী কৃষক নারী বাহিনী দা, বঁটি ও ঝাঁটাসহ কোঁচড়ে ধুলোর সঙ্গে লঙ্কা নুন নিয়ে প্রতিরোধে এগিয়ে যায়।” শেষ অবধি পুলিশ পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল এবং এই ঘটনা ও রণকৌশল জেলার অন্যান্য জায়গাতেও প্রভাব ফেলে।[৪৬]

তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নিম্নবর্ণের নারীরা রাজনৈতিক সভা গুলোতে আসা শুরু করে , প্রথমদিকে যদিও তারা শুধু ঘোমটার নিচ থেকে মাথা নাড়ত, প্রথমদিকে বয়স্ক লোক মহিলাদের আন্দোলনের যোগদান ভাল ভাবে মেনে নেয় নি। পরবর্তীতে দেখা যায় নারীরা নিজেরাই এগিয়ে আসতে শুরু করে , ফলে পূর্বে যে নিম্নবর্ণের মধ্যেও অবরোধ প্রথা শুরু হয়েছিল সেটা ধীরে ধীরে শিথিল হতে শুরু করে। মেয়েরা ধীরে ধীরে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করে- ওঠে- ‘তোমাদের সঙ্গে একসাথে মাঠে ধান বুনলে কিম্বা ধান কাটলে তোমাদের সম্মানে

লাগে না,তাহলে আমরা কিশান সভায় গেলে সেটা তোমাদের কাছে আপত্তি মনে হবে কেন?[৪৭] ফলে নারীরা রাজনৈতিক সভাতেও যেমন যোগদান শুরু করে তেমনি তাদের নিজস্ব সম্পত্তি নিয়ে ও তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় । যেমন এক স্থানীয় কৃষক সভাতে মেয়েরা প্রতিবাদ করে বলে ওঠে-‘ আমরা খিড়কির উঠানে ফলানো শব্জি বেচি, গরু ছাগলের দুধ বেচি, আশেপাশের জলামাঠে মাছ ধরে বেচি, ছাগল ও বেচি। এগুলো বেচার টাকার মালিক কে? এ টাকা আমরা খরচ করি সংসারের কাজেই; কিন্তু ছেলেরা কোন না কোন ছুতোয় সবসময় এটাকা হাতানোর চেষ্টায় থাকে’।[৪৮]

তাদের পারিবারিক ভাবে যে অত্যাচারিত, শোষিত হতে হত তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করে। তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে মহিলা সমিতি গড়ে উঠেছিল সেটা পারিবারিক স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিভিন্ন বিবাদের মীমাংসাও করতো। নিম্নবর্ণের সমাজে নারীদের উপর শারীরিক নির্যাতন ও করা হতো । দিনাজপুরের কম্যুনিস্ট পার্টির এক সাধারণ সভার এক বহুজ্ঞাত ঘটনায় স্থানীয় পার্টি কমিটির এক সদস্যের স্ত্রী সম্পাদকের ভাষণের মধ্যেই বলে উঠেছিলেনঃ কমরেড এমন কোন আইন আছে কি যাতে বলা আছে যে আপনি আপনার স্ত্রীকে পেটাতে পারেন? আমার স্বামী কেন মারবে আমাকে! আমি এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত চাই।[৪৮] তেভাগা আন্দোলন পারিবারিক শারীরিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণের নারীকে কথা বলতে শিখিয়েছিল। নারীরা তাদের স্বাধীনচেতা মনোভাব নিয়ে নিজেদের ভাল মন্দ বুঝতে চেষ্টা করতে শুরু করেছিল। সামাজিক পিতৃতান্ত্রিক প্রথার বিরুদ্ধে তেভাগা আন্দোলন নারীদের প্রতিবাদ করতে শেখায়।

নিম্নবর্ণের নারীরা ঠিক যখন স্বাধীনভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহন করতে শুরু করেছিল, নিজেদের, আর্থিক দাবী করতে শুরু করেছিল তখন দেশভাগের কারনে তাদের এই মনোবল আবার ভেঙ্গে যায়।

২.৮. মতুয়া নারীদের ধর্মীয় অবস্থা

হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুগামী যশোর জেলার লক্ষ্মীপাশা থানার জয়পুর গ্রামের তারক চন্দ্র সরকার(১৮৪৫-১৯১৪) হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মীয়, দার্শনিক মতামত, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে পালনীয় রীতিনীতিগুলি ১৩২১ বঙ্গাব্দে(১৯১৪) *‘শ্রী শ্রী হরি লীলামৃত’* গ্রন্থে তুলে ধরেন। কলিকাতার ‘শাস্ত্র

প্রচার প্রেস' থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত। এছাড়াও তারক চন্দ্র সরকারের ' মহানাম সংকীর্তন'(১৯০০) গ্রন্থটিতে ধর্ম- কর্ম সম্পর্কে হরি চাঁদ ঠাকুরের মতাদর্শ জানা যায়। গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমকালে তাঁর অনুগামী খুলনা জেলার বেতকাটা গ্রামের মহানন্দ হালদার(১৯০২-১৯৭২) রচিত 'শ্রী গুরুচাঁদ চরিত' নামক গ্রন্থটি ১৩৫০(১৯৪৩) বঙ্গাব্দে খুলনার বাগেরহাট থেকে প্রকাশিত হয় এবং সাধক বিচরন পাগল কর্তৃক *'শ্রী শ্রী হরি-গুরুচাঁদ চরিত্র সুধা'* গ্রন্থটি ফরিদপুরের তালতলা থেকে ১৩৫১ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেছেন। যা মতুয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ হিসাবে পরিচিত। গবেষকদের কাছে মতুয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আকর গ্রন্থ। উনিশ শতকের শেষ থেকে মতুয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নারীদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থান জানার জন্য উক্ত গ্রন্থ গুলো অপরিহার্য।

মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুর প্রথমাবধি তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম সাধনায় নারী পুরুষের কোন ভেদাভেদ কে প্রশ্রয় দেন নি। *শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত গ্রন্থে* বলা হয়েছে-

'ভেদাভেদ জ্ঞান নাই নারী কি পুরুষ'[৪৯]

বৈষ্ণব ধর্মের অনুকরণে মতুয়া ধর্মেও নারীদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। *শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত* গ্রন্থে হরিকীর্তন সমাবেশে ভক্ত পরিবৃত হরি ঠাকুরের যে চিত্র বর্ণিত হয়েছে-সেখানে পুরুষ নারী উভয়ের মিলিত সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়:

'রামাগনে বামা স্বরে হুলুধ্বনি দেয়।।
গৃহে বসিয়াছে রামাগন সারি সারি
প্রভু পার্শ্বে কাঁদিতেছে মালাবতী নারী।।
কোন নারী ঠাকুরের চরনে লোটায়।
কোন নারী পদ ধরি গড়াগড়ি যায়'।।[৫০]
'মেয়ে পুরুষেতে বসি একপাতে খায়।
মেয়েদের এঠো খায় পদ ধূলা লয়।।
পুরুষ ঢলিয়া পড়ে মেয়েদের পায়'।
মেয়েরা ঢলিয়া পড়ে পুরুষের গায়।।[৫১]

উনবিংশ শতকের শেষের দিকে যে মতুয়া ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল সেই ধর্মে নারী পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার দিয়েছিল সেটা লক্ষ্য করা যায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের দ্বাদশ আজ্ঞা তে নারীদের সম্মান জানানোর কথা বলা হয়। ১) সদা সত্য কথা কহিবে। ২) পরস্ত্রীকে মাতৃজ্ঞান করিবে। ৩) মাতা পিতার প্রতি ভক্তি করিবে। ৪) জগতকে প্রেম দান করিবে।৫) চরিত্র পবিত্র ব্যক্তির প্রতি জাতিভেদ করিও না। ৬) ষড় রিপুর নিকট সাবধান থাকিবে। ৭) কাহারও ধর্ম নিন্দা করিও না। ৮) বাহ্য অঙ্গ সাধুসাজ ত্যাগ কর। ৯) হাতে কাম মুখে নাম। ১০) শ্রী শ্রী হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা কর ১১) ঈশ্বর কে আত্মদান কর। ১২) দৈনিক প্রার্থনা কর। হরিচাঁদ প্রদত্ত 'দ্বাদশ আজ্ঞা' মতুয়াগনের অবশ্য পালনীয় নীতি। যুগভেদে এবং যুগ প্রয়োজনে এই গুলো 'মতুয়া আইন'[৫২] নামে খ্যাত হয়েছে।

নারীপুরুষের সহাবস্থানের দৃষ্টান্ত দেখা যায় মতুয়াদের পূজা পদ্ধিতির মধ্যেও। মতুয়াদের পারিবারিক হরি মন্দিরে সকাল-সন্ধ্যা নিত্যপূজা অনুষ্ঠিত হয়। সমবেতদের মধ্য হতে যে কেউ এই প্রার্থনা করতে দেখা যায়। নারীপুরুষ নির্বিশেষে পৌরহিত্য করার কথা জানা যায়। সান্ধ্যকালীন পুজায় হরি মন্দিরে এবং ধানের গোলা ঘরের উপর সান্ধ্য প্রদীপ জ্বালানো হয়। আবার প্রত্যূষে নিদ্রা ভঙ্গের পর পরিবারের গৃহকর্ত্রী হরি মন্দিরের সামনে গিয়ে তিন বার উলুধ্বনি দিয়ে থাকেন। গৃহকর্ত্রীর অবশ্য পালনীয় ক্রিয়া বলে বিবেচিত হয়।[৫৩] *শ্রী শ্রীহরিলীলামৃত* গ্রন্থেও তারক চন্দ্র সরকার বলেছেন:

'এক সাধ্বী স্ত্রী লয়ে কাটায় জীবন
সপরিবারে করে গৃহে হরি- সংকীর্তন
সেই জন আখ্যা লভে গৃহী- ব্রহ্মচারী
সর্বদা তাঁহার সহায় দয়াল শ্রী হরি'।।[৫৪]

নিত্যপূজার দায়দায়িত্ব নারীদের উপর রাখা হয়েছিল। হরিলুট, মহোৎসব প্রভৃতি ধর্মীয় উৎসবে নারীদের অংশ গ্রহণ ছিল লক্ষণীয়। তবে মতুয়া দলপতি হিসাবে নারীদের তখনো দেখা যায় নি।
হরি ঠাকুরের নিত্য পূজা ছাড়াও মতুয়া নারীদের অন্যতম পূজা ছিল, হ্যাচড়া পূজা, শুভচণ্ডীর গান, জাগরণের গান, সূর্য পূজার গান, শিব রাত্রি পালন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ।এগুলোকে ডঃ পুস্প

বৈরাগ্য তার প্রবন্ধে মেয়েলি ব্রত বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৫] হ্যাচড়া পূজার যে ছড়া বা গান পাওয়া যায়, সেখানে নারীদের মঙ্গল কামনার থেকে তাঁদের পিতা ও ভাই-এর সুস্থতা কামনা করেছেন, এই রূপ:

'হ্যাচড়া ঠাইরন লো তোর
ফ্যাচড়া চুল
তাইতে বাইন্ধে দেব
লহা গড়ার ফুল
লহা গড়ার ফুল
বেন্নার মাটি
আমাদের বাপ-ভাই সূর্য সোনার কাঠি'।।[৫৬]

মতুয়া ধর্ম সাংসারিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করেছিল নারীদের জন্য। ধর্মের প্রবর্তক ও সমাজের পুরুষরা পরিবারে ধর্মের রীতি নীতি মান্য করার গুরু দ্বায়িত্ব সঁপেছিলেন নারীদের হাতে। গার্হস্থ্য পরিবার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ধর্মকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহন মতুয়াদের মধ্যে অনেক পূর্ব হতেই স্বীকৃত। হরি চাঁদ ঠাকুরের সময় থেকেই মহোৎসব, কীর্তন, শোভাযাত্রা প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষঙ্গে নারীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার গুরু চাঁদ ঠাকুরের সময় চৌত্রিশ জন নারী ভক্ত মতুয়া ধর্মের প্রচারের জন্য দেখতে পাওয়া যায়। এরা হলেন- অম্বিকা, এলোকেশী, কাঞ্চন(গোপাল সাধুর স্ত্রী), কুসুম, কৈলাসমণি, জয়মতি, জানকী, তপতী বা তোতা, দাসকন্যা,দারিয়ার মেয়ে, দেবী বিলাসিনী, পদ্ম ঠাকুরানী, পাগলী, প্রভাতী, প্রমীলা, ফুলমালা দেবী(রমণী গোঁসাইয়ের স্ত্রী),বউ ঠাকুরানী (ভক্ত হরি পালের স্ত্রী),বিনোদিনী, বিরোজা, ভগবতী, ময়নামতী, মাধবেন্দ্রের জননী, মালঞ্চ সাহা(গোঁসাই তিন কড়ি মিয়াঁর স্ত্রী),রতনমণি, রসমতি, রাধামনি, লালমতি, শান্তি, সরস্বতী, সাধনা(১),সাধনা(২), হাটবাড়ী(গুরু বরঢালীর স্ত্রী), হেমন্ত কুমারী।[৫৭] গুরুচাঁদ পুত্র শশীভূষণ কলকাতায় পড়াশুনা করা কালীন তিনি ব্রহ্ম সমাজের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে গুরুচাঁদ ঠাকুরের কাছে অনুমতি চেয়ে ছিলেন ব্রহ্ম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য; তখন গুরুচাঁদ ঠাকুর তাকে বুঝিয়েছিলেন:

‘বন্ধ চোখে যে ব্রহ্মকে দেখিবারে চাও।
সে ব্রহ্ম পারেনা কিছু এই কথা লও।
ব্রহ্ম নহে অন্য কোথা ব্রহ্ম নিজ দেহে।
সেত আছে ঘরে তব নহেত বাহিরে’।

কিন্তু শশীভূষণের মনের মধ্যে যে ব্রাহ্মণী ভাবনা চিন্তা ও আচার আচরাণের প্রভাব পড়েছিল। তার তাঁরই জেদের কারনে প্রথম মতুয়াদের মধ্যে ১৯০২ সালে দুর্গা পূজার আয়োজন করা হয়।[৫৮]
কিন্তু ধীরে ধীরে মতুয়া ধর্মীয় সমাজের মধ্যেও পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। নারীরা পুরুষদের অধীন হয়ে যায় ।

‘সতীদের গুনের নাই তুলনা-
সতী নারী পতি বিনে তিলার্ধ বাঁচে না।
সতী নারী ভবে যে জন, পূজা করে পতির চরন,
তাঁরা অন্য দিকে চায় না’।

.....

‘মেয়ের সাধন ভজন নাই আর অনুমানে—
থাকতে স্বামী বর্তমানে।
ভবে অসতী যে, সে পারবে কেনে।।
স্বামীর পদে দিয়ে নয়ন, দেহ মন প্রান সব সমর্পণ,
পদ্মিনী নারীর এই লক্ষন, পদ্মযোনি কয়।
চিন্তা মনি বলে কারে, সদায় স্বামীর চিন্তা যার অন্তরে’।।

মতুয়া সঙ্গীতের স্রষ্টা অভয় চরন কবিরাজও সমাজের প্রচলিত ধারনার মধ্যে আবদ্ধ। মতুয়াদের সমাজ নারীদের যেমন পুরুষদের চোখ দিয়ে দেখেছে তিনিই ও তাঁর ব্যতিক্রম নন। এই গানের মাধ্যমে মতুয়া সমাজে নারীদের পতি ব্রতা হওয়ার পথ বাতলে দিয়েছে, যার ফলে সমাজের নারীরা ও এই পথ দ্বিধাচিত্তে মেনে নিয়েছেন। আবার নারীদের স্বামী ছাড়া অন্য কোন পরপুরুষের সাথে

মেলামেশা করলে সেই নারী যে নরকে যাবে সেই কথা তুলে ধরেছেন তৎকালীন সময়ের মতুয়া ধর্মের প্রচারকরা:

‘পতি পরায়ণা সতী, তারে ভয় করে কেনে সোনা।
পতি থু’য়ে অন্যে ভজে,সে নারী নরকে মজে,
তারে লোকে সমাজে নেয় না’।[৫৯]

২.৯. মতুয়া নারীর সামাজিক জীবন

মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুর সমাজে নারীদের সম্পর্কে কিছু আদর্শ তুলে ধরেন, তার মধ্যে সংসারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সঠিক ভাবে পরিচালনার জন্য পুরুষদের বেশ কিছু নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর মধ্যে অন্যতম হল স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের কথা ।এই পরিবার গঠনের মধ্যেই রয়েছে নারীদের শোষণ করার যন্ত্র, পিতৃতন্ত্র।

করিবে গার্হস্থ্য ধর্ম লয়ে নিজ নারী।
গৃহে থেকে ন্যাসী-বানপ্রস্থী-ব্রহ্মচারী।।[৬০]

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় *Caste Culture and Hegemony Social Dominance in Colonial Bengal*[৬১] বলেছেন: ‘When some of the dalits began to acquire property or subinfeudatory rights in the land, they too felt compelled to abandon their previous, more ambiguous, modes of family structure and follow the Brahmanical codes of marriage and patriarchy, having a distinctive impact on the status of their women, who had previously enjoyed more autonomy and freedom. To put it in a different way, as owners of property, they now felt compelled to have ‘legal’ heirs and hence felt the compulsion to control female sexuality and reproductive power and maintain a patriarchal family structure, which previously were the concerns mainly of the property owning Brahmans and the upper castes.’ মতুয়ারা দেখা যায় এইক রকমভাবে, সামাজিক মর্যাদা

লাভের জন্য ও উচ্চবর্ণের নারীদের সামাজিক আচার-আচরন, বাধ্যবাধকতা তারাও অনুসরণ করতে শুরু করে। তার মধ্যে নারীদের যৌনতাকে নিয়ন্ত্রন করে সম্পত্তির বিশুদ্ধ উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে মতুয়া পুরুষরা বদ্ধপরিকর হয়ে পড়েন, এবং নারীদের যৌনতা নিয়ন্ত্রণ করাটাই 'আদর্শ গৃহ' স্থাপনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।*শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত* গ্রন্থে বলা হয়েছে:

'ভেদাভেদ জ্ঞান নাই নারী কি পুরুষ' [৬২]

কিন্তু ভেদাভেদ ছিল নারী পুরুষের মধ্যে, পুরুষদের জন্য ছিল বাইরের জনক্ষেত্র (Public Sphere) অর্থাৎ অর্থ উপর্জনের জন্য পুরুষদের বাইরে বেরোতো, সামাজিক রীতিনীতির বাধ্যবাধকতা তৈরি করতো এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার একচ্ছত্র আধিপত্যের জন্য পুরুষরা বাইরের জনক্ষেত্রটা পুরোপুরি গ্রহন করেছিল আর নারীদের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল ব্যক্তিগত ক্ষেত্রটি(Private Sphere)। তার মধ্যে সাংসারিক দায়-দ্বায়িত্ব, কর্তব্য, ধর্মীয় আচার-আচারন পালন করা প্রভৃতি ছিল। আর তাদের জন্য অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়া, রাজনীটিতে অংশগ্রহন করা, এবং সামাজিক ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকের ভূমিকা পালন করা ছিল নিষেধ। মতুয়া নারীদের কি পুরুষদের সমকক্ষ হওয়ার ক্ষমতা ছিল না? ছিল। তার প্রমান পাওয়া যায় তারক চন্দ্র সরকারের *শ্রীশ্রী হরি লীলামৃত* গ্রন্থে। যেখানে তিনি দেখিয়েছেন, মতুয়া নারীরা সমাজ ব্যবস্থায় বিচারকের ভূমিকা পালন করতে পারে হরিচাঁদ ঠাকুর এরূপ দৃষ্টান্ত ও স্থাপন করেছিলেন অত্যাচারী নায়েবের অন্যায় বিচারের জন্য 'প্রতীকী বিচারালয় স্থাপন করেন, সেখানে নারীকে বিচারকের আসনে বসিয়ে, নারী পরিচালিত আদালতে নারীদেরকেই পেয়াদা, মহুরি ও উকিলের ভুমিকায় উপস্থাপন করেছেন। নারী বিচারালয়ে অত্যাচারী নায়েবকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।[৬৩]

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় *Caste Culture and Hegemony Social Dominance in Colonial Bengal*[৬৪]দেখিয়েছেন, নিম্নবর্ণের পুরুষরা নারীদের যৌনতাকে কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন কারন তারা বিশুদ্ধ উত্তরাধিকার চেয়েছিলেন।

তার জন্য হরি চাঁদ ঠাকুর পুরুষদের শুধুমাত্র সতর্ক করেছেন ব্যাভিচার মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে

সময় থাকিতে ভাই সামাল! সামাল!

ব্যাভিচার হলে কিন্তু সব পয়মাল।। [৬৫]

সেই সময়ে বিধবাদের সমাজে মর্যাদা দিতে ও তাঁদের উপরে যৌন শোষণ বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন হরিচাঁদ। পাইকডাঙ্গার ধনী ও প্রভাবশালী নমঃশূদ্র ব্যক্তি স্বরূপ রায় একজন বিধবা রূপবতীকে রক্ষিতা রেখেছিলেন, এইজন্য হরিচাঁদ তাঁর বাড়ীতে যাবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেন। তবে এক শর্তে তিনি যেতে পারেন বলে জানান, ঐ অসহায় মহিলাকে যৌন শোষণ থেকে যদি নিস্কৃতি দেয়। শর্ত মেনে নিলে হরিচাঁদ ঐ বাড়ীতে যান এবং স্বরূপ রায় বিধবা মহিলাকে মা সম্বোধন করেন।[৬৬] এই ভাবে নারীকে কেন্দ্র করে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছিলেন যা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে পৃথক ছিল। কিন্তু প্রতীকী ব্যবস্থা মতুয়া নারীদের জীবনে বাস্তব হয়ে আসেনি।

ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীকে সমমর্যাদার দেওয়ার জন্য হরিচাঁদ ঠাকুর যেমন বেশ কিছু নীতি আদর্শের কথা বলেছিলেন। এই ধর্মীয় নীতির মাধ্যমে দেখা যায় নারীদের আর পুরুষদের কাজ যে পৃথক সেই ভেদটা প্রকট হয়ে পড়ে। হরিচাঁদ ঠাকুরের তুলনায় তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর সামাজিক সংস্কারে বেশি মন দিয়েছিলেন। উনবিংশ শতকে সমাজ সংস্কারের মুখ্য দিক ছিল সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ, বহুবিবাহ রদ এবং বিধবা বিবাহের প্রবর্তন প্রভৃতি।এই সমাজ সংস্কার আন্দোলন পূর্ববঙ্গের মতুয়া সমাজকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করতে পারে নি। তবে 'সংস্কৃতায়ন' অনুসারে সম্পদশালী কিছু নমশুদ্ররা উচ্চবর্ণের ন্যায় বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহে আগ্রহী হন। ১৯১১ সালের সেন্সাসে দেখা যায় নমশুদ্রদের ৫-১২ বছর বয়সী বালিকাদের ২২% হয় বিবাহিত, না হয় বিধবা।[৬৭] এই সংখ্যা সমসাময়িক কালে তথাকথিত উচ্চজাতির তুলনায় বেশী। ফলে বাল্য বিবাহ ও বিধবাদের অসহয়তা বিংশ শতকের শুরুতে অন্যান্য বর্ণের মত নমঃশূদ্র সমাজেরও দুষ্ট ক্ষত ছিল। উচ্চবর্ণের রক্ষণশীল মানুষের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় ১৮৫৬ সালে বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইন সিদ্ধ হয়। গুরুচাঁদ এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন,তিনি বিধবাদের পুনর্বিবাহ দেওয়ার পক্ষে মতুয়া অনুগামীদের আগ্রহী করে তোলেন। বিধবাদের দুরবস্থা সম্পর্কে 'গুরুচাঁদ চরিতামৃতে' গ্রন্থে মহানন্দ হালদার তুলে ধরেছেন-

'বিধবার আঁখিজল আগুনের মতো,
দেখিতেছি ধিকি ধিকি জ্বলিছে সততো

দেখিতেছি সেই তাপে শুকাইয়া যায়
সমাজের প্রান ধারা মরু সাহারায়।
এ এক অশুভ ভূত চাপিয়েছে ঘাড়ে,
অনাচার ব্যভিচার সদাতাই বাড়ে।।[৬৮]

বিধবাদের দুরবস্থা দূর করার কথা তিনি গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছিলেন। কিন্তু ব্যাভিচার, পরকীয়া শুধু মাত্র বিধবাদের মাধ্যমে সমাজে বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা বলে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি বিধবাদের সমাজে কোনঠাসা করে দিয়েছেন।এবং পরকীয়া আদর্শ পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে বাধা স্বরূপ তার জন্য তিনি বিধবা নারীদের বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আর এই পরকীয়া কমানোর জন্য তিনি অল্প বয়স্ক বিধবাদের পুনরায় বিয়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর মনে করতেন, তাঁর পিতা হরিচাঁদ ঠাকুর যে'আদর্শ পরিবার' গঠনের কথা বলেছিলেন সেই পরিবার গঠনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিধবারা। তাই বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়ার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন এবং এই কাজে তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন খ্রিস্টান মিশনারীর ডঃ সি.এস. মীড সাহেব এবং মিস টাক। অনুপম হীরা মণ্ডল বাংলার ভাবান্দোলন ও মতুয়া ধর্ম[৬৯] বলেছেন: 'গুরুচাঁদ ঠাকুরের এই সামাজিক আন্দোলনে তাঁরই দুইজন ভক্ত-সাধক রাধা পাগল এবং দেবীচাঁদ মণ্ডলের প্রচেষ্টায় আরো গতিশীল হয়ে ওঠে। দেবীচাঁদ এবং তাঁর শিষ্যগন অল্পদিনের মধ্যে অসংখ্য বিধবাদের বিবাহ সম্পন্ন করেন। দেবীচাঁদ একই দিনেই ৩০ জন যুবতী বিধবাকে বিবাহ দেন'।[৭০] এই কাজের জন্য গুরুচাঁদ তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। রাধা পাগল এ সময়ে পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানাধীন খেজুরতলা গ্রামে একটি মেলা প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের ১৪ তারিখ থেকে মাস ব্যাপী এই মেলার স্থায়িত্ব রক্ষা করেন। রাধাপাগল এই মেলাতেই বর্ণাঢ্য আয়োজনের বিশেষত্ব হলো তিনি পাত্রপাত্রী নির্বাচন করে তাঁদের সম্মতিক্রমে, কোনো প্রকার বৈদিক মন্ত্র, হোম প্রভৃতি ক্রিয়া ব্যতিরেকেই বিবাহ কাজ সম্পদন করতেন এবং মতুয়া ভক্ত সম্প্রদায়ের সম্মুখে ও তাঁদেরকে স্বাক্ষী রেখে মালা বদলের মাধ্যমে এই বিবাহ কাজ সম্পন্ন হতো। বর্তমানে এই মেলা টিকে থাকলেও এখন আর বিধবাদের বিবাহের আয়জন করা হয় না। সমাজে বিধবাদের অবস্থান পূর্বের মতো দুঃসহ না হওয়ায় এবং বিধবাদের সংখ্যা হ্রাস ও সামাজিক ভাবে বিবাহ কাজ

সম্পদন সহজতর হওয়ার ফলে গনাহারে বিবাহদানের প্রথা আপনাতেই বন্ধ হয়ে গেছে।[৭১] তবে মতুয়াদের মধ্যে দাম্পত্য জীবনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে বিবাহ যোগ্য বিধবা নারীর সম্মতিক্রমে বিবাহ এখনো ধর্মীয় অনুষঙ্গ হিসেবেই বিবেচিত হয়।

১৯১৫ সালে শ্রী হরিদাস পালিত রচিত *বঙ্গীয় পতিত জাতির কর্ম্মী*[৭২] নামক গ্রন্থে নিচু জাতের (নমশুদ্র) বিধবা নারী(লেখকের মা) পরের(উচ্চবর্ণের) বাড়ী কাজ করতো। সেখানে তাকে বিভিন্ন গালি-গালাজ সহ্য করে ছেলে-মেয়েদের জন্য অন্নসংস্থান করতে হতো। বিধবা হবার কারন হিসাবে অনেকে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন, সেই সম্পর্কে গুরু চাঁদ ঠাকুর বলেন:

বাল্য বিবাহের ফলে বিষময় ফল ফলে,
অকালে হারায় কত প্রান।
কালে যদি বিয়ে হয় জান তাতে সুনিশ্চয়
বংশে হবে অশেষ কল্যাণ।

ফলস্বরূপ, গুরু চাঁদ ঠাকুর ১৯০৮ সালে পুরুষদের বিবাহের বয়স ২০ বছরের আগে নয় বলে ঘোষণা করেছিলেন।[৭৩]

বয়স্ক বিধবাদের জন্যও গুরু চাঁদ ঠাকুর বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল- কোনো বিধবা মহিলা পুনরায় বিবাহ করতে রাজি না হলে জোর করে বিবাহ দেওয়া অনুচিত কারন অনেক বয়স্ক বিধবা মহিলা ছিল যারা পুনর্বিবাহের প্রস্তাবে রাজি ছিলেন না। ফলে মীড সাহেব ও তাঁর সহকর্মী মিস টাক-এর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গুরুচাঁদ পুনর্বিবাহে অরাজি বিধবাদের জন্য 'বিধবা আশ্রম' গড়ে তলেন।মিস টাকের পরিচর্যা ও তত্ত্বাবধানে আশ্রমে থেকে বিধবা নারীদের বিভিন্ন রকম শিল্প কর্মশিক্ষা গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মহানন্দ হালদার তাঁর *শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিতে* বলেছেন,এইরূপ:

মিস টাক আসি বলে প্রভুজীর ঠাই
বড়কর্তা!এক কার্য কবিবারে চাই।।
অনাথা বিধবা যত আছে এই দেশে।

তাদেরে শিখাব শিল্প আমি সবিশেষে।।[৭৪]

১৯৩২ সালে 'হরি-গুরুচাঁদ মিশনের' প্রথম অধিবেশনে সভাপতি গুরুচাঁদের পক্ষে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের অভিভাষণে বিধবা নারীদের সম্পর্কে বলেন-' আমাদের সকলের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, ছেলে কিম্বা মেয়ে অপরিণত বয়সে বিবাহ দিব না।বাল্য বিবাহ প্রচলিত আছে বলিয়াই অত অধিক সংখ্যায় বাল্যবিধবার সৃষ্টি হল।বাল্য বিবাহ একেবারে তুলিয়া দিলে, তাহাদের সংখ্যা একেবারে কমিয়া যাইবে।[৭৫]

এই সময়ই মতুয়া ধর্মে, আদর্শ নারী হওয়ার বেশ কিছু নীতি তুলে ধরা হয়, যার মধ্যে অন্যতম ছিল, স্বামীকে ঈশ্বর জ্ঞান করা, যার ফলে স্ত্রী সমস্ত পা থেকে মুক্ত হতে পারেন। সতী নারী হলে মৃত স্বামীকে বাচিয়ে আনা যায়, এই রকম ভাবে বেহুলা-লক্ষিন্দর, সাবিত্রী- সত্যবানের গল্প এমন ভাবে তুলে ধরা হয় যাতে নারীদের মনেও স্বামী সম্পর্কে এইরূপ মনোভাব তৈরি হয়। মতুয়া নারীদের বেহুলা, সাবত্রীদের মতো সতী নারী হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই সতী চরিত্র গুলো মতুয়া ধর্মীয় সমাজে এমন ভাবে প্রচার করা হয় যেখানে নারী তাঁর স্বামীকে পূজা করতে শুরু করে। ফলে মতুয়া ধর্মীয় অনুশাসন এবং সমাজ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষ সমান, সেই ব্যাপারটা পুরোপুরি উঠে যায়। পুরুষতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থায় আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। মহানন্দ হালদার লিখেছেন:

নারী যদি পতিব্রতা হয় মনে প্রানে
ধর্ম সদা রক্ষা করে এই সব জেনে
...পতির মঙ্গল চিন্তা সতীর সাধনা।
পতি ভিন্ন সতী নারী কিছু'ত জানে না।।[৭৬]

... স্বামীর পদে দিয়ে নয়ন,দেহ মন প্রান সব সমর্পন,
পদ্মিনী নারীর এই লক্ষণ, পদ্ম যোনি কয় ।
চিন্তামণি বলে কারে,সদায় স্বামীর চিন্তা যায় অন্তরে,
ওসে মরিলে বাচাইতে পারে,
যেমন সাবিত্রী আর সত্যবানে' ।। [৭৭]

২.১০. মতুয়া নারীদের শিক্ষা

শিক্ষার ক্ষেত্রে হরিচাঁদ ঠাকুর নারীদের শিক্ষার জন্য যে নির্দেশ দিয়েছিলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর তাঁর নির্দেশ মান্য করেছিলেন । হরিচাঁদ ঠাকুর বলেছিলেন:

''আমি শিক্ষা দেব যত পুরুষদের দলে,
নারী শিক্ষা পাবে তব ছায়া সুশীতলে'' [৭৮]

নারীও শিক্ষা পাবে তবে পুরুষদের 'তব ছায়া সুশীতলে'। অর্থাৎ, পুরুষরা শিক্ষা পাবে তারপর স্বাবলম্বী হলে তারাই নারীদের শিক্ষাদান করবে।

ফলে তারই ফলস্বরূপ হিসাবে, গুরুচাঁদ ঠাকুর ১৮৮০- ১৯১৮ সালের মধ্যে পাঠশালা, নিম্ন প্রাইমারী, উচ্চ পারিমারী, মিডিল স্কুল এবং হাইস্কুল মিলিয়ে মোট ২০৪৮ টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।সারাজীবনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ৩৯৫২ টি পাঠশালা স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯০১ সালের আদমশুমারীতে যেখানে নমঃশূদ্রদের (সব নমশুদ্র মতুয়া নয়,আবার সব মতুয়া ও নমঃশূদ্র নয়।) মোট শিক্ষার হার ছিল ৩.৩০ শতাংশ, তখন পুরুষদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল। হরিচাঁদ ঠাকুর নারী শিক্ষা নিয়ে যেটা বলেছিলেন বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মতুয়া নারী-পুরুষের বৈষম্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

'ছেলে মেয়ে উভয়েতে দিতে হবে শিক্ষা'

তিনি যে ব্রতী নিয়ে সমাজে ছেলে-মেয়েদের উভয়কে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছিলেন সেটা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় না। ১৯১৮ সালে O,Malley- শিক্ষা দপ্তরের দ্বায়িত্ব নেওয়ার পর হিসাবে দেখান,১৯১৬-১৭ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে পাঠরত ৪১১০৫ জন নমশুদ্র,তার মধ্যে ৩৬৯৩২ জন ছাত্র এবং ৫১৭৩ জন ছাত্রী।[৭৯] নারী শিক্ষার হার এতো কম কেন? এর কারন হিসাবে বলা যেতে পারে হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুর চণ্ডাল জাতি সম্প্রদায় থেকে মতুয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তারা শুধু পুরুষদের উপর জোর দিয়েছেন, সেটা অর্থনীতি হোক, সমাজ গঠনে হোক বা রাজনীতিতে হোক। মতুয়া সাধু শ্রী হরিবর বালা ঠাকুর *'বড় মা বীণাপানি দেবীর চরিত্র সুধার আলোকে মতুয়া ধর্মে নারীদের অবদান'*[৮০] বলেছেন '...একদা বীণাপাণি দেবীর(১৯১৯-২০১৯)পিতৃগৃহে স্থানীয় জমিদার মহাশয় আগমন করেন।তখন বীণাপাণি দেবীর বয়স মাত্র ৮/৯

বছর। সেই সময় তিনি জমিদারকে দৃঢ়তার সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আপনারা আমাদের গ্রামের নিকটে স্কুলে পড়তে দেন না কেন? আমার দিদি পড়াশোনার সুযোগ পায় নাই বলিয়া বাবা তাহাকে বাধ্য হইয়া অল্প বয়সে বিবাহ দিয়াছেন।ফলে দেখা যায় যে, মতুয়া সমাজে নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষ প্রাধান্য যেমন বজায় ছিল, তেমনি আবার উচ্চবর্ণের সমাজের বাধ্যবাধকতা। ফলে মেয়েদের শিক্ষার হার এতো কম ছিল। মতুয়া নারীপুরুষের শিক্ষার হার যদি আমরা নমশুদ্র হিসাবে দেখি তাহলেও দেখবো নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে মতুয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়(অধিকাংশ মতুয়া ধর্মালম্বি নমশুদ্র জাতি সম্প্রদায়ের) এবং তাঁদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীদের ক্ষেত্রে কতোটা বৈষম্য করেছেন। মনোশান্ত বিশ্বাস[৮১] যুক্ত বঙ্গের নারী পুরুষদের শিক্ষার হার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, সেটা তুলে ধরলে নারীপুরুষের শিক্ষার বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়:

যুক্তবঙ্গের বিভিন্ন আদমশুমারীতে নমশুদ্রদের শিক্ষার হার:

সাল	মোট স্বাক্ষরতার হার	পুরুষ শিক্ষার হার	স্ত্রী শিক্ষার হার
১৯০১	৩.৩০	৬.৪২	০.১৩
১৯১১	৪.৯২	৯.৫১	০.২১
১৯২১	৭.৫০	১৪.২২	০.৫৭
১৯৩১	৬.৬৩	১১.৮০	৩.৬৫
১৯৪১	২১.০২	৩১.৬৪	৯.৪১

খ্রিস্টান মিশনারিরা নিম্নবর্ণের নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে এগিয়ে এসেছিল। খ্রিস্টান মিশনারিদের সহায়তায় ওড়াকান্দিতে নারীদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৩৭ সালে গুরুচাঁদ ঠাকুরের চেষ্টায় প্রথম মেয়েদের জন্য 'শান্তি সত্যভামা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশের গ্রামে 'তালতলা গদাধর উচ্চবালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্পর্কে বিবরন পাওয়া যায় মহানন্দ হালদার রচিত 'শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিতে-

'নারী শিক্ষা দিতে প্রভু ব্যস্ত সর্বদায়,
ওড়াকান্দি তাতে হল নারী শিক্ষালয়,

... 'নারী ট্রেনিং স্কুল' আজ হল ওড়াকান্দি
আদি সূত্রে গুরুচাঁদ করিলেন সন্ধি'।[৮২]

মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল যাতে তারা শিক্ষিত হয়ে আদর্শ পরিবার গঠন করতে পারে, এবং সাংসারিক কাজের খুঁটিনাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহল থাকে। তাছাড়া সেই সময়ে নিম্নবর্ণের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আর বিশেষ কোনো লক্ষ্য ছিল না। এক্ষেত্রে, তৎকালীন সময়ের উচ্চবর্ণীয় সমাজ কখনো নিম্নবর্ণের নারীদের শিক্ষার জন্য এগিয়ে আসেনি । যেখানে ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত School Book Society মেয়েদের শিক্ষা দানের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। ১৮১৯ সালে Baptist Missionary-র উদ্যোগে Calcutta Female Juvenile Society বিভিন্ন স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। ১৮২১ সালে ইংল্যান্ডের British and Foreign Schoool Society মিস কুক (Miss Cock) নামে জনৈকা শিক্ষিত মহিলাকে এদেশে নারী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ১৮৪৯ খ্রিঃ বিদ্যাসাগর ও বেথুন সাহেবের চেষ্টায় বেথুন বালিকা স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে ১৮৫৫-৫৮ সালের মধ্যে বিদ্যাসাগর মোট ৩৬ টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ।ইতিমধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে 'মহিলা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয় কিন্তু কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের নারী শিক্ষার বিস্তার রক্ষণশীল উচ্চবর্ণ সমাজ ভালো ভাবে দেখে নি। পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয়টি 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়'নামে খ্যাত হয় এবং আনন্দ মোহন বসু ও দুর্গা মোহন দাস বিদ্যালয়টি চালাতেন।[৮৩] সমগ্র উনবিংশ শতক থেকে বাংলায় নারী শিক্ষার যে প্রচেষ্টা চলেছিল সরকারী বা বেসরকারী বা মিশনারী যাই-ই হোক না কেন, তা শহর কেন্দ্রিক উচ্চবর্ণের নারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অথচ এর সামান্যতম প্রচেষ্টা যদি নিম্নবর্ণের তথা মতুয়া নারীদের ক্ষেত্রে হত তাহলে নারী শিক্ষার বিস্তার বেশি হতে পারতো, সেটা অস্বীকার করা যায় না। তবে ভারতবর্ষের মহারাষ্ট্রে দলিত সমাজের নারীদের শিক্ষা বিস্তার ঘটাতে এগিয়ে এসেছিলেন পুনার জ্যোতিবা গোবিন্দরাও ফুলে(১৮২৭-১৮৯০)। ১৮৪৮ সালের আগস্ট মাসে তিনি মাহার, চামার প্রভৃতি অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের বালিকাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য পুনার ভিদেসওয়াড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অস্পৃশ্য বালিকাদের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের তাগিদে ছাত্রী নিবাস এবং অস্পৃশ্যদের জন্য স্বতন্ত্র 'লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা করেন।[৮৪] অন্যদিকে মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুর এবং তাঁর পুত্র যিনি পরবর্তীকালে মতুয়াদের ধর্মীয় গুরু হন, তারা মতুয়া ধর্মে 'নারী পুরুষ

সমান', 'সকলের সমান অধিকার',প্রভৃতির নির্দেশ দিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় নারীদের আলাদা ভাবে শিক্ষার কথা ভাবতে অর্ধ শতক লেগেছিল ততদিনে মতুয়া ধর্মের মধ্যে পুরুষতন্ত্রের ভিত মজবুত হয়েছে। যার ফলে মতুয়া নারীরা শুধুমাত্র সাংসারিক কাজে নিযুক্ত হয়ে থাকলো আর ভালো স্ত্রী আর মা হবার জন্য তাঁদের বাইরে বেড়োনোর তাগিদ অনুভব করেনি।

১৯৪৬ সালের দাঙ্গার পরবর্তীতে মেয়েদের আরো অবরোধ প্রথা মেনে চলতে হতো। ফলে তাঁদের শিক্ষা গ্রহন ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ ভাবে দেওয়া হতো, বা অনেক সময় অল্প বয়সে বিয়েও দিয়ে দেওয়া হতো। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গের মতুয়া নারীদের সামাজিক জীবন এক রকম ভাবে শুরু হল, আর যারা উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিল তাঁদের জীবন অন্য খাতে বইতে শুরু করলো।

২. ১১. মতুয়া নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

উনবিংশ শতকে মতুয়া ধর্ম প্রতিষ্ঠার পূর্বে অস্পৃশ্য চণ্ডাল নারী হিসাবে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থান অন্যান্য নিম্নবর্ণের নারীদের মতোই ছিল। সামাজিক আত্ম মর্যাদার বৃদ্ধির দাবীতে চণ্ডাল জাতি- সম্প্রদায় ব্রাহ্মন্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে তারা নিজেদের নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার হরন করার সাথে সাথে মতুয়া নারীদের মধ্যে অবরোধ প্রথা চালু করেছিল। সামাজিক বয়কট আন্দোলনের পূর্বে উচ্চবর্ণের লোকেদের অভিযোগ ছিল-১) চণ্ডাল নারীরা যথেচ্ছ ভাবে হাতে বাজারে যায়, ২) জেলখানায় ঝাড়ুদারের কাজ করে,৩)নোংরা ও ময়লা পরিষ্কার করে। উচ্চবর্ণের এই অবজ্ঞা ও অসম্মানজনক ভাবে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করায় চণ্ডাল গ্রাম প্রধানগণ একটি সভা করে,সিদ্ধান্ত নেয়- ১) তাদের মহিলারা আর হাতে বাজারে যাবে না ২) উচ্চবর্ণের বাড়ীতে মহিলারা রান্না-বান্না ও খাদ্য গ্রহন করবে না।[৮৫] শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়[৮৬] বলেছেন:

'...A meeting of their community leaders in 1872 prohibited such practices, as the freedom of their women was considered to be a reason why the larger Hindu society held them in disrespect. ...in order to command respect from Hindu society, acceptance of its behavioural norms became mandatory, and this had the unfortunate result of curbing the relative

autonomy that the Namasudra women had previously enjoyed.' ফলে চণ্ডাল জাতি সম্প্রদায়ের নারীদের পূর্বেকার যে পেশা থেকে সামান্য আয় হতো, সামাজিক মর্যাদার দাবীর কারনে তাঁদের আয় তথা বাইরে বেরোনো বন্ধ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে ইংরেজ ঔপনিবেশিক সরকার নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা তৈরি করতে থাকলে জাতি বিভাগ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়, সমাজে নতুন পেশার সৃষ্টি হল, যার ভিত্তি যোগ্যতা। এর ফলে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে নতুন পেশাভিত্তিক জাতি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। 'কৃষিজীবী হিসাবে চিহ্নিত বৃহৎ বৃহৎ আকারের জাতিগুলি ছিল রাজবংশী, নমশূদ্র(চণ্ডাল), পৌণ্ড্র, বাগদি, ভুঁইমালী, বাউরি,বেলদার, ভোক্তা, কাউরা, পালিয়া, কোটাল ইত্যাদি।[৮৭]হরিচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়াদের কৃষিকাজে মনোনিবেশ হতে বলেছিলেন সেটা পাওয়া যায় তারক চন্দ্র সরকার রচিত *শ্রী শ্রী হরি লীলামৃত নামক* গ্রন্থে,তিনি বলেছেন-

'মন দিয়ে কৃষি কর পূজ মাটী মায়'
মনে রেখ বেঁচে আছ মাটীর কৃপায়' [৮৮]

চণ্ডাল সমাজকে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কৃষিকার্যে আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহিত করেন।কৃষিকার্যের মাধ্যমে তাঁদের জীবন-জীবিকায় অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করতে সচেতন করেন।চণ্ডাল তথা মতুয়া নারীরা ধান উৎপাদনে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। পুরুষরা মাঠ থেকে ধান বাড়ীতে নিয়ে আসলেও তাকে শুকিয়ে, সিদ্ধ করে চালে রূপান্তরিত করতে নারীদের শ্রম প্রয়োজন হতো, উদ্বৃত্ত ধান বা চাল পুরুষদের অধীনে থাকতো। তারা সেটা বিক্রি করে নিজেদের কাছে অর্থটা রাখতো, যেখানে নারীরা ও সমান ভাবে ফসল উৎপাদনে সাহায্য করেছে, সেখানে তাঁদের অর্থের কোন অধিকার ছিল না।

ব্যবসা বানিজ্য করার জন্যও হরিচাঁদ ঠাকুর তিনি মতুয়াদের অনুপ্রানিত করেন। তিনি বলেন-

প্রথমে গার্হস্থ্য ধর্ম তৈলের দোকান
বানিজ্য প্রনালী শিক্ষা সবে তৈল দান'[৮৯]

গুরু চাঁদ ঠাকুর ও মতুয়াদের বানিজ্য করতে উৎসাহ প্রদান করেন, মহানন্দ হালদার তাঁর *শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত* গ্রন্থে তুলে ধরেছেন এই রূপ:

কাহাকে বা গুরুচাঁদ দেন অনুমতি।

বানিজ্য করহ এবে হয়ে শুদ্ধ মতি।।[৯০]

মতুয়া ধর্মে পুরুষদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য হরিচাঁদ ঠাকুর এবং গুরুচাঁদ ঠাকুর বিভিন্ন ভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। পুরুষরা পরিবারের অর্থের জন্য বাইরে বেরোতে পারবে । আর নারীরা? তাঁদেরও তহ অর্থের প্রয়োজন হয় সেই অর্থ তারা কোথা থেকে পাবে? হরিচাঁদ তাঁর সমাধান করেছেন গার্হস্থ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। একটি আদর্শ পরিবার বলতে যেখানে স্বামী অর্থের জোগান দেবেন, স্ত্রী পরিবারের কাজ করবেন, পুত্র-কন্যাদের খেয়াল রাখবেন এবং মতুয়া ধর্মানুসারে পরিবারে ধর্মীয় ব্যাপারটা লক্ষ্য রাখবেন। আর অর্থের জন্য স্বামীর ওপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল থাকবে। একই সময়ে যেখানে রাজবংশী নারীদের স্বাধীনতা ছিল,সেখানে মতুয়া ধর্মের মাধ্যমে মতুয়া নারীদের অবরোধ প্রথা শুরু হয়ে গিয়েছিল।শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়[৯১] দেখিয়েছেন:

...Even in the early twentieth century, a Rajbansi woman vending her wares in the weekly market or smoking in public was by no means a rare or abnormal sight.

হরিচাঁদ ঠাকুর গার্হস্থ্য নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন । অর্থাৎ একটি আদর্শ সংসারে পুরুষ হবে গৃহ কর্তা, স্ত্রীরা সাংসারিক কর্ম সামলাবেন,এবং অবসর সময়ে হরিনাম করবেন।

'মালা টেপা, ফোঁটা কাটা, জল ফেলা চাই'
হাতে কাম, মুখে নাম, মনখোলা চাই।।
সহজ গার্হস্থ্য ধর্ম সর্ব ধর্ম সার।
গৃহীকে বিলাবে মুক্তি শ্রীহরি আমার।।[৯২]

মতুয়া ধর্মে গার্হস্থ্য আশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলে অভিহিত করার সাথে সাথে গৃহকে আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠন করার জন্য হরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুর বিভিন্ন পথ নির্দেশ করেছেন। গৃহের অভ্যন্তরে থেকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সংসার পালনের সময় বহু বিপত্তি আসতে পারে,সেগুলি প্রেম, ভালবাসা ও নিষ্ঠার সহিত অতিক্রম করতে হবে।[৯৩] এই পরিবারতন্ত্রের মধ্যে নারী-পুত্র-কন্যা স্বামীর অধীনে থাকবে, যারা অর্থনৈতিক ভাবে পুরুষদের উপর নির্ভরশীল থাকবে। উচ্চবর্ণের নারীরা যেমন গৃহে অভ্যন্তরে থেকে সাংসারিক দ্বায়িত্ব পালন করে তেমনি করেই মতুয়া ধর্মের মধ্যে নারীকে অর্থনৈতিক ভাবে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়[৯৪] দেখিয়েছেন,

১৮৭২ সালের বাখেরগঞ্জের সামাজিক বয়কট আন্দোলনের পর থেকে ধর্ম শাস্ত্রীয় নিয়ম দৃঢ়ভাবে পালনের মাধম্যে নারীদের পূর্বেকার স্বাধীনতা ও অধিকার বাধাপ্রাপ্ত হয়। হরিচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ধর্মের মাধ্যমে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন সেখানে নারীদের অবস্থান ছিল পুরুষদের নীচে। পিতার অধীন, স্বামীর অধীন এবং পরবর্তীতে পুত্রের অধীনে। তিনি স্বতন্ত্র মতুয়া ধর্মে নারীদের স্থান সমান হবে এই তত্ত্ব প্রচার করলেও দেখা যায় নারীরা কখনোই পুরুষদের সমকক্ষ হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা হয় নি। আর্থিক, সামাজিক দিক থেকে তিনি স্বামী ও সমাজের অধীনে থাকবেন। মতুয়া ধর্ম প্রতিষ্ঠার পূর্বে নারীদের আর্থিক স্বাধীনতা ছিল সেটা কেড়ে নেওয়া হয়। ফলে আর্থিক দিক দিয়ে তারা পুরুষদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

মতুয়া ধর্মে নারী-পুরুষের সমমর্যাদার ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় গুলোর ওপর নজর দিয়েছেন তাঁর মধ্যে অন্যতম হিসাবে মতুয়া গবেষক স্বরূপেন্দু সরকার[৯৫]'*সমাজ সংস্কারে মতুয়া*' গ্রন্থে বলেছেন: মতুয়া সম্প্রদায়ে পুত্র-কন্যা নির্বিশেষে পিতা-মাতার সম্পত্তির সমান অধিকারী। স্বামীর মৃত্যু হলে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির মালিক হবে স্ত্রী একইভাবে স্ত্রীর মৃত্যু হলে তার যাবতীয় সম্পত্তির মালক হবে স্বামী'। কিন্তু মতুয়া ধর্মের আদর্শ পরিবারে নারীরা পিতার অধীনে থেকেছে, বিয়ের পর স্বামীর অধীনে এবং পরবর্তীতে পুত্রের অধীনে। তাদের আলাদা ভাবে কখনোই সম্পত্তি দেওয়া হতো না, বর্তমানেও মতুয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে নারীদের পিতার সম্পত্তির ভাগ দেওয়া হয় না।সুতারাং বাস্তব পরিস্থিতির সাথে নিয়মনীতির ফারাকটা থেকে গিয়েছে।

১৯১১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে 'চণ্ডাল' নামের পরিবর্তে 'নমঃশূদ্র জাতি' নাম সন্নিবিষ্ট করা হয়।[৯৬] কিন্তু তখন নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না। গুরুচাঁদ ঠাকুর মেয়েদের শিক্ষিত হবার কথা বলেছিলেন যাতে তাঁদের গর্ভের সন্তানকে ধর্মে- কর্মে সুশিক্ষা দিতে পারেন। গুরুচাঁদ নারীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন কি কারনে? সেটা স্পষ্ট করে তুলে ধরলে দেখা যায় তিনি নারী শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁদের শিক্ষিত হবার পর ভালো স্বামী পাবার জন্য। রবি প্রভা সরকার[৯৭] *'নারী মুক্তি আন্দোলন শ্রীধাম ওড়াকান্দি* প্রবন্ধে বলেছেন:'গ্রামের মেয়েদের গুরুচাঁদ শিক্ষায় আগ্রহী করার জন্য বলতেন, যদি ভালো বর/ স্বামী পেতে চাও তো স্কুলে যাও, শিক্ষা লাভ

করো। নারী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে সমস্ত গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হত তাঁর একটি শাখা থাকতো যেখানে কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হতো। *'গুরুচাঁদ চরিতে'* বলা হয়েছে-

'নারী ট্রেনিং স্কুল' আজ হল ওড়াকান্দি
আদি সূত্রে গুরুচাঁদ করিলেন সন্ধি'।[৯৮]

বাস্তব গার্হস্থ্য জীবনে মানিয়ে নেওয়ার জন্য ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ওড়াকান্দি বালিকা বিদ্যালয়ে উলবোনা, ব্লাউজ তৈরি, রুমাল তৈরি বিভিন্ন ধরনের সেলাইয়ের কলাকৌশল শেখানো হতো।[৯৯] অর্থাৎ এই কাজ গুলি ছাত্রীদের পারিবারিক কাজে আসতো, কিন্তু তাঁদের স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হবার কোনো দিশা মতুয়া ধর্মের গুরুরা দেখান নি।

১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলনেও নিম্নবর্ণের নারীদের ওপর পুরুষতান্ত্রিক অর্থনৈতিক শোষণের দিকটা সামনে চলে এসেছিল, সেখানে স্ত্রী ধন বলতে নারীরা হাঁসমুরগির ডিম বেচা, গরু ছাগল বিক্রি করে যে অর্থ পেতো সেটা বেশিরভাগ সময়েই সাংসারিক কাজে স্বামী, সন্তান নিয়ে নিত। ফলে তাঁদের হাতে কোনো অর্থ থাকতো না,স্বামী ও পুত্রের ওপর নির্ভর করতে হতো। কমিউনিস্ট পার্টির কিষান সভার মাধ্যমে গ্রামীণ কৃষক রমণীর এই অর্থ 'স্ত্রী ধন' হিসাবে স্বীকৃত হয়। রাজবংশী প্রধান উত্তারঞ্চলে এই অধিকার হিসাবে স্বীকৃত হয়।[১০০] দৈনন্দিন জীবনে তাদের যে অর্থের প্রয়োজন হতো সেটা 'স্ত্রীধন' বলে স্বীকৃত থেকে পেয়ে যেত। কিন্তু মতুয়া নারীদের 'স্ত্রীধন' কি ছিল সেটা জানা যায় না।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর তাঁদের আর অর্থনৈতিক ভাবে অবরোধ প্রথা উঠে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু মতুয়া নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হলেও পারিবারিক ক্ষেত্রে পুরুষ প্রাধান্য বজায় থাকে।

২.১২. মতুয়া নারীদের রাজনৈতিক অবস্থা

প্রথম দিক পর্ব থেকেই মতুয়া নারীদের রাজনীতিতে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহন করা সম্ভব হয় নি। কারন হিসাবে বলা যেতে পারে মতুয়া নারীদের জন্য পরিবারের কাজ-কম্মই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। মতুয়া ধর্মের প্রতিষ্ঠার পর তারা কখনো জন ক্ষেত্রটিকে (Public Sphere) ব্যবহার করতে পারিনি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যারা পুরুষতন্ত্রের অধীনে তখন তাঁদের জন্য রাজনীতিতে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহন করা ছিল কল্পনা অতীত। তবে মতুয়া ধর্মের

প্রবর্তক হরিচাঁদ ঠাকুর ও তার পুত্র গুরু চাঁদ ঠাকুর এবং প্রপৌত্র প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর মতুয়াদের রাজনীতিতে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহন করতে বলেছিলেন। তারা কাদের বলেছিলেন? পুরুষদের। মহানন্দ হালদার তার *শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিতে,* গুরুচাঁদ ঠাকুরের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের বক্তব্য তুলে ধরেছেন এই রূপ-

'আইন সভায় যাও আমি বলি রাজা হও।
দূর কর এ জাতির ব্যাথা'।।[১০১]

গুরুচাঁদ ঠাকুর বিশ্বাস করতেন যে, মতুয়াদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির প্রধান বিষয় হল শিক্ষা ও পেশাগত উন্নয়ন যা ঐতিহ্যগত ভাবে উচ্চবর্ণের অধিকার ভুক্ত, সরকারী সাহায্যের অনুকূলে বিশেষত ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া মুসলিমদের বিশেষ সুযোগসুবিধা আদায়ের মতোই মতুয়াদের আর্থ-সামাজিক দুর্বল অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব।মতুয়াদের শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগের দাবীতে অস্ট্রেলিয়ান মিশনারীর ডঃ সি.এস.মীডের পরামর্শ ও সহযোগিতায় গুরুচাঁদ ঠাকুর এবং তাঁর সহযোগী ভীস্মদেব দাস, শশীভূষণ ঠাকুর, তারিণী বালা, রাধামোহন বিশ্বাস এবং পূর্ণ চন্দ্র মল্লিক একত্রে, তৎকালীন 'পূর্ববঙ্গ ও আসামের' লেফটেন্যান্ট গভর্নর ল্যান্সলট হেয়ারের (Lancelot Hare) সঙ্গে ১৯০৭ সালের অক্টোবরে সাক্ষাৎ করেন। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১৯০৭ সালের 'Proportional Representation of Communities in Public Emplyoment Act'- মাধ্যমে মুসলিমদের সঙ্গে মতুয়াদের চাকরীর সুযোগ দেওয়া হয়।[১০২] ফলে ব্রিটিশদের সহিত মতুয়াদের একটা বিশেষ সম্পর্ক তৈরি হয়। যেখানে সমাজের উচ্চবর্ণের লোকজন ব্রিটিশদের বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। যাইহোক ১৯১২ সালে Bengal Namasudra Association গঠিত হয়, তখন থেকে মতুয়াদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে নিম্নবর্ণের রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করে নেয়। ১৯২১ সালে বাংলার বিধান পরিষদে ১৩৯জন সদস্যের মধ্যে দুই জন নিম্নবর্ণের সদস্য, ভীষ্মদেব দাস এবং নিরোধ বিহারী মল্লিক মনোনীত হন। আইন সভায় ভীষ্ম দেব দাস নিম্নবর্ণের সংরক্ষনের জন্য 'Bengal Self Government' ও 'Bengal Village Self Government Act 1919' আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে নিম্নবর্ণের প্রতিনিধিদের জন্য ৬ শতাংশ

সংরক্ষনের দাবি জানান[১০৩] পরবর্তীতে বিভিন্ন সংগঠন গঠিত(Bengal Depressed Classes Association,1935.Depressed Classes Association,1936) হয়েছে, মতুয়াদের মধ্যে থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তি প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, মুকুন্দ বিহারী মল্লিক, যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল,রসিক লাল বিশ্বাস ,রেবতি মোহন বিশ্বাস-এর মতো নেতৃত্ব বর্গের উথান ঘটেছে।সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা(১৯৩২)ভিত্তিতে পুনা চুক্তির মাধ্যমে নমশুদ্র সম্প্রদায় বাংলার যৌথ নির্বাচনী ব্যবস্থা ও বিধানসভায় নিম্নবর্ণের জন্য ৩০ টি আসন সংরক্ষিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১০৪] ১৯৩০-১৯৩৫ সালের মধ্যবর্তী পর্যায়ে নমশুদ্র আন্দোলনের নেতৃত্ব সংসদীয় সংরক্ষনে বিষয়ে এতোই মগ্ন আত্মনিয়োগ করে যে কৃষক প্রজাদের সংযোগ থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়ে।ফলে সংসদীয় রাজনীতিতে মতুয়া নারীদের অবস্থান কি হবে, তারা কি সেই সুযোগ পাবে, ৩০ টি আসনের মধ্যে তাঁদের কি কোনো আসন দেওয়া হবে কি না সেই বিষয়ে নেতৃত্ব বর্গের দৃষ্টি ছিল না। যেখানে মতুয়া ধর্মে নারীদেরও সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে, তাহলে রাজনীতিতে তাঁদের অবস্থান কেনো নির্দিষ্ট করা হয় নি? এই প্রশ্নোত্তরে বলা যেতে পারে, উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে লড়াই করা সুযোগ সুবিধা শুধু নিম্নবর্ণের পুরুষরাই ভোগ করতে চেয়েছে। তাঁদের কাছে উচ্চবর্ণ শুধু তাঁদের শোষণ করেছে, আর তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এই সম্পর্কে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়[১০৫] দেখিয়েছেন, নমঃশূদ্র নেতাগণ কীভাবে মতুয়া ধর্মের সমতার নীতির বিরোধিতা করে নারীদের ভোটাধিকারকে খর্ব করতে চেয়েছিল।‘The equality they demanded turned out to be an exclusively male equality. Mukunda Behari Mullick, one of the front ranking leaders of the Namasudra movement, in his oral deposition before the Indian Statutory Commission in 1928, demanded voting rights only for men’। মতুয়া নারীরা নিজেদের অধিকার দাবীর জন্য যদিও কোন ধরনের আন্দোলন বা প্রতিবাদটুকু করে নি। এই সময়ে তাদের মতো নিম্নবর্ণের নারীগণ কিষান সভার মাধ্যমে নিজেদের প্রতি যে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য, নির্যাতন করা হয়, তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। এবং কিষান সভার বিভিন্ন সভাতে তারা যোগদানও করেছিলেন। নিম্নবর্ণের মধ্যেও যে নারীদের পুরুষতান্ত্রিক শোষণের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তার আভাস পাওয়া যায়- ‘দিনাজপুরের কম্যুনিস্ট পার্টির এক সাধারণ সভার এক বহুজ্ঞাত ঘটনায় স্থানীয় পার্টি কমিটির এক সদস্যের স্ত্রী সম্পাদকের ভাষণের মধ্যেই বলে উঠেছিলেনঃ

কমরেড এমন কোন আইন আছে কি যাতে বলা আছে যে আপনি আপনার স্ত্রিকে পেটাতে পারেন? আমার স্বামী কেন মারবে আমাকে! আমি এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত চাই'।[১০৬] একই সামাজিক পরিবেশে মতুয়া নারীদের ও বৈষম্য, শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে দিনাজপুরের নিম্নবর্ণের নারীদের মতো সোচ্চার হতে দেখা যায় নি।

দেশভাগের আঁচ মতুয়া ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যেও পড়েছিল। ১৯৩৮ সালের পর বেশ কিছু হিন্দু সংগঠন মতুয়াদের মধ্যে হিন্দুত্ববোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে সফল ও হয়েছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল সর্ব ভারতীয় হিন্দু মহাসভা [১০৭]অমর দত্ত বলেছেন: ১৯৩৯-৪০ সাল থেকেই তফশিলি জাতি ভুক্ত কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠে। ১৯৪৪ সালের মধ্যেই পূর্ববাংলার বাখরগঞ্জ জেলায় এদের ৬৫ টি, ঢাকায় ৫০ টি, ফরিদপুরে ৪৩ টি, যশোরে ২৯ টি এবং খুলনায় ৩১ টি গ্রামীণ শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।মতুয়া তথা নমশুদ্রদের মধ্যে হিন্দুত্ববোধ জাগিয়ে তোলার এই যে সুসংবদ্ধ প্রয়াস তার প্রতিফলন আমরা দেখি এদের সঙ্গে স্থানীয় মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভিন্ন ঘটনা, যা পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই দাঙ্গা গুলোতে মহিলারা বিশেষ কারনে লক্ষ্যবস্ত করা হতো। ফলে মতুয়াদের একাংশ মহিলাদের সম্ভ্রম রক্ষার তাগিদে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে থাকে।

২.১২. পর্যবেক্ষণ

মতুয়া ধর্মের প্রবর্তক এবং গুরুচাঁদ ঠাকুর এই ধর্মীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে একটা সুসংহত পরিবার গঠনের চেষ্টা করেছিলেন, যেখানে নারীপুরুষ সকলের সমান অধিকার থাকবে। কিন্তু গার্হস্থ্য আদর্শ পরিবার গঠনের মধ্যে দিয়ে নারীদের সামাজিক, রাজনৈতিক, ও অর্থনৈতিক ভাবে অবরুদ্ধ করে রাখে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষই সমাজ, পরিবারের কর্ণধার হয়ে ওঠে, যেখানে নারীদের স্থান গৌণ। তাদের শুধু পরিবারে ধর্মীয় আদেশ, নির্দেশ, পালন করার স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং বিশুদ্ধ সন্তান পালন ও পুরুষদের সেবা করাই তাদের প্রধান কাজ হয়ে দাড়ায়। সিমোন দ্য বোভোয়ারের বিখ্যাত উক্তি- 'নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, নারী হয়ে ওঠে'।তেমনি মতুয়া নারীদের ক্ষেত্রে বলা যায় তারাও উচ্চবর্ণের নারীদেরকে অনুকরন করতে গিয়ে নিজেদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার হারিয়ে, সমাজের প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অধীনে 'আদর্শ নারী' হয়ে ওঠে।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. উমা চক্রবর্তী: *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ব্রাত্যজনের চোখে,* (কোলকাতা সেতু প্রকশনী, অনুবাদ অম্লান ভট্টাচার্য, জুলাই-২০১১)পৃ. ৮।

২. *তদেব*।

৩. সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী: *অন্দরে-অন্তরে উনিশ শতকের বাঙালী ভদ্রমহিলা,* (কলকাতা,স্ত্রী প্রকাশনী,১৯৯৫) পৃ.৩।

৪. *তদেব,*পৃ.৭।

৫. শ্রীপ্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়: বাংলার নারী জাগরন, (কলিকাতা,দৈনিক ভারত সম্পাদক, ব্রাহ্ম, ১৩৫২), পৃ. ২ ।

৬. *তদেব,* পৃ.৩ ।

৭. উমা চক্রবর্তী: *প্রাগুক্ত,* পৃ.১৩।

৮. মঞ্জুশ্রী সিংহ: *উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সংস্কৃতিতে বঙ্গমহিলা,* (কলিকাতা, শাল্মলী ,২০০০,), পৃ.১৫১।

৯. শমিতা সেন: *ভারতের নারী আন্দোলন: প্রেক্ষাপট ও সমস্যা,* বাসবী চক্রবর্তী (সম্পা.):নারী পৃথিবী: বহুস্বর,(কলিকাতা, উর্বি প্রকাশনী) পৃ.৩৬।

১০. সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী: *প্রাগুক্ত,* পৃ.৩।

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: *মানসী,*(কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৮)পৃ.১৭৬।

১২. মঞ্জুশ্রী সিংহ : *প্রাগুক্ত,*পৃ.১৭৬।

১৩. Meredith Borthwick: *The Changing Role of Women in Bengal, 1849–1905* (Princeton: Princeton University Press, 1984),পৃ.১৪৩।

১৪. সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী: *প্রাগুক্ত,*পৃ.৬।

১৫. হুমায়ূন আজাদ: *নারী,*(ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯২)পৃ.৩০১।

১৬. শিবনাথ শাস্ত্রী: *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,*(কোলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি,১৯০৪) পৃ.১২৫।

১৭. ছবি রায়:*বাংলার নারী আন্দোলন,(*কোলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৪৮)পৃ.৭৪)।

১৮. গোলাম মুর্শিদ: *হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি,*(ঢাকা,অবসর প্রকাশন,ডিসেম্বর,২০০৫)পৃ.২৪২।

১৯. *তদেব,*পৃ.২৪৩।

২০. *তদেব*।

২১. *তদেব,*পৃ.২৬৪।

২২. কমলা দাশগুপ্ত: *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী,*(কলিকাতা,বসুধরা প্রকাশনী, ১৯৫৭)পৃ.১৪৪।

২৩. *তদেব,*পৃ.১৪৭।

২৪. গোলাম মুর্শিদ: *প্রাগুক্ত,*পৃ.৩৬৫।

২৫. শমিতা সেন: *প্রাগুক্ত,*পৃ.৩৭।

২৬. রূপ কুমার বর্মণ: *বাঙালি নিম্নবর্ণ মানুষের সামাজিক অবস্থান ও অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম: সমাজ ও সাহিত্যের তুলনাত্মক বিশ্লেষণ'*(অন্তর্মুখ,বাংলা গবেষণা-পত্রিকা, পর্ব-৪, সঙ্খ্যা-২,ত্রৈমাসিক, অক্টোবর-ডিসেম্বর,২০১৪, খোকন কুমার বাগ,(সম্পা.)"সাম্পান",বাদশাহী রোড,ভাঙ্গাকুঠি, বর্ধমান,পৃ.পৃ.১৪-১৬)।

২৭. গোলাম মুর্শিদ: *সংকোচের বিহ্বলতার অভিঘাতে বঙ্গ রমণীর প্রতিক্রিয়া ১৮৪৯-১৯০৫*(নিউ দিল্লী, সাহিত্য একাডেমী,১৯৮৫)পৃ.৫৩।

২৮. সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী: *প্রাগুক্ত,*পৃ.৬।

২৯. Sekhar Bandyopadhyay: *Caste,Culture and Hegemony:Social Domiance in Colonial Bengal* (New Delhi,SAGE Publications), p.p.160-161 ।

৩০. *তদেব,*পৃ.153 ।

৩১. *তদেব,* পৃ.156।

৩২. মালেকা বেগম: *নারী মুক্তি আন্দোলন* (ঢাকা,বাংলা একাডেমী, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫) পৃ.২।

৩৩. প্রসেনজিত চৌধুরী: *মহারাষ্ট্রের নবজাগরণ ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন ও নারী জাগরণের এক অধ্যায়,*(কোলকাতা,সেতু,২০১৪),পৃ.৭৫।

৩৪. হিতেশ রঞ্জন সান্যাল: *বাঙলা কীর্তনের ইতিহাস,*(কোলকাতা,কে.পি.বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি,১৯৮৯), পৃ.৫১।

৩৫. রমাকান্ত চক্রবর্তী: *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম,*(কোলকাতা,আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি, ১৯৯৬)পৃ.১৩৯।

৩৬. পিটার কাস্টার্স: *তেভাগা আন্দোলনে নারী গ্রামীণ গরীব নারী ও বিপ্লবী নেতৃত্ব:১৯৪৬-১৯৪৭,*(কোলকাতা,অনুবাদক-কৃষ্ণা নিয়োগী, ১৯৯২) পৃ.৪০।

৩৭. *তদেব,*পৃ.৪২।

৩৮. মনোশান্ত বিশ্বাস: *বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ,সংস্কৃতি,রাজনীতি,*(কোলকাতা,সেতু,২০১৬), পৃ.পৃ.২৫২-২৫৩।

৩৯. অমিতাভ চক্রবর্তী: *বাঙালীর মনন:সম্প্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতা* (কলকাতা, একুশে,২০০০),পৃ.১২৩।

৪০. হরিদাস পালিত: *বঙ্গীয় পতিত জাতির কর্মী,*(কলিকাতা, গৃহস্থ পাবলিকেশন হাউস,১৩২২,)পৃ.২।

৪১. তদেব,পৃ.৩।

৪২. কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়: *নারী শ্রেণী ও বর্ণ*(কলকাতা,মিত্রম প্রকাশনী,২০০৯),পৃ.২৮।

৪৩. Towards equality: *Report of the Committee on the Status of Women in India,*(Government of India, Department of Social Welfare, Ministry of education and social Welfare, December 1974)p.238.

৪৪. প্রসেনজিৎ চৌধুরী: *প্রাগুক্ত,*পৃ.৬০।

৪৫. মনোশান্ত বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,*পৃ.১৭৭।

৪৬. কুনাল চট্টোপাধ্যায়: *তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস,*(কলকাতা,প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,পৃ.৫৭।

৪৭. পিটার কাস্টার্স: *প্রাগুক্ত,*পৃ.২০৯।

৪৮. *তদেব*।

৪৯. তারক চন্দ্র সরকার: *শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত,*(খুলনা,৬ষ্ঠ সংস্করণ, শ্রীশ্রী হরি গুরুচাঁদ মতুয়া মিশন, ১৪২১)পৃ.১০৯।

৫০. *তদেব*, পৃ.১০৭।

৫১. *তদেব*।

৫২. নন্দদুলাল মোহান্ত: *মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ*, (কলিকাতা,অন্নপূর্ণা, ২০০২)পৃ.পৃ.১৩৯,১৪০ ও১৪৪।

৫৩. সুধীর রঞ্জন হালদার: মতুয়া ধর্ম ও অনুষ্ঠানবিধি,(নদীয়া,প্রকাশিকা:কবরী রায়,২০১১),পৃ.২২ ।

৫৪. তারক চন্দ্র সরকার:*প্রাগুক্ত*,পৃ.২২৩।

৫৫. পুস্প বৈরাগ্য: *মেয়েলি ব্রত:নমঃশূদ্র সম্প্রদায়*,(কলকাতা,কল্যানী ঠাকুর চাঁড়াল(সম্পা.):নীড়,২০১৮),পৃ.৯৮।

৫৬. কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল:*চণ্ডালিনীর বিবৃতি*(কলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া,২০১২),পৃ.২৭।

৫৭. অনুপম হীরা মণ্ডল: *বাংলার ভাবান্দোলন ও মতুয়া ধর্ম*,(ঢাকা,গতিধারা,২০০৭),পৃ.১০৩।

৫৮. শ্রীকান্ত ঠাকুর:*শ্রীশ্রী গোপালচাঁদ চরিত্র সুধা*,(গোপালগঞ্জ, প্রকাশক:সুধাংশু শেখর মালাকার,২০০৯)পৃ.৪৭১।

৫৯. স্বরুপেন্দু সরকার: *সমাজ সংস্কারে মতুয়া* (খুলনা, কঙ্কা প্রকাশনী, ২০০২),পৃ.৬২।

৬০. তারক চন্দ্র সরকার: *প্রাগুক্ত*,পৃ.৮।

৬১. Sekhar Bandyopadhyay: *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৪৫।

৬২. তারক চন্দ্র হালদার: *প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৯।

৬৩. মনোশান্ত বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৪

৬৪. Sekhar Bandyopadhyay: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪৬।

৬৫. তারক চন্দ্র সরকার: *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬।

৬৬. কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর: *মতুয়া আন্দোলন ও বাংলার অনুন্নত সমাজ*(কোলকাতা,নিখিল ভারত, ১৯৯৪)পৃ.পৃ.২৯-৩০।

৬৭. মনোশান্ত বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৫।

৬৮. শ্রী বিচরন পাগল: *শ্রীশ্রী হরিগুরুচাঁদ চরিত্র সুধা*, (উত্তর ২৪ পরগণা, ১৪১৯)পৃ.৭৭।

৬৯. অনুপম হীরা মণ্ডল:*প্রাগুক্ত*,পৃ.১০৩।

৭০. *তদেব,*পৃ.১০১।

৭১. হরিদাস পালিত: *প্রাগুক্ত,* পৃ.৩

৭২. শ্রী বিচরন পাগল:*প্রাগুক্ত,* পৃ.৯৩।

৭৩. চপলা রায় মজুমদার: *ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারী* (পলতা,প্রকাশক:কুমুদ রঞ্জন মজুমদার,২০১৭),পৃ.১৩।

৭৪. মহানন্দ হালদার: *শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত,*(ঠাকুরনগর, শ্রী কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত,২০০৯),পৃ.৩৭১।

৭৫. নন্দদুলাল মোহান্ত: *প্রাগুক্ত,*পৃ.৯৮।

৭৬. মহানন্দ হালদার: *প্রাগুক্ত,* পৃ৩৯৯)

৭৭. *তদেব,*পৃ.৪৭।

৭৮. তারক চন্দ্র সরকার:*প্রাগুক্ত,*পৃ.২২৩।

৭৯. মনোশান্ত বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,*পৃ.২৪৩।

৮০. হরিবর বালা ঠাকুর: *বড় মা বীণাপানি দেবীর চরিত্র সুধার আলোকে মতুয়া ধর্মে নারীদের অবদান,*(ঠাকুরনগর,প্রকাশক:সঞ্জীব কুমার বালা ঠাকুর, ২০১৮) পৃ.পৃ.১১,১২।

৮১. মনোশান্ত বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,*পৃ.১৮২।

৮২. মহানন্দ হালদার: *প্রাগুক্ত,*পৃ.৩৭২।

৮৩. শিবনাথ শাস্ত্রী: *প্রাগুক্ত,* পৃ.২০৩।

৮৪. প্রসেনজিত চৌধুরী: *প্রাগুক্ত,* পৃ.৮৭

৮৫. মনোশান্ত বিশ্বাস: প্রাগুক্ত,পৃ.১৩৩।

৮৬. Sekhar Bandyopadhyay:*প্রাগুক্ত,*পৃ.১৫৪ ।

৮৭. রূপ কুমার *বর্মন:বাংলার নিম্নবর্ণীয় (তফশিল) মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান, বিকাশ ও বর্তমান পরিস্থিতি,* (অন্তর্মুখ-বাংলা গবেষণা পত্রিকা, পর্ব-৩,সঙ্খ্যা-৩, জানুয়ারি- মার্চ,২০১৪, বাগ, স্বপন কুমার বাগ,(সম্পা.)পৃ.১০৯।

৮৮. তারক চন্দ্র সরকার: *প্রাগুক্ত,*পৃ.৬২।

৮৯. *তদেব,*পৃ.৫১।

৯০. *তদেব,*পৃ.৬১।

৯১. Sekhar Bandyopadhyay:*প্রাগুক্ত,* পৃ.১৫৩।

৯২. পরমানন্দ হালদার: *মতুয়া ধর্মদর্শন,*(ঠাকুর নগর, ১৩৯৩) পৃ.৮৯।

৯৩. মনোশান্ত বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,*পৃ.৫৬।

৯৪. Sekhar Bandyopadhyay:*প্রাগুক্ত,*পৃ.১৫৪।

৯৫. স্বরূপেন্দু সরকার: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ.৯৩-৯৪।

৯৬. নন্দদুলাল মোহান্ত: *প্রাগুক্ত,*পৃ.২৭৯।

৯৭. রবি প্রভা সরকার: *নারী মুক্তি আন্দোলন শ্রীধাম ওড়াকান্দি* (নদীয়া, হরিচাঁদ সেবাসঙ্ঘ পত্রিকা,জানুয়ারি- মার্চ ,২০০০) পৃ.২৫।

৯৮. মহানন্দ হালদার: *প্রাগুক্ত,*পৃ.৩৭১।

৯৯. মনোশান্ত বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,* পৃ.১৭৪।

১০০. পিটার কাস্টার্স: *প্রাগুক্ত,*পৃ.২০৯।

১০১. মহানন্দ হালদার: *প্রাগুক্ত,*পৃ.২২৩।

১০২. মনোশান্ত বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,*পৃ.২৩১।

১০৩. নন্দদুলাল মোহান্ত: *প্রাগুক্ত,* পৃ.২০৯।

১০৪. মনোশান্ত বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,* পৃ.২৪২।

১০৫. Sekhar Bandyopadhyay:*প্রাগুক্ত,*পৃ.১৫৪।

১০৬. পিটার কাস্টার্স: *প্রাগুক্ত,* পৃ.২০৯।

১০৭. অমর দত্ত: *উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলাদেশে হিন্দু জাতিয়তাবাদ,*(কোলকাতা,প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,১৯৯৪),পৃ.৫৬।

তৃতীয় অধ্যায়

উদ্বাস্তু ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর পর্বে মতুয়া নারী (১৯৪৭-১৯৯০)

৩.১.দেশভাগ ও উদ্বাস্তু আগমন

স্বাধীনতার জন্মলগ্নে ১৯৪৭ সালের জুলাই, এক সাংবাদিক সম্মেলনে মোহম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন-

'সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে প্রতিবারই আমি যাহা বলিয়াছি তাহাতে কখনোই মনে এক কথা, মুখে আর এক কথার ভাব ছিল না-এখন ও নাই। সংখ্যালঘুরা যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, পাকিস্থানে তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে; তাহাদের ধর্ম ও ধর্মগত বিশ্বাস সর্বতোভাবে রক্ষিত হইবে। তাহাদের জীবন ও ধন- সম্পত্তির নিরাপত্তার বিধান করা হইবে। তাহাদের পূজা অর্চনায় বা স্বাধীনতায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না। এক কথায় তাহাদের ধর্ম, ধন প্রান এবং সংস্কৃতি রক্ষার সর্ব প্রকার ব্যবস্থাই করা হইবে। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তাহাদের সর্বতোভাবে পাকিস্থানের নাগরিক বলিয়া গন্য করা হইবে।[১]

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দেশভাগের সময় থেকেই পূর্ব বঙ্গের হিন্দুরা দেশ ছাড়তে শুরু করে। ১৯৪৬ সালের ১৬ ই আগস্ট কোলকাতার বুকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বীভৎস রূপ দেখে, নোয়াখালীর হিন্দু মা- বোনের উপর পাশবিক অত্যাচারের রূপ দেখে পূর্ব পাকিস্থানে হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায় নিরাপত্তা বোধ করছিল না। ফলে দেশভাগের সময় থেকে তারা মনস্থির করেছিল নিজেদের বিশেষ করে স্ত্রী কন্যার সম্ভ্রম বাঁচানোর তাগিদে দেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেবে। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী *'প্রান্তিক মানব*[২] গ্রন্থে জানিয়েছেন-' দেশ বিভাজনের পরেও হিন্দুরা চলে আসতে থাকে। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বরে হায়দ্রাবাদে কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশি ব্যবস্থার পরেই আবার উদ্বাস্তু প্রবাহ খরবেগে বইতে শুরু করে। বলা যেতে পারে, ১৯৪৯ সালে হিন্দু সংখ্যা লঘুদের পূর্ব পাকিস্থান থেকে চলে আসার প্রথম পর্যায় শেষ হয়। প্রথম পর্যায়ে যেসব উদ্বাস্তু হিন্দুরা চলে এসেছিল তাদের সংখ্যা এই রকম- ১৯৪৮ সালের মার্চে তাদের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ। এই বছরের জুনে তাদের সংখ্যা পৌঁছে যায় ১১লক্ষে। এই ১১ লক্ষ উদ্বাস্তুদের মধ্যে ৩ লক্ষ ৫০

হাজার ছিল শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ৫ লক্ষ ৫০ হাজার গ্রামীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ১ লক্ষেরও বেশি ছিল কৃষক, এবং ১লক্ষের ও কম ছিল কৃষির সঙ্গে যুক্ত কারিগর'। প্রথম পর্যায়ে দেখা যায় বিশেষ করে ধনী ব্যক্তি বর্গ পূর্ব পাকিস্থান ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। এই সম্পর্কে একই অভিমত পাওয়া যায় আশিস হীরার গ্রন্থে[৩] উদ্বাস্তুদের আগমনের চারটি পর্যায় দেখিয়েছেন:

১) প্রথম পর্যায়: ১৯৪৬-১৯৪৯;

২)দ্বিতীয় পর্যায়: সেপ্টেম্বর ১৯৫০-১৯৫২;

৩) তৃতীয় পর্যায়: ১৫ ই অক্টোবর ১৯৫২-১৯৬০(১৫ই অক্টোবর ১৯৫২,পাসপোর্ট প্রথা চালু হয়।);

৪) চতুর্থ পর্যায়: ১৯৬১-১৯৭০।

প্রথম পর্যায়ে,১৯৪৬-১৯৪৯; যারা দেশত্যাগ করেছে, তারা ছিল সমাজের উঁচু শ্রেণীর মানুষ। দেশভাগের আগে থেকেই তাদের রাজধানী কোলকাতার সঙ্গে যোগসূত্র ছিল। অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ এই শ্রেণীর মানুষ ছিল শতকরা ১৫ জন; যাদের অধীনে আশি শতাংশ জমির মালিকানা ছিল। নিজেরা সেই জমি চাষ করতো না। তাদের জমিতে ফসল ফলাত গরিব মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দু। অধিকাংশ ব্যবসায়ের মালিকানা ছিল তাদের হাতে; সরকারী চাকরিতেও একক আধিপত্য থাকায় তাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ছিল বংশ পরম্পরা। মনোশান্ত বিশ্বাস[৪] বলেছেন-' ১৯৫০ দশকের আগে আসা উদ্বাস্তুগনের মধ্যে অধিকাংশই পূর্ব বঙ্গের হিন্দু সমাজের সম্পদশালী ও উচ্চবর্ণের মানুষ ছিলেন। উচ্চবর্ণের মানুষের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত দক্ষতা তাদের আত্মনিরাপত্তার সহায়ক ছিল। স্বাধীনতার সময়কালে সরকারী প্রস্তাব অনুসারে সরকারী চাকুরীজীবীদের পূর্ব পাকিস্থান বা পশ্চিমবঙ্গের যে কোন অংশে সরকারী চাকরি গ্রহণের স্বেচ্ছাধিকার দেওয়া হয়েছিল। উচ্চ শ্রেণীর জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীগন শিক্ষা লাভ, চাকুরী ও ব্যবসায়ের কারনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের মানুষের সঙ্গে পূর্ব থেকেই ঐতিহ্য গত দিক দিয়ে আত্মীয়তা ও পরিচিতির সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল।ফলে উচ্চবর্ণের মানুষ দেশ ভাগ জনিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় গৃহহীন ও সম্পদহীন হলেও নিম্নবর্ণের উদ্বাস্তু মানুষের মতো নিঃস্ব ও রিক্ত ছিল না বরং পশ্চিমবঙ্গে তাদের আত্মীয় স্বজনের কাছে 'A warm welcome, a home or homely atomsphere' পেয়েছিল। সুতারাং প্রথম পর্বে আগত অধিকাংশই উচ্চবর্ণের বা উচ্চবিত্তের

উদ্বাস্তুগন সম্পদ ও নগদ অর্থের মাধ্যমে, আত্মীয় স্বজনের সহানুভূতির উপর নির্ভর করে, জমি জায়গা ক্রয় করে বাসস্থান এবং ব্যবসার মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসে।

দ্বিতীয় পর্যায়: সেপ্টেম্বর ১৯৫০-১৯৫২; হিন্দু সংখ্যালঘুদের দেশ ছেড়ে চলে আসার পর্যায় শুরু হয় ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। হিন্দু নারীদের পিতা অথবা স্বামীর থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য সংখ্যা গুরু মুসলমানেরা যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন শুরু করে, তাঁর ফলে যন্ত্রণায় কাতর,নিরুপায়, পুরোপুরি নিঃস্ব এক বিপুল জনগোষ্ঠী এক বিশাল হিম বাহের মতো পশ্চিমবঙ্গে আছড়ে পড়ে। সংগঠিতভাবে হিন্দু পুরুষদের হত্যা, নারী অপহরণ এবং তাদের ধন- সম্পত্তি লুণ্ঠন শুরু হয় পূর্ব পাকিস্থানের বাগেরহাটে ও পরবর্তীতে ছড়িয়ে পরে অন্যান্য অঞ্চলে।দীনেশ চন্দ্র সিংহ[৫] জানিয়েছেন, '...কোন রকম পূর্বাভাষ ছাড়াই ১৯৫০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে পূর্ব বঙ্গের ১২ টি জেলায় হিন্দু বিরোধী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। এই দাঙ্গায় এক ধাক্কায় প্রায় ৩৫ লাখ হিন্দু চলে এল পশ্চিমবঙ্গে, ত্রিপুরায়, আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং কাছার জেলায়'। ১৯৫০ সালে উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের জীবন, মান- সম্মান ও ধন –সম্পদের নিরাপত্তার রক্ষার তাগিদে ১৯৫০সালে 'নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি' স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কারন দেখা যায় যে, ১৯৫০-৫৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্থানের বিভিন্ন স্থানে ৮০১২ টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয় এবং নমঃশূদ্ররাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তৃতীয় পর্যায় হিসাবে (১৫ই অক্টোবর ১৯৫২-১৯৬০): ১৯৫২ সালের ১৫ই অক্টোবর পাকিস্থান সরকার একক ভাবে পাসপোর্ট প্রথা চালু করে, ফলে সংখ্যালঘুরা শঙ্কিত হয়। তাদের ধারণা হয়, এর পরে আর যাতে সহজে দেশত্যাগ করতে না পারে তাঁর জন্য সরকারের এই কৌশল। ফলে দেশত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। ১৯৫৪ সালের অর্ডিন্যান্সে জারি করা হয়, সরকারের অনুমতি ছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবে না। ফলে অনেক সংখ্যালঘু নিজেদের নিরাপত্তাহীন মনে করে দেশত্যাগ করে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মধ্যে উদ্বাস্তু শিবির ও উদ্বাস্তু জনসংখ্যার বিষয়ে তুলনামূলক পরিসংখ্যান:[৬]

জেলা	উদ্বাস্তু শিবিরের সংখ্যা	বসবাসকারী মোট উদ্বাস্তু জনসংখ্যা
২৪ পরগণা	৫৩	৪৯,৪১৭
নদীয়া	৭	৬২,৭৯৭
বর্ধমান	৩১	৪৬,৬৪৬
হুগলী	১৮	২৩,৩২৩
হাওড়া	৮	৯,৬৩৬
বাঁকুড়া	৭	১২,৬৫৩
বীরভূম	১৭	২১,৯৮৪
মুর্শিদাবাদ	১১	১৪,৮৪৪
মেদিনীপুর	১৩	১৮,৩৮৬
পশ্চিম দিনাজপুর	১	১,০৫৬
কোচবিহার	১	১,৪২৫
কোলকাতা	৭	৬,১৪৪
পশ্চিমবঙ্গ	১৭৪	২,৬৮,০৪০

চতুর্থ পর্যায়ঃ ১৯৬১-১৯৭০;

১৯৬০-৬১ সালে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু আগমনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়। ১৯৬২-তে পাবনা ও রাজশাহীতে সংখ্যালঘুদের হত্যা করা হয়। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কাশ্মীরের হযরতবাল মসজিদ থেকে হযরত মোহম্মদের এক গোছা চুল অপহরণের ঘটনা নিয়ে ভারত–পাকিস্তানে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা যায়। ভারতে সাম্প্রদায়িক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পূর্ব পাকিস্থানের যশোর, খুলনা,বাগেরহাট প্রভৃতি নমঃশূদ্র অধ্যুষিত এলাকায় মুসলিমরা ব্যাপক অত্যাচার চালায়। পূর্ব পাকিস্থান থেকে প্রায় ১২ লক্ষ হিন্দু জনগন অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়।[৭]

১৯৬১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহনকারী ৩০,৬৮,৭৫০ জন উদ্বাস্তুদের মধ্যে বেশীর ভাগই ৮টি জেলায় আশ্রয় নেয়। এর মধ্যে সব চেয়ে বেশী ছিল উত্তর ২৪ পরগণা জেলাতে।

১৯৬১ সালের সেন্সাস রিপোর্টের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কয়েকটি উদ্বাস্তু অধ্যুষিত জেলার পরিসংখ্যান:[৮]

জেলা ও রাজ্য	মোট	গ্রামীণ উদ্বাস্তু	শহুরে উদ্বাস্তু
পশ্চিমবঙ্গ	৩০,৬৮,৭৫০	১৫,০৭২২০	১৫,৬১,৫৩০
২৪ পরগণা	৭,৮৬,৬৬১	২,৯৭,১৬৪	৪,৮৯,৪৯৭
কোলকাতা	৫,২৮,২০৫		৫,২৮,২০৫
নদীয়া	৫,০২,৬৪৫	৩,৮১,০০৯	১,২১,৬৩৮
কোচবিহার	২,৫২,৭৫৩	২,২৭,৬২৮	২৫,১২৫
জলপাইগুড়ি	২,১৮,৩৪১	১,৭১,৬১৭	৪৬,৭২৪
পশ্চিম দিনাজপুর	১,৭২,২৩৭	১,২৫,১৫৫	৪৭,০৮২
বর্ধমান	১,৪৪,৭০৪	৮১,৮৪১	৬২,৮৬৩
হুগলী	১,৩০,৯৫১	৩৮,৬৬৩	৯২,২৮৮

১৯৬৪ সালে ভারত–পাক যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকার ‘প্রতিরক্ষা অর্ডিন্যান্সের’ মাধ্যমে হিন্দুদের জমি-জমা বিক্রি বন্ধ করে দেয় এবং তাদের সম্পত্তি ‘শত্রু সম্পত্তি’ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ফলে দেখা যায়, ভারত পাক দেশের বিক্ষিপ্ত সাম্প্রদায়িক সমস্যা, উচ্চ পর্যায়ের সরকারী নীতির কারনে সাধারণ মানুষের দুর্গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্থান থেকে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বিশেষ করে মতুয়ায়ারা নিঃস্ব ও রিক্ত হস্তেই পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হিসাবে প্রবেশ করেছে। ১৯৬৪ সালে ৪ লক্ষ ১৯ হাজার উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। এই ব্যাপক সংখ্যক উদ্বাস্তুগন বিশেষ করে মতুয়ারা তাদের পূর্বসুরির মতো নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা,বেনাপোল, হেলেঞ্চা, গেদে, রাণাঘাট প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে।[৯] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল বরকত ও

শফিকউজ্জামানের একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে- শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইনের দরুন সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের ২০ লক্ষ একরের বেশি জমি হারাতে হয়েছে।[১০]

কিন্তু আশিস হীরা চতুর্থ পর্যায় অবধি উদ্বাস্তুদের আগমনের বিবরন দিলেও পরবর্তীকালে বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের সময় আগত শরণার্থীদের সম্পর্কে আলকপাত করেন নি। যেখানে প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী[১১] উল্লেখ করেছে এই ভাবে: 'এর পর পূর্ব পাকিস্থান থেকে হিন্দুদের যে অভিপ্রায়ান ঘটে, তা বাংলাদেশের জন্ম যন্ত্রণার সাথে জড়িত। ২.৭০ লক্ষ হৃতসবর্স্ব মানুষ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়। পূর্ব পাকিস্থান যখন বাংলাদেশে রূপান্তরিত হল,অনেক পরিবর্তন হল কিন্তু পালটাল না শুধু হিন্দুদের চলে আসাটা।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালে ভারতে তিনটি আদমশুমারি করা হয়। তার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার সঙ্গে ১৯৫১ সাল, ১৯৬১ সাল ও ১৯৭১ সালে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু জনসংখ্যার অনুপাত নীচে উল্লেখ করা হল:

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম তিনটি আদমশুমারি রিপোর্টের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু জনসংখ্যার অনুপাত[১২]:

সাল	মোট জনসংখ্যা	পূর্ব বঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার তুলনায় উদ্বাস্তু জনসংখ্যার হার
১৯৫১	২,৪৮,১০,৩০৮	২১০৪২৪১	৮.৪৮%
১৯৬১	৩৪৯২৬২৭৯	৩০৬৮৭৫০	৮.৭৮%
১৯৭১	৪৪৩১২০১১	৬৭৩২৪৭৫	১৫.১৯ %

মুজিবের আমলে এবং ইন্দিরা গান্ধীর চাপে সাময়িক ভাবে ঘর ছেড়ে চলে আসা হিন্দুরা ফিরে গেল'। কিন্তু হিন্দুদের এই সুখ বেশি দিন সহ্য হল না। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু এবং জিয়াউর রহমানের(১৯৭৭-১৯৮১)সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের(১৯৮৩-১৯৯০) রাজ ক্ষমতা দখল বাংলাদেশকে একটা ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করার মধ্যে দিয়ে সংখ্যা লঘু হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করে, ফলে মতুয়া ধর্মাবলম্বীরা আর্থ- সামাজিক ও রাজনৈতিক কারনে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে

থাকে। সন্তোষ রানা[১৩] বলেছেন:'১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের নমশুদ্রদের সংখ্যা তফসিলি জাতির মধ্যে ছিল ১১.১ শতাংশ, ১৯৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ১৬.১ শতাংশে।১৯৪১ সালের পর থেকে পূর্ব পাকিস্থান থেকে বাংলাদেশ হওয়ার পর হিন্দু জনসংখ্যা যে পরিমান কমেছে তার একটা সারনি নিচে দেওয়া হল[১৪]।

বছর	হিন্দু জনসংখ্যা	মুসলমান জনসংখ্যা
১৯৪১	২৮.০	৭০.৩
১৯৫১	২২.০	৭৬.৯
১৯৬১	১৮.৫	৮০.৪
১৯৭৪	১৩.৫	৮৫.৪
১৯৮১	১২.১	৮৬.৭
১৯৯১	১০.৫	৮৮.৩

৩.২.মতুয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আগমন

১৯৪০ সালের প্রথম দিক থেকেই মতুয়া ধর্মীয় সম্প্রদায় মধ্যে দুটি বিভাজন রেখা স্পষ্ট হয়ে যায়, একদিকে ফেডারেশন পন্থী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, মুকুন্দ বিহারী মল্লিক, জগবন্ধু মণ্ডল, প্রমুখ নেতৃত্ব মুসলিম লীগের সঙ্গে মিলিত ভাবে যৌথ রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন এবং স্বাধীনতা ও বঙ্গ বিভাগের পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্থানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন।ফলে মতুয়াদের বেশিরভাগ অংশই তাৎক্ষণিক পূর্ব পাকিস্থান ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারে নি। আবার অন্যদিকে 'প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, মহানন্দ হালদার, কমলা কান্ত দাস প্রমুখ স্বল্প সংখ্যক নমঃশূদ্র নেতৃত্ব যারা মতুয়া ধর্মীয় অনুগামী ছিলেন তারা দেশ ভাগের প্রাক্কালেই পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় গ্রহন করেন'।[১৫] এই সময় থেকেই বগুলা ও তার পাশ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে পূর্ব বঙ্গ থেকে আগত নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের আগমন ঘটে এবং ধীরে ধীরে নদিয়ার মাঝদিয়া,বগুলা ও বেতাই, হেলেঞ্চা অঞ্চলে তারা কম দামে গ্রামের জমি কিনে বসতি স্থাপন করে। তারা কৃষি জীবী পেশা গ্রহন, কৃষি শ্রমিকের কাজে যুক্ত হয়ে এবং শিক্ষা গ্রহনকে হাতিয়ার করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসার চেষ্টা করা শুরু করে। মনোশান্ত

বিশ্বাস[১৬] জানিয়েছেন, 'প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর তার সহযোগী মহানন্দ হালদার, ভুপেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিধু বিশ্বাস, মহেন্দ্র রায়, চিত্তরঞ্জন কাহালী, শিবতোষ দাশগুপ্ত প্রমুখের সঙ্গে আলোচনা করে একে অপরের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে স্থানীয় জমির মালিকদের কাছ থেকে কম দানে জমি কিনে 'Thakur Land and Industries' গঠন করেন, যেখানে নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের মধ্যে প্লট আকারে জমি বণ্টন করা হয়েছিল'। একই রকম ভাবে, বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার সাতপাড় গ্রামের কুলদা রঞ্জন বিশ্বাস এবং তার সাথে বেশ কিছু পরিবার হাবড়া থানার কাশীপুর গ্রামের নাংলা বিল অঞ্চল পরিস্কার করে বসতি স্থাপন করেছিল, বর্তমানে যেটি সাতপাড় উত্তর পাড়া নামে পরিচিত।[১৭] এই অঞ্চলে দেশভাগের পরবর্তীতে আগত লোকজনের বসতি রয়েছে, বিশেষ করে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এসেছিল পূর্ব বঙ্গের গোপালগঞ্জ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা শরণার্থীগণ।

১৯৫০ সালে আগত মতুয়াদের সংখ্যা ছিল অধিক, পূর্ব পাকিস্থানের যেসব অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছিল সেই সব অঞ্চলে নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ধর্মাবলম্বী অধিকাংশ ছিল। বরিশাল যে অঞ্চলে যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডলের গ্রাম ছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হাত থেকে বরিশাল কে তিনি রক্ষা করতে না পেরে মন্ত্রী পদ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। ১৯৫১-৫২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে প্রথম পর্যায়ে আগত নমঃশূদ্র জাতি সম্প্রদায় নদীয়ার বগুলা, রাণাঘাট, মাঝদিয়া, বেতাই এবং ২৪ পরগনা ঠাকুর নগরের 'বেঙ্গল রিলিফ সোসাইটির'র প্রচেষ্টায় পুনর্বাসন পেয়েছিল। '২৫ শে মে ১৯৫২ সালে 'Thakur Land and Industries' কোম্পানির অবলুপ্তি ঘটে এবং ঠাকুরনগর কলোনী বৃহত্তর ঠাকুর নগর জনপদ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে'।[১৮]

উদ্বাস্তুদের সংখ্যার বিচারে কয়েক লক্ষ হওয়ার ফলে বেশ কিছু সরকারী উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। উদ্বাস্তুদের থাকার জন্য পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন স্থানে তড়িঘড়ি শুরু হয় ক্যাম্প তৈরির কাজ। এর মধ্যে কতক গুলি বেশ বড় আকারের। নদীয়া জেলার কুপার্স ক্যাম্প, ধুবুলিয়া ক্যাম্প; বর্ধমানের পাল্লা, মহেশডাঙ্গা প্রভৃতি ক্যাম্প সরকারী উদ্যোগে উদ্বাস্তুদের আশ্রয়স্থল হিসাবে বেশ জোরালো জায়গা করে নেয়। সরকার পূর্ববঙ্গের গৃহ হারা মানুষের জন্য মোট পাঁচ ধরনের আবাসস্থল গড়ে তোলে। এগুলি নিম্নরূপ:

১) ট্রানজিট ক্যাম্প;

২)পি এল ক্যাম্প;

৩)উইমেন্স ক্যাম্প

৪)ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্প

৫) স্থায়ী ভাবে পুনর্বাসনের জন্য ক্যাম্প বা কলোনী[১৯]

এছাড়া আরেক ধরনের ক্যাম্প তৈরি হয়, যার নাম 'জবরদখল কলোনি'

যদিও মহিতোষ বিশ্বাস[২০] তার 'পরতাল' উপন্যাসে চারটি ভিন্ন ধরনের কলোনির কথা উল্লেখ করেছেন:

১) রাণাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প;

২)উইমেন্স ক্যাম্প;

৩) নয়া কল্যাণ পুর সমবায় কলোনি;

৪)নমো পাড়া (জবর দখল কলোনি);

এই ক্যাম্প গুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য ছিল রাণাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প, সেখানের উদ্বাস্তুদের মধ্যে ৯০ শতাংশ ছিল নমঃশূদ্র উদ্বাস্তু। অন্য ক্ষেত্রে প্রায় ৭৮ শতাংশ নমঃশূদ্র ক্যাম্প গুলির মধ্যে সালানপুর, মহেশডাঙ্গা, ঘুশুরি, দক্ষিনসোল, শালবনি, বাঁকুড়ার শ্রী পল্লী, শিরোমণি ক্যাম্প প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।[২১] বাঁকুড়ার শিরোমণি ক্যাম্পে বসবাসকারী উদ্বাস্তু মনোরঞ্জন ব্যাপারীর[২২] প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে ক্যাম্প সম্পর্কে জানা যায়, তিনি বলেছেন:'ক্যাম্প গুলির অবস্থা ভালো ছিল না। হাত দশেক লম্বা আর হাত পাঁচেক চওড়া লাল লাল তাবুর মধ্যে গুঁজে দেওয়া হত এক একটি পরিবারকে, পেতে কিছু গোঁজবার জন্য দেওয়া হতো প্রতি চৌদ্দ দিন পরে চালের মতো জিনিস, রান্না করলে একটা টকটক গন্ধ ছাড়ত, খেলে পেটে মেঘ ডাকতো। ক্যাম্প গুলিতে চিকিৎসার জন্য ডাক্তার এবং ওষুধ ব্যবস্থা ছিল কিন্তু 'বাবু ডাক্তারদের' রুগী দেখার সময় ছিল না। আর ওষুধ বলতে ছিল, একটা বোতলে হাল্কা আলতা গোলা, আর একটা বোতলে সামান্য চুন গোলা কিছু জল, কিন্তু শালা বাঙাল চাঁড়াল- নমঃশূদ্র বাচ্চা গুলো ঐ ওষুধে সেরে

ওঠার চেয়ে মরে যাওয়াটাই বেশি পছন্দ করতো, আর তাই আনন্দে মরে যেতো'। কলিকাতার পাশ্ববর্তী ক্যাম্প গুলির তুলনায় জেলার ক্যাম্প মূলতঃ নমঃশূদ্র ক্যাম্প গুলির অবস্থা ছিল শোচনীয়। পশ্চিমবঙ্গের ক্রমবর্ধমান উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যার সমাধানের জন্য পুনরায় ১৯৫৭-৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের মধ্যবর্তী ৮০ হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে 'দণ্ডকারন্য পুনর্বাসন পরিকল্পনা' গ্রহন করেন এবং এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে দণ্ডকারন্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠন করা হয়।[২৩] যদিও 'দণ্ডকারন্য পুনর্বাসন পরিকল্পনা' নিয়ে নমঃশূদ্রদের মধ্যে বিভাজন রেখা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর ও কংগ্রেস সরকার অন্য দিকে যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল ও কমিউনিস্ট পার্টি। United Central Refugee Council (UCRC) এবং বামপন্থী নেতৃত্বে উদ্বাস্তু আন্দোলনের অভ্যন্তরে কেবল বাংলার ভিতরে পুনর্বাসনের দাবি দীর্ঘ সময় ধরে প্রচারে উদ্বাস্তুদের প্রাত্যাহিক জীবনকে বিক্ষিপ্ত ও বিভাজিত করে তুলেছিল। প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর যদিও 'দণ্ডকারন্য পুনর্বাসন পরিকল্পনাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।[২৪] ১৯৫৬ সাল থেকে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী হিসাবে নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন, ১৯৬৭ সালের লোকসভা ও বিধান সভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে সমর্থনের পরিবর্তে বামপন্থী পার্টি গুলিকে সমর্থন করতে শুরু করে।[২৫]

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্থানের স্বাধীনতার দাবীকে কেন্দ্র করে যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে তাঁর ফলেও বহু নমঃশূদ্র তথা মতুয়া ধর্মের অনুগামীরা শরণার্থী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাহায্য ও সমর্থনের কারনে পূর্ব বঙ্গের শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় দেওয়া হয় ,তাঁদের কিছু সংখ্যক পরবর্তীকালে বাংলাদেশে ফিরে গেলেও অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকে।মনোশান্ত বিশ্বাস[২৬] দেখিয়েছেন,পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের জনগন বামপন্থীদের সমর্থন করে। বামপন্থী নেতৃত্ব সচেতন ভাবে কৃষক, ভাগচাষী, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার এবং সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য কৃষক সমিতির নেতৃত্বে জোতদার ও ধনী কৃষক বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। কংগ্রেস শাসনকালে নিত্যনৈমিত্তিক দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, খাদ্য সমস্যা নিয়ে বামপন্থীরা যেমন সরব হয়েছে তেমনি রুটি, জমি, বাসস্থান, বেকার সমস্যার কথা তুলে নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষ ও উদ্বাস্তুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসলে দণ্ডকারণ্য থেকে উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়, সতীশ চন্দ্র মণ্ডল এবং রাই চরন বাড়ৈ-এর নেতৃত্বে 'উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি' সাংগঠনিক প্রচারের দ্বারা ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে প্রায় ৩০-৩৫ হাজার উদ্বাস্তু ২৪ পরগনার সুন্দরবনের 'মরিচ ঝাঁপি' দ্বীপে আশ্রয় নেয়। যাদের অধিকাংশ নমঃশূদ্র কৃষিজীবী।[২৭] ১৯৭৯ সালের ২৪ জানুয়ারি তাদের নদী অতিক্রম করে খাদ্য পানীয় জল নেওয়ার পথ রুদ্ধ করে সামরিক কায়দায় অর্থনৈতিক অবরোধ ও বিছিন্ন করে রাখা হয়।[২৮] Prof. Rup Kumar Barmanতার গ্রন্থ[২৯] মরিচঝাঁপির ঘটনা বর্ণনা করেছেন:'-From the morning of 24th January'79 police started the oppression with the help of 30 launches and two steamers of B.S.F by bursting teargas shell towards Marichjhapi, arrested people from their living houses in different plots by breaking down and setting fire to the houses. They also looted al the articles i. e food grains, clothing, bell-metal, plates, glass, brass pitches gold ornaments, iron made articles, hard cash etc. The police also did not hesitate to outrage the modesty of our women including three young girl. ...After 7days,on 31.1.79 refugee women, afraid of starvation strict death, attempted to cross the Banga river to collect food and water from Kumarmari, the nearest village. The police with their launches attacked the boats in the river by throwing teargas shells violently, drowning the boats by dashing with the launches and attacked drowning women by running over them repeatedly....the police became angry and opened fire indiscriminately resulting death of 15 refugees and two local people including one woman. এই সময় থেকে মতুয়া মহা সঙ্ঘ রাজনীতি থেকে সরে আসে। ১৯৭৭ সালের পর থেকে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার পর মতুয়া মহাসঙ্ঘকে পুনর্গঠন করেন এবং ১৯৮৬ সালে নব গঠিত কার্যকরী কমিটি মতুয়া মহাসঙ্ঘ কে 'একটি অ-রাজনৈতিক ধর্মীয় –সামাজিক সংগঠন রূপে ঘোষণা করেন এবং মতুয়া মহাসঙ্ঘের সদস্যদের সক্রিয়ভাবে কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত না হওয়ার

প্রস্তাব গ্রহন করা হয়।কিন্তু মতুয়া অনুগামীদের অনেকে রাজনীতিতে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহন করেন এবং মতুয়া সম্প্রদায়ের অনুগামীরা পরোক্ষ ভাবে তাদের সমর্থন ও করেন। নব পর্যায়ে মতুয়া মহাসঙ্ঘ নমঃশূদ্র ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের সমন্বয়ে একটি 'চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী' এবং দলিত ধর্মীয় সামাজিক সংগঠন রূপে আত্মপ্রকাশ করে।[৩০]

৩.৩.দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধে মতুয়া নারীদের উপর প্রভাব

৪৭'এর দেশভাগ একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।এই সিদ্ধান্তের ফলে বাঙালীর জীবনে নেমে আসে এক ভয়ংকর বিপর্যয়। এই বিপর্যয় ভারতবর্ষের মানচিত্রকে বদলে দিয়েছে। এই বদল কেবল মাত্র ভৌগলিক নয়- সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই বদলেছে অতি দ্রুত। বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের দেশান্তর ঘটেছে- সাত পুরুষের পুরানো আবাস ছেড়ে নতুন বসতি গড়েছে। পুরনো বাসস্থানের সঙ্গে নতুন বসতির, নতুন প্রতিবেশীর নানা দিক থেকে ভিন্নতা, বেঁচে থাকার লড়াই।সব মিলিয়ে দেশ ভাগ ছিন্নমূল মানুষের জীবনকে আমূল বদলে দিয়েছে। স্থায়ী ভাবে পুরুষের দেশান্তরের সঙ্গে সঙ্গে নারী ও দেশান্তরী হয়েছে, বলা ভালো দেশভাগের সংকটে নারীরাই সব চেয়ে বেশী ঘুরপাক খেয়েছে। প্রকৃতির নিয়মেই নারীর উপর পুরুষের শারীরিক উৎপীড়ন সম্ভব। তাই সকল যুগে সকল সভ্যতায় নারীর সম্ভ্রম ছিল রক্ষন যোগ্য সম্পদ। পৃথিবীর ইতিহাসে নানা সময়ে শত্রুপক্ষের নারীকে বিবস্ত্র ও ধর্ষণ করার মধ্য দিয়ে লালসা ও প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করে এসেছে। বস্তুত আমাদের দেশভাগ,দাঙ্গা,বাস্তত্যাগ সবই পুরুষের সৃষ্টি। অথচ নারীকে দিতে হয়েছে তার চরম মুল্য। বহু ক্ষেত্রে নারীরা পারিবারিক সম্মানের চাপে আত্মহত্যা করেছে; অগণিত নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে।এর ফলে অনেকেই সন্তান- সম্ভাবনা হয়েছে, মনের গভীরে তৈরি হয়েছে গভীর খাঁদ।

উনবিংশ শতকে শেষের দিকে যে অস্পৃশ্যরা চণ্ডাল নাম মোচন করার জন্য, নিজেদের আত্ম সম্মান বা আত্ম মর্যাদাবোধ পাবার জন্য তাদের নারীদের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করতে কুণ্ঠা বোধ করেনি, সেই সব চণ্ডাল বা মতুয়া ধর্মের নারী- পুরুষরা দেশভাগে সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই তাদের নারীদের যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল।'...The dalits began to acquire property or

subinfeudatory rights in the land, they too felt compelled to abandon their previous, more ambiguous, modes of family structure and follow the Brahmanical codes of marriage and patriarchy, having a distinctive impact on the status of their women, who had previously enjoyed more autonomy and freedom. To put it in a different way, as owners of property, they now felt compelled to have 'legal' heirs and hence felt the compulsion to control female sexuality and reproductive power and maintain a patriarchal family structure, which previously were the concerns mainly of the propertyowning Brahmans and the upper castes.[৩১] তারা নারীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে বিশুদ্ধ উত্তরাধিকার রক্ষার তাগিদে যৌনতা নিয়ন্ত্রণ করেছিল তারা দেশভাগের সময় থেকে পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলোতে তাদের নারীদের উপর অন্য ধর্মের পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি তারা সেটা মেনে নিতে পারেনি ফলে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে অনেকে। মতুয়া ধর্ম নারীদের গার্হস্থ্য শিক্ষার মধ্যে দিয়ে পতিব্রতা,আদর্শ নারী হতে বলেছিলেন দেশভাগ সেই সব নারীকেও পথে দ্বার করিয়ে দিয়েছিল। পূর্ব বাংলার পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ গৃহে যে মতুয়া নারীদের বাস স্থান ছিল, তারা দেশান্তরী হয়ে শিয়ালদাহ স্টেশনে কিংবা ক্যাম্পে নির্বাসিত হওয়ার পর তৈরি হয়েছে ভিন্নতর সমস্যা। এই সমস্যা গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল:

১) অর্থনৈতিক সমস্যা;

২)বাস স্থানের সমস্যা;

৩) সামাজিক বৈষম্যের সমস্যা;[৩২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ভারত –সহ সারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক চিত্র বদলে যাচ্ছিল দ্রুত। ভারতবর্ষে এই বদল ত্বরান্বিত হচ্ছিল দেশভাগ ও বঙ্গ বিভাগ জনিত কারনে; যার ঢেউ নারীর অন্দর মহলে এসে পড়ল প্রবল ভাবে। ভাঙ্গনের পর নারীর জীবন নতুন করে গড়ে ওঠে। সংসারের গণ্ডীর মধ্যেই নারীদের বিচরন ছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবদান থাকলেও তারা ছিল অর্থহীন শ্রমিক। পারিবারিক মতামত বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যাদের কোন ভূমিকাই ছিল

না। বিয়ের পর, পতি সেবা, সন্তান পালন ও মতুয়া ধর্মীয় নির্দেশ ,আদেশ মেনে সংসার ধর্ম পালন করাই ছিল তাদের সাংসারিক জীবনের মূল উদ্দেশ্য।

৩.৪.মতুয়া নারীর সামাজিক অবস্থা

দেশান্তর মতুয়া নারীদের জীবন বদলে দিয়েছে এক লহমায়। এই ধর্মীয় পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের যে অবরোধ প্রথা অনুসারে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল, দেশ ভাগ তাদের ঘরের বাইরে নিয়ে আসে। তারা যে পর্দা মেনে চলতো, দেশভাগে তাদের বোঁচকা – বুঁচকি মাথায় করে লঞ্চ- স্টিমার- নৌকায় করে, পায়ে হেঁটে, ট্রেনে চড়ে আসতে হয়।নারীর সামনের যে পর্দা ছিল সেই পর্দা সরে গেল; আদর্শ গৃহস্থ ধর্মের নারী উন্মেচিত হল শত শত মানুষের সামনে।[৩৩] পূর্বে নারীদের অন্য পুরুষের সাথে কথা বলা, মেলা-মেশা যেটা ছিল আদর্শ গৃহিণীর কাছে পাপ, সেই নারী বেঁচে থাকার তাগিদে কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সাথে কথা বলতে শুরু করে, কলোনির রাজনীতিতে সোচ্চারে তাদের কথা বলতে শোনা যেতে লাগলো। প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাসে[৩৪] উদ্বাস্তু নারীদের জীবন চিত্রিত করেছেনএইরূপ, 'দেশত্যাগের পর উজানী বুড়ি, হারান, কাপাসী, নিত্য ঢালীদের অনিশ্চিত যাত্রা শুরু হয়। মানুষ গুলো আর কিছু না জানুক না জানুক, সহজ বুদ্ধিতে এটুকু বুঝেছে, এই যাত্রা অনন্ত অফুরন্ত দুঃখের যাত্রা। গোয়ালন্দের ঘাট থেকে ট্রেনে করে নাম না জানা স্টেশনে পৌছায়। বর্ডার স্লিপ নেওয়ার পর তারা শুনতে পায়, রাণাঘাটের রিফিউজি ক্যাম্পে জায়গা নেই, পরের ট্রেন ধরে তারা পৌছায় শিয়ালদহ স্টেশনে। সেখানেই তারা একে অপরের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। লেখক প্লাটফর্মের ওপর হাত চার পাঁচেক জায়গা দখল করে এক একজন ইতি দিয়ে সীমানা ঠিক করে নিয়েছে। ঐ নিরাবরণ নগ্ন জায়গাটুকুর মধ্যে বউ-ঝি-মেয়ে-পুরুষ গাদাগাদি করে পড়ে থাকে,গোপনতা নেই, আব্রু নেই। ওখানেই ঘর-সংসার, জীবন মৃত্যু সবকিছু।এই রকম দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে স্টেশনের এক কোণে হাত পাঁচেক জায়গা দখল করে উজানবুড়ি ও তার নাতি হারান। তারই পাশে আস্তানা গাড়ে নিত্য ঢালী ও তার যুবতী মেয়ে কাপাসী। কাপাসী দেশভাগের কারনে ধর্ষিতা। অর্ধ-উন্মাদের মতো শিয়ালদহ স্টেশনের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কলকলিয়ে হেসে ওঠে, আবার কখনো কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। দেশভাগের সময় এই ধর্ষিতা নারীদের সমাজ ঠাই দিতে চায় নি। এই বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে উপন্যাসে।

পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন ক্যাম্পে নারীদের থাকতে হয়েছে। মনোরঞ্জন ব্যাপারী[৩৫] উদ্বাস্তু জীবনে তার মায়ের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন:' আমার মা আগে খুব সুন্দরী ছিল। এখন গায়ের চামড়া বুড়িদের মতো খসখসে হয়ে গেল।ছিল এক মাথা ঘন চুল।তেল সাবানের অভাবে জট বেঁধে যাচ্ছে বলে গোড়া থেকে ঘেঁষে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলল। কাপড় যা একটা-দুটো সেই শিরোমনিপুর ক্যাম্পে থাকতে সরকার দিয়েছিল, তারপর আর কেনা যায় নি।এখন তা পচে গলে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।ফলে মা একখানা ছেঁড়া মশারির টুকরো জড়িয়ে দিনের আলো থেকে পালিয়ে ঘরের অন্ধকার কোণে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। শত দরকারে আর তার ঘরের বাইরে আসার উপায় রইল না। সবচেয়ে লজ্জার এই যে, মেয়েদের স্নানের জন্য কোথাও আলাদা ব্যবস্থা ছিল না। এ এক বর্বর যুগের খণ্ড চিত্র। ঝগড়া মারামারির সময় ওপার বাংলার আত্মীয়প্রীতি, জেলা প্রীতি উথলে উঠত। রোগ- শোক, মৃত্যুর মিছিল দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠেছি। দুঃখ অনেকটা গা-সওয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু এবার এক নতুন আতঙ্ক ছড়িয়েছে ক্যাম্পের ঘরে ঘরে।এক অজানা পশু ক্যাম্পে ঢুকেছে। প্রতি রাতে ঘুমন্ত শিশুকে নিঃশব্দে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বাইরে এনে নরম অংশ পেটের নাড়িভুঁড়ি খাবলে খেয়ে দেহ ফেলে রেখে দিত। শেষে হায়েনাকে ক্যাম্পের কেন্দ্রীয় অফিসারের চেষ্টায় ধরা হয়েছিল।[৩৬]

বিভিন্ন ক্যাম্পে মতুয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ দুর্বিষহ জীবন যাপন করেছিল সেটা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাদের অনেকে আবার পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে কম দামে জমি কিনেও বসবাস করতে শুরু করেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বর্তমান সময়ে মতুয়া সম্প্রদায়ের পরিচিত মুখ, বিরাট বৈরাগ্য ও পুষ্প বৈরাগ্যের পরিবার। পুষ্প বৈরাগ্য[৩৭] তার দেশভাগের পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন এইরূপ:

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ববঙের যশোর জেলার হাতবারিয়া গ্রাম থেকে নদীয়া জেলাতে তার বাবা বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের পরিবার ছিল নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মতুয়া।মূলত দরিদ্র কৃষক বাবার কায়িক শ্রমেই খড় দেওয়া মাটির ঘরে ১৯৬৪ সালে তিনি জন্মগ্রহন করেন।লেখিকার মা, অতি যত্নে পরিশ্রম করে সংসারটিকে সাজিয়ে তুলেছিলেন। নিজের হাতে কোদাল কুপিয়ে আম, কাঁঠাল, ইত্যাদি গাছ লাগাতেন, দেড় বিঘা জমির

রাস্তার সামনের দিকে বাড়ী, ঠাকুরের মন্দির(মাটির তৈরি)পিছন দিকে বিভিন্ন ফল-ফলাদি ও শাঁক-সব্জির বাগান করেছিলেন। তাঁর মায়ের, এই অর্থহীন শ্রমকে লেখিকা সংসার সুখের হয় রমণীর গুনে' বলে ব্যক্ত করেছেন। সমাজের পুরুষরা নারীদের শ্রমকে যে ভাবে দেখতেন ঠিক একই রকম ভাবে তিনিও তার মায়ের শ্রমকে দেখেছেন। হঠাৎ তার বাবা দিনরাত রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে কর্ম ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন। তখন সংসার প্রায় 'অচল' মা গ্রামের লোকের ধান ভেনে, চিড়ে কুটে, মুড়ি ভেজে, কাঁথা সেলাই করে, দেওয়াল গেঁথে দিতেন,বিনিময়ে পেতেন এককাঠা ধান বা কয়েক আনা পয়সা,সেটাই ছিল সংসার চালানোর একমাত্র উপায়।

লেখিকার কথায় উঠে আসে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের রিলিফ দেওয়ার কথা বলে তৎকালীন নেতারা কীভাবে বড়লোক হয়ে উঠতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় আসা শরণার্থীদের মধ্যে বেশীরভাগ ছিল দরিদ্র পরিবারের, যারা নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত। শরণার্থী মহিলারা এদেশে এসে কলকাতা শহরে লোকের বাড়ী কাজ সংসার চালাত। শরণার্থী মহিলারা পুরুষদের ঘেরাটোপে পাকবাহিনী, রাজাকার আর আলবদর-দের চোখ এড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন। পূর্ববঙ্গ থেকে তারা যে লাঞ্ছিত ও বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছিলেন তা তাদের মনস্তত্ত্বে স্মৃতি হয়ে থেকে গিয়েছিল। । যশোধরা বাগচী[৩৮] উদ্বাস্তু মহিলাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যার কথা বলেছেন। তিনি সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে "শরণার্থী মহিলাদের অস্থিত্ব খোঁজার লড়াই" হিসাবে উল্লেখ করেছেন বা "The Emergence of New Women"বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে নিপীড়িত উদ্বাস্তু মহিলা বা নমঃশূদ্র মহিলাদের নিয়ে কোন সামগ্রিক তথ্য বা গ্রন্থ পাই না । তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তু মহিলাদের জন্য সার্বিক ভাবে তাদের কথা ভেবেছিলেন সেকথা কখনো আমরা বলতে পারি না ।প্রসঙ্গ অনুসারে, লেখিকা জানান, তাদের চার ভাইবোনের একবেলা খাবার জুটত এবং খাওয়ার পদ ছিল- কচুর পাতা ভাতে,ফ্যান ভাত আর বেগুন ভাতে । তার দিদিকে খুব অল্প বয়সেই বিয়ে দেওয়া হয় পাশের গ্রামে এক চাষির সাথে। নিজের অদম্য ইচ্ছেতে জমিতে কাজ করে, হাঁস, মুরগী পোষার মাধ্যমে,মাথায় করে ধানের বোঝা, পাটের বোঝা বয়ে সংসার এবং নিজের পড়াশুনার খরচ নিজেকে উপার্জন করতে হয়েছে।

১৯৭১ সালে শরণার্থী হয়ে পূর্ব বঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা নারীদের জীবনের কথা শুনিয়েছেন লিলি হালদার[৩৯] এইভাবে-*দেশ*ভাগের বেদনাদায়ক ইতিহাসের অন্যতম কলঙ্কময় অধ্যায় মরিচঝাঁপি। দীর্ঘকাল ধরে অন্যতম উপেক্ষিত পর্বও বটে। *তারা বসতি হিসাবে* ১৯৭৮-৭৯ সালে সুন্দরবনের দুর্গম জনহীন দ্বীপ মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের বসতি গড়ার চেষ্টা এবং পূর্বপ্রতিশ্রুতি ভেঙে সরকারের তরফে বিরোধিতা ও উদ্বাস্তু-উৎখাতের ঘটনাকে ঘিরে মরিচঝাঁপির বৃত্তান্ত লেখিকার প্রবন্ধ মনে করিয়ে দেয়। লেখিকা দেখিয়েছেন শহরের শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণী তাঁদের "মরিচঝাঁপি" নামে ব্যঙ্গত্মক ভাবে তাদের ডাকে। শিক্ষিতা মহিলা হিসাবে চাকরির প্রথম দিন তাকে এই যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। মরিচঝাঁপি যেন জায়গার নাম না হয়ে উদ্বাস্তু মানুষের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একই রকম ভাবে কানন বড়াল[৪০] উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে তার পারিবারিক জীবন যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছেন,তিনি লিখেছেন- ১৯৬৭ সালে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের চেষ্টায়, শিবাজি কলোনিতে তাদের পরিবার এসে উপস্থিত হয়। পঞ্চাশ থেকে ষাট-এর দশকে এই কলোনী গুলোর অবস্থা খুব খারাপ ছিল। চারিদিকে শুধু অভাব আর অভাব। কাল কি খাবে, ছেলে মেয়েদের মুখে দুমুখো অন্ন তুলে দিতে পারবে কিনা তা তাদের জানা ছিল না। ক্লাস ফোরে যখন লেখিকা পড়েন, তখন গরমের ছুটিতে দুপুরবেলা মুখার্জিদের বাগানে আম কুড়াতে গেলে, মুখার্জিরা তাদের কলোনীর বাচ্চা ছোটজাত, রিফুউজী, অশিক্ষিত নমোর বাচ্চাদের জন্য একদিন ঠাকুরপুকুরের ইজ্জত থাকবে না' বলে বিভিন্ন ধরনের কটু কথা বলেছেন। ১৯৭৫ সালে লেখিকার বিয়ের পর একটি সমিতি করেন যার নাম দেন 'দলিত মহিলা সমিতি'। পরবর্তীকালে যদিও সেটার নাম পরিবর্তন করে, নতুন নাম করেন 'রমাবাঈ মহিলা সমিতি'। এই ভাবে দেখা যায় লেখিকা তার জীবন ধীরে ধীরে সমাজের মূল স্রোতে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলা থেকে আর মতুয়া শরণার্থীরা আসতে শুরু করে যাদের অবস্থা একই রকম ছিল। বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পে তাদের আশ্রয় দেওয়া হয়। এই সময় সব থেকে বেশী নমঃশূদ্র অধিকাংশ মতুয়ারা আসতে শুরু করে। কানন বড়াল বলেছেন,- ১৯৭১ সাল বাংলাদেশের উপর ইয়াহিয়া খান সেনাদের বর্বর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হাজার, হাজার মানুষের

প্রান হাতে করে দেশে পদার্পণ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাদের আশ্রয় দেন এবং থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন, লবন হ্রদ, সাঝির হাঁট, মধ্যমগ্রামের বিভিন্ন ক্যাম্পে। বয়স্ক মাসিমারা বলেন, বাংলাদেশের 'হিড়িকের বছর' কত কিছু ঘটেছিল।

৩.৫.মতুয়া নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

মতুয়া ধর্মীয় সমাজের যারা উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল তাদের বেশির ভাগ জমির উপর নির্ভরশীল ছিল, তাদের হাতে নগদ কোন অর্থ ছিল না। ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্যাম্পে এসে তারা 'ডোল'-এর ওপর প্রাথমিক ভাবে নির্ভর করতো।ধীরে ধীরে সরকারের প্রচেষ্টায় নারীরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করা শুরু করে। মহিতোষ বিশ্বাসের 'পরতাল' উপন্যাসেও লড়াই-সংগ্রামের কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে।আশিস হীরা[৪১] তার গ্রন্থে বলেছেন- কুপার্স ক্যাম্পে আশ্রিত অসহায় মহিলাদের উদ্বাস্তু জীবনের চিত্র আঁকতে গিয়ে আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেছেন। রাণাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পের পাশ্ববর্তী এই মহিলা শিবিরে সরকারের পক্ষ থেকে সুতো কাটা, রেশম সুতো বানানো, তাঁত বোনা ইত্যাদি কাজ শেখানো হয়।কিন্তু সেই শিক্ষা কাজে লাগিয়ে তারা যে আয় করে তা পারিশ্রমিকের তুলনায় নগণ্য। সে কারনে রাণাঘাট বাজার বা তার আশেপাশের সেলাই মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে গোপনে অর্ডার এনে কাজ করতে শুরু করে । আবার অনেক মহিলাই বিড়ী মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজেদের মতো করে খুঁজে পেল কাজের উৎস।

আবার, উইমেন্স ক্যাম্পের মধ্যে বাইরের পুরুষের প্রবেশাধিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু হঠাৎ একদিন দুজন পুরুষ লোকের আগমনে সাধনা নামের এক কর্মী তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে।পুরুষ দুটির কাছ থেকে জানা যায়, তাদের মালিকের কাছ থেকে ক্যাম্পের কোনও একজন মহিলা কাপড় নিয়ে এসে ফেরত দেয় নি। তাই তারা সেই মহিলার খুঁজে এসেছে। এই নিয়ে মহিলাদের ক্যাম্পের সুপার তাদের বলেন, বাইরে কাজ করলে ক্যাম্পের বাইরে বের করে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেন। তখন ক্যাম্পের মহিলারা সমবেত হয়ে প্রতিবাদ করে বলে-'আপনি আমাদের কাজ বন্ধ করে দেবার কে? তার সঙ্গে আর গলা মেলায় অনেকে বলে-' আমরা উদ্বাস্তু

বইল্যা আপনাগো কেনা গোলাম না। আমরা বাইরের কাজ করুমই। আমাগো পিছনে লাগতে আইলে আমরা ছাইড়্যা কথা কমুনা। ঝ্যাঁটায়া বিষ দাঁত ভাইঙ্গা দিমুয়ান!'

শুধুমাত্র এই নিম্নবর্ণের নারীদের যে দুর্বিষহ জীবন কাটাতে হয়েছে তা নয়, এমন কি তাদের পুরুষদের থেকে সহ্য করতে হয়েছে নানা ধরনের কু-কথা, অত্যাচার, নির্যাতন। প্রফুল্ল রায়ের[৪২] উপান্যাসে, তিলি ও তার স্বামী হরিপদর মধ্যে তিনি সেটা ব্যক্ত করেছেন । তিলির স্বামী হরিপদ হাঁপানি রোগী। তারা উদ্বাস্তু হয়ে খুলনা থেকে ট্রানজিট ক্যাম্পে উপস্থিত হয়েছে। তিলি তার স্বামীর পূর্বের ব্যবসা পুনরায় শুরু করে। ক্যাম্পের বাইরে তিলি তামাক বিক্রি করতে যায়, তাকে বিভিন্ন পুরুষের সাথে কথা বলতে হয়। ফলে হরিপদর মনে এক ধরনের সন্দেহ প্রকাশ পায়। সেটা এই রকম- নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিড় বিড় করে হরিপদ- নষ্ট, দুষ্ট মাগী, সব্বনাশী , আমারে ঘরের মদ্দি রাইখ্যা নাগর নিয়া ফুত্তি করে, আমি কিছুই বুঝি না, না? আমি আন্ধা হইয়া গ্যাছি? আমি কি কালা হইয়্যা গ্যাছি? আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বলে, হে ভগমান মাগীর এত নষ্টামি তুমি সইজ্য কইরো না, হে ভগমান ।

অন্যদিকে তিলির মনের কথা জানা যায় যখন স্বামীর থেকে অত্যাচারিত হয়ে ক্যাম্পের যোগেনের কাছে যায় তার নিজেদের ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে, তখন তিলি বলে, 'মায়ের কাছে শুনছি, বাপের কাছে শুনছি, পিরথিমীর সগল মনিশ্যের মুখে শুনছি, সোয়ামি হইল সগল গুরুর গুরু, মাথার মণি। তমত্ত(সমস্ত) জনম তারে মাথাতেই রাখছি, তার মন যুগাইয়া চলছি। ভরা শরীল, ভরা যৈবনে পুড়ছি, জ্বলছি, খাক হইছি। তবু নিজের কথা ভাবি নাই। যৈবনে দিকে তাকাইয়া নিজের ভরা শরীলের দিকে তাকাইয়া বুক কাঁপছে। যুবতীর যৈবন কি তার নিজের বশে! ডরে অন্যদিকে মুখ ঘুরাইয়া রাখছি। তবু সোয়ামীর মন পাইলাম না'।

এই উদ্বাস্তু নারীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে নানা কারনে, তাদের আর্থিক অবস্থা করুন থাকার কারনে বাইরে কাজ করতে হয়েছে তেমনি তাদের ঘরের বাইরে কাজ করাকে পুরুষরা ভালো চোখে দেখেনি সেটা যেমন বোঝা যায়। দেশভাগ যেমন তাদের সব নির্ভরতা ভেঙ্গে দিয়েছে, তেমনি তাদের নিজেদের স্বাধীন ভাবে পথ চলতে শিখিয়েছে, যার ফলে কতো পরিবার ভেঙ্গে গেছে, সেই সবের খবর ইতিহাস রাখেনি। দেশভাগের ফলে পূর্বে বাইরে যে কাজের ক্ষেত্র শুধু পুরুষদের জন্য ছিল সেই মিথ তা পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়ে, নারী পুরুষ দেশভাগের পর একসাথে

বাইরের কাজ করতে দেখা যেতো। যেটাকে গার্গী চক্রবর্তী তার গ্রন্থে[৪৩] বলেছেন- 'The private public divided break down'। পূর্বে নারী পুরুষের জগত আলাদা ছিল, দেশভাগে সেই পার্থক্য তা ঘুচে গেলো।

দেশভাগে আর্থিক ভাবে অসহায় মেয়েরা শুধু মাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে অর্থ উপার্জনের জন্য ভিন্ন ধরনের পেশা বেছে নিয়েছিল । দীনেশ চন্দ্র সিংহ[৪৪] দেখিয়েছেন-' পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এক নতুনপ্রজন্ম দেখা দিল যাদের জন্ম রেললাইনের পাশে, জবর দখল জমির কুড়ে ঘরে, এমনকী রেলের পরিত্যক্ত কামরায়। শিয়ালদা স্টেশনের ৭০/৮০ মাইলের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ধুবুলিয়া, বাদকুল্লা,রূপশ্রী, কুপার্স ক্যাম্প, তাহেরপুর, রাণাঘাট, প্রভৃতি শরণার্থী শিবিরের মেয়েদের দেখা যেতে লাগলো সন্ধ্যার অন্ধকারে ধর্মতলা, চৌরঙ্গী, এসপ্লানাডের মোড়ে। পাওয়া যেতে লাগলো কোলকাতার পতিতালয়গুলিতে 'বাঙাল' উচ্চরন ভঙ্গীর মেয়েদের অস্তিত্ব। শুধু বেঁচে থাকা, ভাই-বোন ও বৃদ্ধ মা বাপের গ্রাসাচ্ছদনের জন্য নিজেদের মানুষের ভঙ্গাংশে পরিণত করা।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আসা চঞ্চলা বিশ্বাস[৪৫] জানিয়েছেন, আমাদের পূর্ব বাংলায় বাড়ী ছিল ভেন্নাবাড়ী(সাতপাড় উইনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ,গোপালগঞ্জ জেলার একটা গ্রাম)। রামদিয়া হইয়া যশোর জ্যালার মদ্দি দিয়্যা বনগাঁ তে আসি, ওইখান থাইক্যা এইহানে আসি(কাশীপুর)। তিন ছল(ছেলে), দুইডা মাইয়া(মেয়ে), বুড়ো হশুড়, হাশুড়ী, বেডা(স্বামী) , আমি আর ছেল(ছিল) দুইজন ছোডো ভাগ্নে। এত্ত গুইল্যা প্যাট চালাইত্যে এই হানে আসিয়া মিয়াঁ দের ভুঁইতে (জমিতে) কাজ করতাম। জাগে(যাদের) জন্যি(জন্য) দ্যাশ ছাড়লাম, তাগো(তাদের) ভুঁইতে যাইতে হইলো। তারপর কিছুদিন পর বিঁড়ি বাঁধার কাজ নিলাম, বেডাও কাজ করতো দিনমজুর। মাইয়ারা বড় হইলে তারাও বিড়ির কাজ করতো। ছল গুলো তামার আংটি(মাদুলি) বানানো শিখলো। সরকারের কোন সাহায্য আমরা এইহানে পাই নাই। এহন অনেক কিছু দেয় সরকার, আমাদের দেয় না। আমাদের BPL(Below Proverty Level) লিস্টে নাম নাই ।

একই রকম ভাবে ভানুমতী মজুমদার[৪৬],এক ছেলে, দুই মেয়ে, শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামীকে নিয়ে (গ্রাম-করপাড়া, জেলা-গোপালগঞ্জ) করপাড়া থেকে সাতক্ষীরা দিয়ে ইছামতী নদী পেরিয়ে বসিরহাট থেকে কাশীপুর গ্রামে এসেছিলেন। এই অঞ্চলে দেশভাগের সময় আসা কুলপদ বিশ্বাস তাদের স্বামী স্ত্রীকে সাহায্য করেছিল। কুলপদ বিশ্বাস অনেক আগে এসে অনেক কম দামে অনেক জমি

কিনে নিয়েছিল। সেই সব জায়গা ছিল নাংলা বিলের একাংশ। জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সাপ আর জোঁকে পরিপূর্ণ ছিল এই সব অঞ্চল। কুলদা বিশ্বাস আমাদের দুই জন ও আর যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় এই অঞ্চলে এসেছিল তাদের দিন মজুর নিয়ে কুলদা বিশ্বাস তার জমি জমা জঙ্গল মুক্ত করে ধানের চাষ শুরু করেছিলেন। তার একটা জমিতে আমরা থাকতাম। পরবর্তীতে টাকা জমিয়ে তার থেকেই জমি কিনে এই অঞ্চলে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেছিলাম। তিনি কখনো আর্থিক বৈষম্য করেননি তবে তাকে(সাক্ষাৎদাতা) দিয়ে অনেক সময় বাড়ির বাসন ধোয়া, উঠুন লেপে দেওয়া, ঘরের পাঁচিলে নতুন মাটি দিয়ে লেপে দিতে হতো। তখন এতো কাজ করতে হয়েছে দুটো খাবারের জন্য এখন শরীরে কতো রোগ এসে গেছে। না খেয়ে দিনে কাজ করেছি, রাতে রান্না করে তবে দুটো খাবার পেটে পড়েছে। স্মৃতিচারনে জানিয়েছেন, নমোদের সাথে যে অঞ্চলে প্রথম মিয়াঁদের রায়ট (দাঙ্গা) হয় তাদের বাড়ী ছিল তারই পাশে। বর্তমান সময়ে আর কাজ-তাজ তেমন করতে পারেন না, ছেলেদের উপর নির্ভর করে তাকে চলতে হয়।

অন্যদিকে, ফুলরানী দাস[৪৭] জানিয়েছেন, পূর্বে বাংলাদেশে বাড়ী ছিল সিঙ্গা গ্রামে, শাশুড়ি, ২ ছেলে-মেয়ে, স্বামী আর তিনি। তারা একসাথে ৬ টা পরিবার এসেছিলেন। তারা সবাই এই গ্রামেই চলে এসেছিল। বিড়ি বাঁধার কাজ করতাম, শাশুড়ি রান্নার কাজে সাহায্য করতো, মেয়ে বড় হলে মেয়ে ও বিড়ি বাধতো, কিন্তু তাতে সংসার ভালো চলতো না, স্বামী কোলকাতার রাজমিস্ত্রির কাজ করতে যেতো, সেখানে এক বাড়ীতে রান্নার কাজ পেলাম। ধীরে ধীরে ৩ বাড়ীর রান্নার দায়িত্ব পেয়েছিলাম। সেই সকাল ৪টে বেরোতে হতো, আর ফিরতাম সন্ধ্যার সময়। কতো কষ্ট করতে হয়েছে এই দেশে এসে ।এখন কিছু পারি না কাজ করতে, আমরা BPL(Below Proverty Level) ভুক্ত বলে কিছুদিন আগে সরকার আমাদের একটা ঘর করে দিয়েছে। আগে মাটির ঘরে থাকতাম এখন দালান ঘর। ছেলে টা বাজারে চা-পানের দোকান দেয়। পড়াতে পারি নাই, মেয়ের বিয়ে দিয়েছি রাণাঘাটে, তারাও ভালোই আছে এখন।ছেলে এখন সংসারের হাল ধরেছে যা বঝে তাই করে।

৩.৬.মতুয়া নারীদের রাজনৈতিক অবস্থা

ওপার বাংলা থেকে দেশ ভাগের সময় আগত প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর পুনরায় মতুয়া মহাসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন।১৯৫০ সালের ৩১শে জুলাই দিল্লীতে উদ্বাস্তু সম্মেলনে যোগদান করে মতুয়া মহা

সঙ্ঘের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়, পূর্ব ভারতে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত মীমাংসা ও দেশভাগের মূলনীতি আজ পুরন হয় নি।[৪৮] এই সময় ঠাকুর নগর কলোনীর উন্নয়নে 'বেঙ্গল রিলিফ সোসাইটি' 'ঠাকুরনগর কোম্পানির কার্যকারী সমিতি' ও মতুয়া মহাসঙ্ঘের সদস্যবৃন্দ নিরবিছিন্ন কর্ম প্রচেষ্টা ও সেবা কর্মে উদ্বাস্তুদের স্বাভাবিক সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা অনস্বীকার্য।[৪৯]

১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতে সাধারণ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।কিন্তু স্বাধীনতা ও বঙ্গ বিভাগ পরবর্তীকালে নমঃশূদ্রদের একটি অংশ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হিসাবে আগমন ঘটলেও নেতৃত্ব গন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেনি। মূলত বাসস্থান, নাগরিক্ত্ব,ভোটাধিকার অর্জন তাদের প্রাথমিক বাঁধা ছিল। অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর একই সঙ্গে গাইঘাটা ও হাসখালি কেন্দ্রে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে যশোরের ফেডারেশনপন্থী নেতা বিজয় কৃষ্ণ সরকার কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে রাণাঘাট কেন্দ্রে প্রতিনিধিত্ব করেন।অন্যদিকে যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল ১৯৫২ সালের নির্বাচনে 'বালিগঞ্জ- বেনেপুকুর' সংরক্ষিত আসনে নির্দলপ্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করেন। যদিও পূর্ববঙ্গের মতুয়াদের জনপ্রিয় নেতৃত্ব হওয়া সত্ত্বেও যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল, অগ্নি কুমার মণ্ডল,প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গে নিজস্ব সম্প্রদায়ের সমর্থনপুষ্ট নির্বাচনী এলাকা প্রস্তুত করতে না পারায় এবং অধিকাংশ নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের ভোটাধিকার না থাকায় তাঁরা পরাজিত হন। তাই পরবর্তীতে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের প্রচেষ্টায় উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া,স্বরূপনগর, গোবরডাঙ্গা, বনগাঁ, বাগদা, হরিণঘাটা, নদীয়ার বগুলা, কৃষ্ণনগর, হাসখালি, মাঝদিয়া, নবদ্বীপ প্রভৃতি এলাকায় বসবাসকারী নমঃশূদ্রদের মধ্যে মতুয়া মহাসংঘের শাখাসংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চেষ্টা করেন। ১৯৫৬ সাল থেকে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী হিসাবে নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের মধ্যে তার রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেন। তার ফলে তিনি হরিণ ঘাটা এবং ১৯৬২ সালে হাঁসখালি তপশীলি সংরক্ষিত আসনে জয়লাভ করেন।[৫০] ১৯৬৪ সালে কায়া গ্রামের অষ্টম শ্রেনীতে পাঠরতা মমতা পালের উপর পুলিশী ধর্ষণের অভিযোগ, শান্তি লতা বিশ্বাসের উপর পাশবিক অত্যাচার প্রভৃতির প্রতিবাদ করে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর উক্ত ঘটনার আইনী ব্যবস্থা নিতে এবং মহিলাদের সম্মান রক্ষার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান।কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কোন ব্যবস্থা গ্রহণের

আশ্বাস না দেওয়ায় প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর এই বছর ৬ই মার্চ কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং দলত্যাগ করেন। সেই হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী দের প্রতি মতুয়া তথ নমঃশূদ্রদের সমর্থন লক্ষ্য করা যায় এবং ১৯৭৭ সালের তফসিলি নির্বাচনী এলাকা গুলোতে বামফ্রন্টের জয় হয়। কিন্তু ১৯৭৯ সালের মরিচ ঝাঁপির ঘটনার জেরে পূর্বে উল্লেখিত মতুয়া মহাসঙ্ঘ রাজনীতি[৫১] থেকে দূরে সরে যায়। ১৯৭৭ সালের পর থেকে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার পর মতুয়া মহাসঙ্ঘকে পুনর্গঠন করেন এবং ১৯৮৬ সালে নব গঠিত কার্যকরী কমিটি মতুয়া মহাসঙ্ঘ কে 'একটি অ-রাজনৈতিক ধর্মীয় –সামাজিক সংগঠন রূপে ঘোষণা করেন এবং মতুয়া মহাসঙ্ঘের সদস্যদের সক্রিয়ভাবে কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত না হওয়ার প্রস্তাব গ্রহন করা হয়। নব পর্যায়ে মতুয়া মহাসঙ্ঘ নমঃশূদ্র ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের সমন্বয়ে একটি 'চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী' এবং দলিত ধর্মীয় সামাজিক সংগঠন রূপে আত্মপ্রকাশ করে।[৫২]

কিন্তু কোথাও তখনো নির্বাচনে মতুয়া নারীদের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যায় না, কেন? কারন তখনো নমঃশূদ্র তথা তফসিলি হিসাবে সাংবিধানিক ভাবে ক্ষমতার ভাগ পাওয়ার অধিকার শুধু পুরুষদের রয়েছে। শুধুমাত্র তাদের ভোট দানের অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে, নির্বাচিত হওয়ার অধিকার অর্জন করেনি। দেশভাগে কি শুধু পুরুষরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল? না, পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে পুরুষ যতোটা হারিয়েছিল নারী হারিয়েছিল তার দ্বিগুণ। কারন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লোলুপ দৃষ্টি তাদের ওপরই পড়েছিল। কিন্তু নারীরা যে পূর্বের তুলনায় স্বাধীন হয়েছিল তার আভাস আমরা পেয়েছি, তাঁরা আর্থিক স্বাবলম্বী হয়েছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে? পুরুষ তাদের সেই অধিকার দেয়নি। যদি দেশভাগ না হতো, সামাজিক ও সামাজিক সংকট তৈরি না হতো তাহলে নারীরা কি ঘর থেকে বেরিয়ে উপার্জন করার অধিকার পেতো?

তবে, নারীদের যে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা এসেছে, মিছিলে যোগদান করার ক্ষমতা পেয়েছে, সেটা এই দেশভাগই তাদের শিখিয়েছে। কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর[৫৩] উপন্যাসে দেখিয়েছেন, উদ্বাস্তু মহিলারা দেশ ছেড়ে এসে ক্যাম্পের জীবনে নানা ঘটনা ও সংঘাতের মধ্যে পোড়খাওয়া ঝানু মানুষ হয়ে উঠেছে। কিছুতেই এখন তাদের আর ভয় দেখানো যায় না। উদ্বাস্তুদের মধ্যে পচা চাল বিতরন করলে তাঁরা ক্যাম্প সুপার বৈশাখী ব্যানার্জির কাছে প্রতিবাদ জানায়। সুপার তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর পরিবর্তে রূঢ় কথা বলতে শুরু করেন-' দেশে থাকতে তো খাবার জুটতো না,

এদেশে এসে তো বিনা পয়সায় বসে বসে চারবেলা খাচ্ছেন তবু পেট ভরছে না আপনাদের, যত্তোসব হাভাতের দল। এ কথার পর উদ্বাস্তু মহিলারা চারপাশ থেকে সুপারকে ঘিরে ধরে। তিনি ক্যাম্পে পুলিশ ডাকার ভয় দেখালে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে এবং সম্মিলিত ভাবে তাড়া করে। সুপার আত্মরক্ষার তাগিদে অফিসঘরে এসে প্রবেশ করেন। মহিলারা অফিস ঘরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করে। শেফালী নামক বয়স্ক মহিলার নির্দেশে অ্যায়ালুমিনিয়ামের থালা-গ্লাস-বাজিয়ে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে।প্রতিবাদস্বরূপ অরন্ধন কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। শয়ে শয়ে মহিলা শোভাযাত্রা করে সমগ্র ক্যাম্প ঘুরে সুপারের অফিসের সামনে এসে অবস্থান বিক্ষোভে যোগ দেয়। তাদের মুখের স্লোগান ছিল-‘ উনুনের হাঁড়ি চড়াবো না, পচা চাল খাবো না’।

১৯৫১ সালের ১৮ ই ফেব্রুয়ারি কোলকাতা ময়দানে উদ্বাস্তুদের যে সভা হয়, তার বিবরন পাওয়া যায় এই রকমঃ এই সভার প্রধান বক্তা ছিলেন জ্যোতি বসু। উদ্বাস্তুদের জমায়েতের নির্দিষ্ট স্থান থেকে দশটি মিছিলের সমাবেশ ঘটে ময়দানে। প্রত্যেকটি মিছিলের একই স্লোগান ছিল একই রকমঃ

১) জবর দখল কলোনির স্বীকৃতি দিতে হবে।

২) উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ করা যাবে না।

৩) উদ্বাস্তুদের ভোটাধিকার দিতে হবে।

৪) জমিদারি প্রথা বাতিল কর।

৫) ভারত সরকার কমনওয়েলথ ছেড়ে বেরিয়ে এসো।

৬) এশিয়া থেকে সাম্রাজ্যবাদ দূর হটো।

৭) যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই।

মিটিং-এ উপস্থিত ছিল ১০,০০০ মানুষ, এই ১০,০০০ মানুষের মধ্যে ১২০০ ছিল বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চলের উদ্বাস্তু কলোনির মহিলারা[৫৪] যারা প্রথম কোলকাতার রাজপথে প্রথমবার রাজনৈতিক মিছিলে যোগদান করেছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ইউ সি আর সি-ই প্রথম মহিলাদের রাজপথে নিয়ে এসেছিল। ১৯৫৩ সালের ১৫ই মার্চ উদ্বাস্তুদের অন্য একটি সম্মেলনেও দেখা যায় ১০০০ মহিলাকে।

পরবর্তীতে মতুয়া নারীদের রাজনৈতিক মিছিলে কমিউনিস্ট সংগঠনগুলি নানা আন্দোলনে ব্যবহার করেছে, খাদ্য আন্দোলনের সময় এবং ক্ষমতার আসার পূর্বে ও পরে নাগরিকত্ব দাবীর অজুহাতে মিছিলে, আন্দোলনে বামফ্রন্ট সরকার তাদের পাশে রাখার চেষ্টা করেছিল।

৩.৭.উদ্বাস্তু মতুয়া নারীদের শিক্ষা

পুষ্প বৈরাগ্য জানিয়েছেন, তার পিতা-মাতা মতুয়া ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের ‘খাও বা না খাও/ছেলে মেয়েদের লেখা পরা শেখাও’ এই মন্ত্র আঁকরে ধরে দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়ে তার পিতা-মাতা তাকে পড়াশুনা করার জন্য উৎসাহী করেছেন। একই রকম ভাবে কানন বড়াল, স্মৃতিকনা হাওলাদার , কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল লেখাপড়া শিখেছেন। উদ্বাস্তু নারীদের শিক্ষিতা হবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নীলিমা দত্তের[৫৫] প্রবন্ধের মাধ্যমে যেখানে তিনি জানিয়েছেন, বিয়ের পর দেশভাগের কারনে পশ্চিমবঙ্গে কলোনিতে বসবাস করছিলেন শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর, স্বামী, ও ছোট্ট মেয়ে কে নিয়ে। পূর্ব বঙ্গে থাকা কালীন কিছুটা পড়াশুনা শুরু করেছিলেন, স্বামীর অনুরোধে পুনরায় লেখাপড়া শুরু করেছিলেন যদিও শ্বশুরের নিমরাজি ছিলেন, পরবর্তী কালে তিনি নিজে বি এ পাশ করানোর জন্য চেষ্টা করেছিলেন। যেখানে তাকে তিন মেয়ে হওয়ার দায়ে প্রতিবেশীদের থেকে কটু কথা শুনতে হতো। যোগেন্দ্র নাথ রায়[৫৬] জানিয়েছেন, শিশুদের পড়াশোনার ব্যবস্থা ক্যাম্পের আধিকারিকরাই করেছিলেন, স্কুল যাওয়ার পর মাঠে গরু চরাতেও জেতেন সেটাও লেখক উল্লেখ করেছেন। এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে, চাকরীর ক্ষেত্রে, সাংবিধানিক সংরক্ষণের সুবিধার জন্য তফশিলি জাতি সম্প্রদায় হিসাবে মতুয়ারা পড়াশুনার দিকে নজর দিয়েছিল, সেটার পরিসংখ্যান পাওয়া যায় Prof. Rup Kumar Barman[৫৭] তার গ্রন্থ থেকে, তিনি ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৯১ সাল অব্ধি তফশিলি জাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার হার কত ছিল তার একটা তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

Literacy Rate of the Scheduled Caste Communities and the General Literacy Rate of West Bengal during 1961-1991.

Category	1961	1971	1981	1991	2001
SC	13.58	17.80	24.37	42.21	59.09
Others	29.58	33.20	48.64	57.69	68.64

এছাড়া Prof. Rup Kumar Barman[৫৮] তার গ্রন্থে দেখিয়েছেন প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত তফশিলি জাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ছাত্র – ছাত্রীর পরিমান।

Enrolment of Scheduled Caste Students in Different Stages in 1985-86

Educational stage	Boys	Girls	Total
Primary Stage	788442	463002	1251444
Middle Stage	145442	65098	210540
High School Stage	88842	22961	111803
Higher Secondary Stage	22440	6942	29382

৩.৮.মতুয়া নারীর ধর্মীয় অবস্থা

ওপার বাংলা থেকে দেশ ভাগের সময় আগত প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর পুনরায় মতুয়া মহাসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। পুষ্প বৈরাগ্য[৫৯] তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে মতুয়া ধর্ম সম্পর্কের ব্যাপারে বলেছেন যে, তার পিতা ধীরেন্দ্র নাথ বৈরাগ্য ছিলেন একজন আদর্শবান সৎ, একনিষ্ঠ মতুয়া গোঁসাই, মাতা কালী দাসী দেবী ভক্ত প্রান মতুয়া সাধিকা। উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথি মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী উপলক্ষে সাতদিন ব্যাপী মতুয়া ধর্ম মহামেলা অনুষ্ঠিত হয়। তার পিতা ঐ মন্দিরে পূজার দায়িত্ব পালন করতেন। মনোশান্ত বিশ্বাস[৬০] তার গ্রন্থে জানিয়েছেন, দেশভাগের পর বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে ঘুরে ঘুরে মতুয়া ভক্ত গোঁসাই দের খুঁজে বের করে তিনি পুনরায় পশ্চিমবঙ্গে মতুয়া মহা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৮ সাল নাগাদ বগুলাতে

অবস্থানকারী নমঃশূদ্র ও মতুয়া অনুগামী উদ্বাস্তু, প্রভাবশালী ব্যক্তি রমেন মল্লিক, গৌর গোঁসাই, জগদীশ চন্দ্র ঠাকুর, কমলা কান্ত দাস, কৃষ্ণ চন্দ্র ঠাকুর প্রমুখের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। নদীয়ার মাজাদিয়া, বগুলা ও বেতাই অঞ্চলে নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের নিয়ে পুনরায় মতুয়া মহা সংঘের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের প্রচেষ্টায় উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া,স্বরূপনগর, গোবরডাঙ্গা, বনগাঁ, বাগদা, হরিণঘাটা, নদীয়ার বগুলা, কৃষ্ণনগর, হাসখালি, মাঝদিয়া, নবদ্বীপ প্রভৃতি এলাকায় বসবাসকারী নমঃশূদ্রদের মধ্যে মতুয়া মহাসংঘের শাখাসংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চেষ্টা করেন। যদিও এই ধর্মীয় সংগঠনটি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর ও অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ ও অনুগামীরা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১৯৫২ সাল থেকে রাজনীতিতে যোগদান করে। কংগ্রেস বিরোধী উদ্বাস্তু সংগঠন গুলির প্রচার সত্ত্বেও সেদিন রাতে উদ্বাস্তু ক্যাম্পের বিভিন্ন স্থানে মতুয়াদের পতাকা বা হরি-গুরু চাঁদের চিত্রপটে লাল নিশান ঝুলতে দেখা যায়। যদিও পরবর্তীতে মতুয়া মহাসঙ্ঘের অনুগামীদের একটা বড় অংশ কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন।

নন্দদুলাল মোহান্ত তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, শ্রী শ্রী হরিচাঁদের প্রদত্ত "দ্বাদশ আজ্ঞা" মতুয়াগণের অবশ্য পালনীয় রীতি। কিন্তু যুগভেদে এবং যুগ প্রয়োজনে পরবর্তীকালে অন্যান্য বিধিসমূহ লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত হয়েছে।এগুলি "মতুয়া আইন" নামে খ্যাত। অবিভক্ত বঙ্গে তদানীন্তন মতুয়া মহাসঙ্ঘ কর্তৃক এই "মতুয়া আইন" সর্ব প্রথম লিখিত আকারে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে মূল মতুয়া কেন্দ্র শ্রীধাম ওড়াকান্দি থেকে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ- গুরুচাঁদ মিশনের নামে ১৩৮৬(১৯৭৯) ও ১৩৮৭ (১৯৮০) বঙ্গাব্দে যথাক্রমে মহাবারুণী ও রথযাত্রার দিন শ্রীপতি ঠাকুর ও শ্রী হিমাংশু ঠাকুর এবং অপরপক্ষে শ্রী অংশুপতি ঠাকুর কর্তৃক পুস্তিকা আকারে এই মতুয়া আইন প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। মোট ৪৬ টি আইনের ধারা ছিল, মতুয়া নারীদের জন্য কি ছিল?

ক. কোন মতুয়া পুরুষ ২১ বছরের পূর্বে এবং নারী ১৪ বছরের নীচে বিবাহ বন্ধনে অবদ্ধ হবে না।"এক নারী ব্রাহ্মচারী" এই পরম আদর্শ সর্বদা স্মরণ রাখবে।কেবল মাত্র বংশ রক্ষার কারন ভিন্ন কোন মতুয়া পুরুষ কখনো দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করবে না। এবং পঞ্চাশ উর্ধে কোন মতুয়া পুরুষ কোন কারনে বিবাহ করিবে না।

খ. কোন মতুয়া মদ, গাঁজা, চরস,আফিং প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করবে না।স্ত্রীগণের পক্ষে তামাক ব্যবহার পর্যন্ত নিষিদ্ধ।

গ. মতুয়া বিধবা নারীকে আত্মসংযমী হয়ে শ্রী হরিনিষ্ঠা হতে হবে। বিলাসিতা বর্জন করতে হবে।এবং নির্জনে বা প্রকাশ্যে কারো সঙ্গে রহস্য আলাপ করিবে না বা কদাচ ব্যাভিচারী হবে না। মতুয়া নারী স্বামী বা স্বামী গৃহের গুরুজনের অনুমতি ব্যতীত পিতৃগৃহে বা অন্য কোন আত্মীয়ের বাড়ী যাবে না।

ঘ. কীর্তন ও মহোৎসবের আসরে একদিকে মহিলারা অন্যদিকে পুরুষেরা বসবে।

ঙ. স্বামী-স্ত্রী কেউ কারো কাছে কোন কথা গোপন রাখবে না। পরস্পর পরস্পরের সুখেদুঃখে সহানুভূতিশীল হবে।[৬১]

এই আইনগুলি মতুয়া ধর্ম সমাজের পুরুষরাই যে ঠিক করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তামাক খাওয়াটা শুধু নারীদের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছে, পুরুষদের জন্য নয় কেন? সেটার উত্তর যেমন পাওয়া যায় না তেমনি পাওয়া যায় না, ব্যভিচার কি শুধু মতুয়া ধর্মীয় সমাজের বিধবা নারীদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে? বিধবা নারী যে দোষেদুষ্ট, ব্যভিচার পুরুষ ও তো একই দোষে দুষ্ট হওয়ার কথা। তাহলে এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আইনে শুধু মাত্র বিধবা নারীকেই অপরাধী হিসাবে দেখানো হচ্ছে কেন?এই ধর্মের আইন প্রনেতাগণ আইনের মাধ্যমে বিধবা নারীদের অপরাধী হিসাবে পূর্বেই ঘোষণা করে দিয়েছেন। তার ফলে মতুয়া ধর্মে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার বলে স্বীকৃত সেটা অস্বীকার করা হয়। এবং এই ধর্মীয় সমাজ পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে নারীদের শাসন, শোষণ, আদেশ ও নির্দেশ দেয় সেটা বোঝা যায় একটি আইনের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করলে যেখানে বলা হয়েছে, 'মতুয়া নারী স্বামী বা স্বামী গৃহের গুরুজনের অনুমতি ব্যতীত পিতৃগৃহে বা অন্য কোন আত্মীয়ের বাড়ী যাবে না'। উনবিংশ শতক থেকে বিংশ শতকের শেষ দিকেও বিভিন্ন আইন প্রনয়নের মাধ্যমে নারীদের যে অবদমিত করে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে সেটা অস্বীকার করা যায় না।

৩.৯.দেশভাগ পরবর্তী পূর্ববঙ্গে অবস্থানকারী মতুয়া নারীর সামাজিক অবস্থা

'গান্ধী মরলো গুলি খাইয়্যা
জিন্না আধমড়া
বর্ণ হিন্দু পোলাইয়া গেল
এই চাঁড়াল পড়লেম ধরা' [৬২]

লক্ষণ দাসের ছোটবেলায় তার সন্তোষ কাকা এই ছড়াটা মাঝে মাঝে আউরাইতেন আর আকাশ পানে তাকিয়ে কিছু একটা ভাবতেন। হয়তো দেশভাগের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে লক্ষণ দাস সহ অন্যান্য নিম্নবর্ণের মানুষের মনে একই রকম ভাবনার বিষয় ছিল, যে ভাবনার বিষয়ে কেউ কোনদিন খোঁজ রাখেনি। ১৯৪৬ সালের নোয়াখালী দাঙ্গার বীভৎসতা মতুয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পূর্ব বঙ্গে নিজের বাসভূমিতে থাকা নিয়ে অস্তিত্ব সংকটে পড়তে হয়েছে, ফলে মতুয়াদের একাংশ প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের সাথে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিল। এবং যারা থেকে গিয়েছিল তারা বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়েছিল, যেটা শুরু হয়েছিল ১৯২৩ সালে পদ্মবিলা রায়টের[৬৩] মাধ্যমে । যদিও ফরিদপুরের জেলাশাসক নবগোপাল চাকী, গোপালগঞ্জের মহাকুমা শাসক কালিপদ মৈত্র প্রমুখ উচ্চবর্ণের আমলাগণ নমঃশূদ্রদের কখনও ভালো চোখে দেখেননি,তাঁদের সংঘর্ষকারী, 'দাঙ্গাবাজ' বলে অভিহিত করেছেন।[৬৪] ১৯৫০-৫৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্থানের বিভিন্ন স্থানে ৮০১২ টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয় এবং নমঃশূদ্ররাই বেশি ক্ষতি গ্রস্ত হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গুলোতে নারীদের কে সব চেয়ে বেশী মূল লক্ষ্যবস্ত করা হয়। ফলে পূর্ব বঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হিসাবে আশ্রয় নেয়। বেঁচে থাকার তাগিদে এই নারীরা বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু যে সমস্ত মতুয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকজন থেকে গিয়েছিল তারা সংখ্যা লঘু হিসাবে পূর্ব বঙ্গে ঘর থেকে না বেরনোর অবস্থা তৈরি হয়েছিল। যেখানে উদ্বাস্তু মতুয়া নারীরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে আর্থ- সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে শুরু করেছিল সেখানে পূর্ব বঙ্গের নারীদের ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। এর কারন ছিল সাম্প্রদায়িক একতরফা হিন্দুদের উপর হামলা, সম্পত্তি দখল করা ,বিশেষ করে নারীদের লক্ষ্যবস্ত করা হতো। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তার উদ্বাস্তু[৬৫] গ্রন্থে এক বেদনাদায়ক ঘটনা দেখিয়েছেন:

হিন্দুর মেয়েরা ঘাটে স্নান করতে গেলে সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকেরা ঘাটে এসে দাড়ায়।তাঁদের মধ্যে বয়সে নবীন যুবক যেমন আছে তেমনি প্রবীণও আছে। দাঁড়িয়ে তারা নাকি ছড়া কেটে গান ধরে। এক পাড়ের লোক গায়:

--পাক পাঁক পাকিস্থান

আর অন্য পাড়ের লোক গায়: হিঁদুর ভাতার মুসলমান।

এই অদ্ভুত আচরনে যে মেয়েটি জলে স্নান করতে নেমেছিল সে স্বভাবতই আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। নির্যাতনকারীদের মতে তার সেই আচরন ভারি কৌতুক-বোধ জাগায়।তারা হেসে কুটিকুটি হয়। এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে না। তারপর নাকি ঘাটের দিকে একজন পৌঢ় পুরুষ এগিয়ে এসে বলেনঃ ---ওরে তোর চাচীর পায়ে খিল ধরেছে।উঠতে কষ্ট হচ্ছে । হাত ধরে তুলে নিয়ে আয় না। সাম্প্রদায়িক আতঙ্কের বাতাবরন তৈরি হওয়ার ফলে মতুয়া নারীদের আর্থ –সামাজিক ও রাজনৈতিক কোন অংশ গ্রহন তাদের ছিল না।

শুধুমাত্র এই রকম পরিস্থিতি ছিল না, আশিস হীরা[৬৬] গ্রন্থে দেখিয়েছেন: '৪৬ সালে কোলকাতার দাঙ্গার খবর পূর্ববঙ্গে চরিয়ে পড়তে নোয়াখালীতে একতরফা ভাবে হিন্দু নিধন শুরু হয়। ১৬ অক্টোবর ১৯৪৬, বেঙ্গল প্রেস অ্যাডভাইজারি কমিটির রিপোর্টে দাঙ্গার বিবরন পাওয়া যায়ঃ এ রকম হাজার হাজার গুন্ডা গ্রামবাসীদের ওপর চড়াও হয়েছে, গোহত্যা করে গ্রামবাসীদের জোর করে গোমাংস খাইয়েছে এবং অনেক মেয়েকে হরন করেছে বা জোর করে বিয়ে করেছে, ধর্মান্তরিত করছে। নোয়াখালী দাঙ্গার ভয়াবহতা, বিশেস করে নারী নিগ্রহের ঘটনা আতঙ্ক গ্রস্ত করে তুলেছিল । স্বাধীনতার কয়েকদিনের মধ্যে ঢাকায় জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রার উপর হামলা হয়, বন্ধ করে দেওয়া হয় ধামরাইলের বিখ্যাত রথের মেলা।এই সময়ে নমঃশূদ্র অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে পরিচিত গোপালগঞ্জে কালীমূর্তি ভাঙ্গা নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়।[৬৭]১৯৪৮ সালে ঢাকা সহ পূর্ববঙ্গে দুর্গাপুজোর সংখ্যা কমে গিয়েছিল, কারন:

১) সংখ্যালঘুর মনে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল;

২) যাদের তত্ত্বধানে পুজোর আয়োজন হত,তাদের অনেকে ইতিমধ্যে দেশত্যাগ করেছে; যে পুজোগুলির আয়োজন করা হয়েছিল,তার বিরুদ্ধে পোস্টার পরেছিল।বিজয়া দশমীর দিন বহু হিন্দু বাড়ীতে আগুন লাগানো হয়েছিল।[৬৮]

১৯৫০ সালের ভয়াবহ দাঙ্গায় পূর্ব বঙ্গের ছয়টি জেলার সংখ্যা লঘুরা ক্ষতি গ্রস্ত হয়েছিল, ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ[৬৯] জানিয়েছেন: '...কোন রকম পূর্বাভাষ ছাড়াই ১০ই ফেব্রুয়ারি,১৯৫০-পর পূর্ব বঙ্গের ১২ টি জেলায়(ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর,ময়মনসিং,খুলনা, যশোর প্রভৃতি অঞ্চলে) হিন্দু বিরোধী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। তার মধ্যে অন্যতম ছিল বরিশাল যেটা নমঃশূদ্র নেতা যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডলের জেলা ছিল, যিনি তখনো পূর্ব পাকিস্থানের মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ছিলেন। দাঙ্গা বিধ্বস্ত বরিশালে গিয়ে যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল যে চিত্র দেখতে পেয়েছিলেন সেটা এই রকম- ইং ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ আমি বরিশালে পৌছলাম এবং সেখানকার দাঙ্গার ঘটনাবলী জেনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ...আমি জানতে পারলাম সব প্রাপ্ত বয়স্ক হিন্দু যুবকদের পাইকারি হিসাবে হত্যা করা হয়েছে, এবং যুবতী নারীদের দুবৃত্তকারীদের সর্দারদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। পশ্চিম পাকিস্থানের মিলিটারিরা সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা আর তীব্র করেছিল যখন এই ভাষা আন্দোলনে তাদের দাবি মতো উর্দু সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃত না হয়ে বাংলা ভাষাই বহাল তবিয়তে থাকে।

ফলে এই অবস্থায় যারা দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের সাথে পূর্ব বঙ্গের মতুয়া নারীদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উদ্বাস্তু নারীরা বেঁচে থাকার তাগিদে পুরুষের পাশাপাশি আর্থিক দুরাবস্থা দূর করার জন্য বিড়ি বাধা,কাঁথা সেলাই করে বিক্রি, কল-কারাখানায় শ্রমিকের কাজ করছে, ঠোঙ্গা বিক্রি করে খাবার জোগাড় করছে, আর অন্য দিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আতঙ্কে যারা থেকে ও গিয়েছিল তারা ঘর থেকে বেরনোই বন্ধ করে দিল। কারন একজন পরিবারের নারীকে বিধর্মীদের কবলে পড়লে , তাকে নির্যাতন করবে সেটা যেমন পরিবারের পক্ষে অসম্মানজনক মনে হবে পরিবারের পুরুষের কাছে, তেমনি সমাজের কাছে, ফলে পূর্ব বঙ্গের মতুয়া সমাজের একাংশ নারীদের আবার কঠোর ভাবে অবরোধ করে রাখা শুরু করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় প্রত্যেক পক্ষই চেষ্টা করে ধন সম্পত্তি লুঠ করার থেকেও বিপক্ষ সম্প্রদায়ের নারীর শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিশোধ স্পৃহা মেটাতে। এবং দেশভাগের পরবর্তীকালেও বিশেষ করে ১৯৬৪ সালে ভারত –পাক যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকার 'প্রতিরক্ষা অর্ডিন্যান্সের' মাধ্যমে হিন্দুদের জমি-জমা বিক্রি বন্ধ করে দেয় এবং তাদের সম্পত্তি 'শত্রু সম্পত্তি'

হিসাবে ঘোষণা করে। এবং সংখ্যাগুরু কট্টরপন্থী মৌলবাদী সংগঠনগুলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীদের উপর নির্যাতনের চিত্র ফুটে ওঠে।[৭০]

দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার এক মর্মান্তিক ঘটনার বিবরন দিয়েছেন সত্যেন্দ্র নাথ বিশ্বাস[৭১] তার 'মুক্ত সীমান্তের শেষ রাত' নামক প্রবন্ধে:

'ঢাকা মেল ট্রেন কুষ্টিয়া স্টেশনে আসলে, একটা মেয়ে জানায় তার নাম নমিতা দাস, কোটালিপাড়া থিকা আইচি। চুয়াডাঙ্গা স্টেশনে এসে তিনজন আনসার গাড়িতে ওঠে, যাদের বুকে আঁকা সবুজ চাদ-তারা। চোখে ওরা নমির শরীর মাপছে। হঠাৎ রাতে এসে নমিতা কে নিয়ে যায় বডি সার্চ করতে।ঘণ্টা খানেক পরে,গাড়ি থেকে নেমে দেখলাম দর্শনা স্টেশনের প্লাটফর্মে পড়ে আছে নমির অর্ধমৃত রক্তাক্ত শরীরটা। কাঁপা কাঁপা একটা হাত তুলে নমি কি যেন বুঝাতে চাইল। চারিদিকে উন্মক্ত আনসারদের উল্লাস।নমিকে গাড়িতে তুলে আনতে সাহস পেলাম না। এরপর পঞ্চাশ বছরের বেশী কেটে গেছে।নমির কথা ভুলে যাওয়াই উচিত ছিল। আনন্দবাজারে ' স্বীকারোক্তি' দিয়ে সেই চেষ্টাই করেছিলাম। কাল পত্রিকা অফিস থেকে হলুদ রঙের একটা খাম এসেছে আমার ঠিকানায়। অশক্ত হাতে লেখা 'সত্যেন দা, আমি মরিনি।সেদিন হাত তুলে তোমায় নামতে বলিনি,পালাতে বলেছি।তোমার গাড়ি চলে যাওয়ার পর একটা মাল গাড়ি এসেছিল। মড়া বোঝাই। তাতে কারা যেন আমায় ছুড়ে ফেলে দিল।তারপর রাণাঘাট। হাসপাতাল। কুপার্স ক্যাম্প। বিয়ে করেছিলাম। মা হতে পারিনি। তার সম্ভবনা দর্শনা স্টেশনেই শেষ হয়েছিল। তাই একদিন সেও তোমার মতোই আমাকে ছেড়ে কোথায় চলে গেল।এখন বৃদ্ধা আশ্রমে। একা'।

পূর্ব বঙ্গের আনসাররা পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের থেকে ধন সম্পত্তি লুঠ তো করতোই তার সঙ্গে নমিতার মতো হাজার হাজার মেয়েকে ধর্ষণ করেছে সেটা এই উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের মধ্যে একটা ছড়া প্রচলিত ছিল:

'কাশ্মীরে হানাদার
হায়দ্রাবাদে রাজাকার
পূর্ব বঙ্গে আনসার
জিন্নার হল ক্যান্সার' [৭২]

১৯৬৯ সালের ৬ দফা দাবীকে কেন্দ্র করে পূর্ব বঙ্গের রাজনীতি যখন উত্তাল হয়েছিল তেমনি নিম্নবর্ণের মতুয়াদেরও দেশ ছাড়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। '৬৯-এর ১৭ জানুয়ারি থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি মুজিবের মুক্তি পর্যন্ত সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছিল বাংলার ছাত্রসমাজ। আইয়ুবের লৌহ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়ে '৬৯-এর ২৪ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল। আইয়ুবের পতনের পর ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসেন।[৭৩] ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তন হলেও সংখ্যালঘূদের উপর নির্যাতন ও দেশছাড়া অপরিবর্তিত থাকে।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান 'বাঙালি-অবাঙ্গালী, হিন্দু –মুসলমান সবাই আমাদের ভাই, তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের।[৭৪] কিন্তু যাদের দায়িত্ব রক্ষকের পরিবর্তে ভক্ষকে পরিণত হয়েছিল।

পাকিস্থানি মিলিটারিদের হাত থেকেও তারা রক্ষা পায়নি। পাক বাহিনিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল[৭৫]: It is Mujib's home district. Kill as many bastards as you can and make sure there is no Hindu left alive," I was ordered. I frequently met Mr Fazlul Qadir Chaudhry, Maulana Farid Ahmed and many other Muslim League and Jamaat leaders।

তাদের সাথে দোসর হয়েছিল আলবদর, রাজাকার যারা হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল গুলি চিনিয়ে দিত, বা তারা নিজেরা গিয়ে হিন্দু নারীদের অত্যাচার করে মেরে ফেলতো। আশিস হীরা তার 'রক্তে রাঙা চম্পার শাড়ি/অঞ্জলি মণ্ডল(সরকার) প্রবন্ধে[৭৬] 'একাত্তরের রক্তস্মৃতি মহিলাদের মৌখিক বয়ান' পূর্ব স্মৃতি তুলে ধরেছেন, আলোচ্য অংশে অঞ্জলি মণ্ডলের বয়ানের মতো করে তুলে ধরার চেষ্টা করছি এই ভাবেঃ 'পূর্ব পাকিস্থানের ফরিদপুর জেলায় আমার জন্ম। জেলার মহাকুমা শহর গোপালগঞ্জ। সারাদেশ এই শহরকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের শহর হিসাবে চেনে। তার গাঁয়ের নাম কাটরবাড়ী। গ্রামের সকলেই নিম্নবর্ণের নমশুদ্র।এবং হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত। গোপালগঞ্জ শহরের কিছুটা দূরবর্তী বিল অঞ্চলগুলিতে নমঃশূদ্রদের বসবাস ছিল।তারা ঢাল সড়কি নিয়ে যুদ্ধ বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী। । চর ,ভূমি দখল কিংবা ব্যক্তিগত বিবাদদের ক্ষেত্রে, কাজিয়া সর্দারদের ডাক পড়ত। ১৯৬৪ সালে হাটবাড়িয়া গ্রামে হিন্দুর জমিতে মুসলমানের গোরুর ফসল খাওয়াকে কেন্দ্র

করে রায়ট শুরু হয়। গোটা অঞ্চল জুড়ে হিন্দু –মুসলমানদের ব্যপক সংখ্যক ঘর বাড়ী পোড়ে। এই লোক লড়াইয়ের স্থানীয় নাম কাজিয়া। হিন্দু মুসলিমের এই বিবাদকালে এই কাজিয়া সর্দার তথা লাঠিয়ালদের ডাক পড়লো। এই দাঙ্গার পরে উক্ত অঞ্চলের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক ভাঙ্গতে শুরু করে। তখন গ্রামের মহিলাদের বাইরে বেরোনো প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এর পরেই স্থানীয় পাকিস্থান-সমর্থক সাধারণ ভাবে যাদের রাজাকার আখ্যা দেওয়া হয়, তাদের বাড়-বাড়ন্ত শুরু হয়। হিন্দুদের বাড়ী চিহ্নিত করতে রাজাকাররা বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করে।১৯৭১ সালের কিছুদিন পরে চুপিসারে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন, তাদের বাড়ীর পাশের বাড়ীর চম্পারাও দেশ ছেড়েছে তিন দিন আগে। তার সঙ্গে তিনদিন পর দেখা হয় আভাপিসির তখন তিনি জানতে পারেন চম্পাকে নির্মম ভাবে হত্যার কাহিনী। চম্পাদের বাড়ীর লোকজন যখন লোহাগাড়া পেরিয়ে ছোট্ট একটা খালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল-অতর্কিত হামলা চলে তাদের উপর। রামদা, ভোজালি দিয়ে ভয় দেখিয়ে সোনাদানা ও অর্থ লুট করে নিল ।চম্পাকে তিন-চারটি ছেলে মিলে ঝোপের দিকে টেনে নিয়ে যায়। গিরিন আক্রমকারী ছেলেদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। পিছন থেকে এসে রাম দায়ের কোপে গিরিনের গলার অর্ধেকটা নেমে যায়। মাথাটা অর্ধেক জুড়ে থাকে ধড়ের সঙ্গে। লাশ পড়ে থাকে পথের উপর।রক্তে রাঙা হয় চম্পার শাড়ি। চম্পা জ্ঞান হারায়। তবুও চম্পার দেহের উপর চলে নর-পশুদের তাণ্ডব। পরে চম্পার কি হয়েছিল সেটা আর জানা যায় নি’।

সন্ধ্যা রানী বিশ্বাস[৭৭] জানিয়েছেন, পোড়াপুড়ির বছোর(১৯৭১ সালে মুক্তি যুদ্ধের সময়) অ্যাক ছল (তখন বয়স ৪, ছেলে) আরেকডা মাইয়া (তখন বয়স ৩, মেয়ে)ছেল(ছিল),শ্বউর, শাউরি, আর ওগে বাবা, এই হল সংসারের লোকজন। শুনলাম স্কুল মাডে(মাঠে) রাজাগাররা মিলিটারি নিয়ে আইছে, আমাগে মারার জন্যি। আমরা যেহানে(যেখানে) যে রইছি (রয়েছি) সব্বাই দৌড়াইয়া পুব্ব (পূর্ব) ডাঙ্গায় চইল্যা গ্যালাম(চলে গেলাম) । ঐ ডাঙ্গায় তহন ধান হইছে, কিছু দেহা যায় না। বেডারা(পুরুষরা) ও ভুঁই তে ছিল, আমরা এই বাড়ীর ১০-১২ শরিক একটা কুয়োর(পুকুর) পাড়ের নিচে নাইমা গ্যালাম(নেমে গেলাম) । আমরা আগেই জানতাম মিলিতারিরা (মিলিটারি) জলে নামতে ডরায় (ভয় পায়)।আমরা অইহানে হেই দুপুর থিক্যা চুপ কইর‍্যা থাকলাম। ওরা আমাদের পাড়া অব্দি আইলো না। আমাদের পাড়া ছিল ভুঁইতে, রাস্তা ছিল না, জল জম্মিয়া থাকতো। স্কুলে আগুন ধরাইয়া দেল (দিল) , সরকার পাড়া ধুইক্যা যাগে সামনে পাইলো তাদের মাইর‍্যা চইল্যা

গ্যালো। ঐ রাতে আর বাড়ীতে আমরা কেউ থ্যাকলাম(থাকলাম)না ,বিলে রইলাম। ২-৩ দিন ঐ ভাবে থাইয়কা (থেকে) বাড়ীর আরও ৪-৫ টা শরিক মিলে ইণ্ডিয়ায় রওনা দিলাম। শ্বউর, শাউরি, আইল না।রামদিয়া দিয়ে আমরা চুকনগরের মদ্ধি দিয়া ঐ পাড়ে আসলাম, দ্যাখলাম কতো কতো লোক, কেউ কাদছে, কেউ চুপ চাপ বসে আছে, কেউ চিৎকার করছে। আমরা ইণ্ডিয়ায় থাকলাম ১ বছর তার পর ফিরে আসলাম দ্যাশে।আসিয়া দেখলাম গ্রামের অনেকে ফিরে এসেছে, অনেকে আর কোনদিন ফেরে নাই, অনেকের রাস্তা ঘাটেই মৃত্যু হয়েছে। আমাগো সবাই মতুয়া ধর্ম মানি। হরি চাঁদ ঠাকুর তার কাছে শ্রী চৈতন্যের অন্য রূপ, গুরুচাঁদ ঠাকুর শিবের অবতার। ১৯৭৭-৭৯ সালে যে মতুয়া আইন তৈরি করেছিল সেটা নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, দেশের যা অবস্থা মেয়েরা কোথায় যাবে, চারিদিকে মিয়াঁরা হিন্দু মেয়ে পেলে তাকে আর বেছে ফিরতে দেয় না, আর দিলেও তাকে 'নষ্ট' করে দেয়, ওতে আরও মা-বাবার যেমন দুর্নাম, সমাজের দুর্নাম আবার জাতির ও দুর্নাম, তার থেকে ভালো ঘরের মধ্যে থাকা। 'মেয়েদের মেয়ের মতো থাকা উচিত বলে মনে করেন। রাজনীতিতে মতুয়া নারীদের অবস্থান এতো কম কেন জিজ্ঞেশ করাতে তিনি বলেন, ঘরের মধ্যে মেয়েরা ভালো থাকে , নির্বাচন করলে একটু বেশী বয়সী মেয়েদের করা উচিত, হাসিনা সরকার, খালেদা জিয়া সরকার কোনদিন আমাদের এই জেলায় মতুয়ারা বেশী তাই কখনও একটা MP মতুয়াদের দেয় নাই। আর মেয়েরাই বা কি রাজনীতি করবে। যতদিন বাবার বাড়ী আছে বাবা সব দেখবে, একটু পড়ালেখা শিখবে ভালো স্বামী পাবে, মন দিয়ে সংসার আর হরি নাম নিলে সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে।

খুলনা ও যশোর জেলার সীমান্তে ভদ্রা নদির তীরে একটি ছোট্ট জায়গার নাম চুকনগর। ১৯৭১ সাল থেকে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ভারতে আশ্রয় নেওয়ার জন্য যে পথ দিয়ে যাতায়াত করতো তার মধ্যে অন্যতম ছিল এই চুকনগর। ২০ মে ১৯৭১ সালে হাজার হাজার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যখন ভারতে পালিয়ে যাওয়ার জন্য ঐ অঞ্চলে জড়ো হয়েছিল ঠিক তখনি রাজাকারদের সহয়তায় পাক বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে যে গণহত্যা হয়েছিল, তা স্থানীয় প্রতক্ষ্যদর্শীদের মতে মুক্তিযুদ্ধের 'বৃহত্তম গণহত্যা' বলে দাবী করেন।[৭৮] কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে চুকনগরের গনহত্যা নিয়ে সরকারী ভাবে কোন উদ্যোগ দেখা যায় না।

এই মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদ হয়, ২লক্ষ মা- বোনকে ধর্ষণ করা হয় [৭৯] । যদিও ১৯৭১ সালে ২৫ শে মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্থানের অপারেশন সার্চ লাইট'নামে বুদ্ধিজীবী হত্যার মাধ্যমে যে গণহত্যা এবং ধর্ষণ শুরু হয়েছিল সেটার বর্ণনা দিয়েছেন অ্যান্থনি মাসকারেনহাস রচিত 'দ্যা রেইপ অফ বাংলাদেশ' পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন।[৮০] পাকিস্থানি বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিরোধ যারা গড়ে তুলেছিল তার মধ্যে শরণার্থী মতুয়ারা অনেকে ছিলেন। সেই তথ্য উঠে আসে, বকুল রানী বিশ্বাস[৮১] জানিয়েছেন, শরণার্থী হিসাবে ইন্ডিয়াতে আশ্রয় নেওয়ার পর, আমার স্বামী মেয়ে দুটো আর আমাকে, তার দুই ভাইয়ের কাছে রেখে মুক্তি বাহিনীতে যোগদান করেছিল, তার কিছুদিন পর ইন্ডিয়া যুদ্ধে যোগদান করলে ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্থান আত্মসমর্পণ করে। তার ২ মাস পর স্বামী এসে আমাদের বাংলাদেশে নিয়ে যায়। এখন বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে অনেকে বই লিখছে তাদের ইতিহাস জানছে, কিন্তু কোনদিন কেউ যুদ্ধের ইতিহাসের অংশ হিসাবে আমার স্বামীর কথা কেউ জানতে চায় নি, যদিও সরকার তাকে স্বামীর মৃত্যুর পর মুক্তিযোদ্ধার ভাতা দেন।

যদিও তারপর ও হিন্দু সংখ্যা লঘুদের উপর নির্যাতন কমে নি। ... ইহারাই পর ১৯৭৫ সালে মুজিব, তাজউদ্দীন ইত্যাদিদের হত্যা করিয়া সেনা প্রধান জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করিয়াছিল। ইহার অধিক লজ্জা বাঙালির জীবনে আর কী হইতে পারে?'[৮২] মুজিবের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রত্যাখান করে জিয়া বাংলাদেশে ইসলামিক রাজনীতি চালু করেন ।লেখক, সাংবাদিক ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নির্বাহী সভাপতি শাহরিয়ার কবির বলেছেন, ধর্মরিপেক্ষতা ও '৭২-এর সংবিধানের ক্ষেত্রে কোন আপোস নয়। তিনি বলেন, '৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর জিয়াউর রহমান ও পরে এরশাদ সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম অন্তর্ভুক্ত করে দেশে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু বিভাজন সৃষ্টি করেছেন।[৮৩] ফলে এই সময় সংখ্যা লঘুসম্প্রদায় হিসাবে মতুয়াদের নেতৃত্ববর্গ মহিলাদের নিরাপত্তার হেতু হিসাবে বিভিন্ন ধরনের পূর্বে উল্লেখিত নিয়ম নীতির প্রবর্তন করেন, যা তাদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

১৯৯০ সালে অক্টোবরের শেষে এবং নভেম্বরের প্রথম দিকে ভারতের অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে এই গুজব ছড়িয়ে বাংলাদেশে বাঙালি হিন্দুদের বিরুদ্ধে একটি ধারাবাহিক

আক্রমণ ও নৃশংসতার সূচনা করে মুসলিমরা। হিন্দুদের উপর ৩০ অক্টোবর থেকে নির্মম নৃশংসতা শুরু হয় এবং বিরতিহীন ভাবে ২ নভেম্বর পর্যন্ত চলতে থাকে।এছাড়া এই ঘটনার সূত্র ধরে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন মাত্রায় সমগ্র বংলাদেশ জুড়ে হিন্দুদের উপর বিরামহীন অত্যাচার, নির্যাতন, লুটপাট, হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণের মত জঘন্য নিষ্ঠুরতা চালাতে থাকে মুসলিমরা।[৮৪]

৩.১০.পর্যবেক্ষণ

দেশভাগের পরবর্তীতে একাংশ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে শুরু করে, ফলে বেছে থাকার তাগিদে আর্থিক ভাবে নারীরা বিভিন্ন ধরনের জীবিকা নির্বাহ করতে শুরু করে। তাদের ক্ষেত্রে পুরুষতন্ত্রের বাঁধন আলগা হতে শুরু করে, এবং তারাই সেটা ভেঙ্গে অর্থনীতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এগিয়ে চলতে শুরু করে। মতুয়া ধর্মের অনুশাসন তাদের আর বাঁধন দিতে পারেনি। সাম্সারিক ক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্তের কথা ও বিবেচনার মধ্যে আসে। নারী নির্যাতন ও ছিল কিন্তু পুরুষরা এবার থেকে নারীদের সমীহ করে চলতে শুরু করে কারন অর্থনৈতিক ভাবে তারা সচল হয়েছে। সরকারী বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে সাংবিধানিক সংরক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করতেও শুরু করে। ফলে দেশভাগে আগত নারীরা এই সময়ে শত দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে নিজেকে আর্থিক স্বচ্ছল করতে পেরেছে, ফলে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে শুরু করে। ওপর দেশভাগের পর ও যে একাংশ মতুয়া পূর্ব বঙ্গ তথা বাংলাদেশে থেকে গিয়েছিল, তাদের উপর সংখ্যালঘূ হিসাবে যতো নির্যাতন বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো ততোই নারীরাই পুরুষদের উপর নির্ভর করতে শুরু করলো। তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি যতো কঠোর হতে শুরু করলো তারা ততো সেই গুলো মেনে চলতে লাগলো। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে তারা পুরোপুরি পুরুষদের উপর নির্ভর করে। যদিও আর্থিক ভাবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে নারীরা স্বাবলম্বী হয়েছিল, কিন্তু সাংসারিক সিদ্ধান্ত গ্রহনে পশ্চিমবঙ্গের মতুয়া নারীদের মতো গুরুত্ব অর্জন করতে পারে নি।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তু: কারা এবং কেন?,*(সোনারপুর,বঙ্গদর্পণ প্রকাশন,২০০৫,) পৃ. ১৩।

২. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: *প্রান্তিক মানব,* (কল্যাণী, নদীয়া, প্রতিক্ষন পাবলিকেশন্স প্রাঃলিঃ)পৃ.২৩।

৩. আশিস হীরা: *উদ্বাস্তু ইতিহাসে ও আখ্যানে,(*কোলকাতা, গাঙ্গচিল, ২০১৯,)পৃ. ২০।

৪. মনোশান্ত বিশ্বাস: *বাংলায় মতুয়া আন্দোলন সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি* (কোলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০১৬)পৃ. ২৬৪।

৫. দীনেশ চন্দ্র সিংহ: ১৯৫০:রক্ত রঞ্জিত ঢাকা ও বরিশাল এবং, (কোডেক্স, কোলকাতা, ২০১২)পৃ. ২০।

৬. Source: *Relief and Rehabilitation of Displaced persons in West Bengal Report 1957.* (http://www.mcrg.ac.in)।

৭. মনোশান্ত বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৯৭ ।

৮. Census of India,1961. (http://shodhganga.inflibnet.ac.in/) ।

৯. দেবজ্যোতি রায়: *কেন উদ্বাস্তু হতে হল?* প্রকাশক- শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস, বইমেলা ২০০১,) পৃ. ২১ ।

১০. অশ্রুকুমার সিকদার: *বাংলা কথা সাহিত্যে বঙ্গ বিভাজন ও নিম্নবর্গীয়রা,* উদয়চাঁদ দাশ ও অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়(সম্পা.): দেশ বিভাগ ও বাংলা উপন্যাস,(বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ, ২০০৫,) পৃ. ১১।

১১. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৯।

১২. Census of India,1947, 1961,1971. (http://shodhganga.inflibnet.ac.in/) ।

১৩. সন্তোষ রানা ও কুমার রানা: *পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসি,* (কলিকাতা, ক্যাম্প,২০০৯)পৃ. ২২।

১৪. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০০৩ (http://bn.banglapedia.org/index.)।

১৫. মনোশান্ত বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৬৬।

১৬. মনোশান্ত বিশ্বাস: *তদেব,* পৃ. ২৬৯।

১৭. লিফলেট: *কাশীপুর ও পাঁচঘরিয়া শ্রী শ্রী শ্যামা মায়ের পূজা উপলক্ষে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা* ,নভেম্বর ১২,২০০৩।

১৮. মনোশান্ত বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,* পৃ.২৬৯।

১৯. অনিল সিনহা: *পশ্চিম বাংলা উদ্বাস্তু উপনিবেশ,* (কোলকাতা,ন্যাশনাল বুক, ১৯৭০,)পৃ.২৭।

২০. মহিতোষ বিশ্বাস: *পরতাল* ,(কোলকাতা,একবিংশ প্রথম শতক,২০১১)পৃ. ২২।

২১. মনোশান্ত বিশ্বাস: প্রাগুক্ত,পৃ.২৭৫।

২২. মনোরঞ্জন ব্যাপারী: *অভিশপ্ত অতীত,* সন্দীপ বন্দ্যপাধ্যায়(সম্পা.)দেশভাগ:স্মৃতি আর সত্ত্বা (কোলকাতা, প্রোগ্রেসিভ, ১৯৯৯,) পৃ. ৪৪।

২৩. কপিল কৃষ্ণ বিশ্বাস: *পি আর ঠাকুর যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন,*(নিখিল ভারত,মে-জুন,২০০৯,৩১ তম,৩য় সংখ্যা) পৃ. ৫৭।

২৪. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: *প্রাগুক্ত,* পৃ.১৯৫।

২৫. কুমুদ রঞ্জন মজুমদার: *মরিচঝাঁপি ও সি পি এম পার্টির উদ্বাস্তু প্রেম,*(পলতা, প্রকাশক, শ্রীসুশীল কুমার মজুমদার, ২০১৪),পৃ. ১৭।

২৬. মনোশান্ত বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,* পৃ.২৯৫।

২৭. জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল: *প্রাগুক্ত,* পৃ.১০৬।

২৮. মনোশান্ত বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,*পৃ. ৩০১।

২৯. Rup Kumar Barman: *Partition of India and Its Impact on the SCs of Bengal* ,(New Delhi, Abhijeet Publications,2012)p.p.192-193।

৩০. মনোশান্ত বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩০৭।

৩১. Sekhar Bandyopadhyay: *Caste,Culture and Hegemony, Social Dominance in Colonial Bengal*(New Delhi, Sage Publications, 2004)p. 145।

৩২. আশিস হীরা: *প্রাগুক্ত,* পৃ.১৯৭।

৩৩. প্রফুল্ল রায়: *নোনা জল মিঠে মাটি,*(কলিকাতা,গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স,১৯৫৯)পৃ.পৃ১২৫-১২৭।

৩৪. প্রফুল্ল রায়: *তদেব,*পৃ.২১২।

৩৫. মনোরঞ্জন ব্যাপারী: *অনন্ত রাত্রির চণ্ডাল,* মধুময় পাল,(সম্পা.)-'দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ,(কোলকাতা,গাঙচিল,২০১১)পৃ. ২২১।

৩৬. যোগেন্দ্র নাথ রায়: *কুপার্স ক্যাম্পে ছেলেবেলা;*পাল,মধুময়,(সম্পা.)-'দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ,(কোলকাতা, গাঙচিল,২০১১) পৃ. ১৫৫।

৩৭. পুষ্প বৈরাগ্য: *ছিন্নমূল দরিদ্র দলিত পরিবারের মেয়ের বেড়ে ওঠা,*কল্যাণী ঠাকুরচাঁড়াল, (সম্পা.) 'দলিত মেয়েদের সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী-সহ অন্যান্য রচনা' (কোলকাতা, প্রকাশক- কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল, অষ্টদশ সংখ্যা, ২০১৭) পৃ.পৃ. ৪৪-৬১।

৩৮. Jasodhara Bagchi ও Shubharanjan Dasgupta (ed) : *The Trauma and Triumph: Gender and partition India* (kolkata, Stree, 2005)p. 123 ।

৩৯. লিলি হালদার: *মরিচঝাঁপির মেয়ে,* কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল (সম্পা.) 'ভারতীয় নারীর ছোট গল্প' (কোলকাতা, প্রকাশক-কল্যানী ঠাকুর চাঁড়াল, ২০১৫)পৃ.পৃ. ৮-১০।

৪০. কানন বড়াল: আত্মকথা, কল্যাণী ঠাকুরচাঁড়াল, (সম্পা.) 'দলিত মেয়েদের সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী-সহ অন্যান্য রচনা' (কোলকাতা, প্রকাশক- কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল, অষ্টদশ সংখ্যা, ২০১৭) পৃ.পৃ. ১৭-২২।

৪১. আশিস হীরা: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ২৪৩-২৪৬।

৪২. প্রফুল্ল রায় : *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ১৪১-১৫৫।

৪৩. Gargi Chakraborty: Coming Out of Partition: Refugee Women of Bengal' (Srishti publisher and Distributors, India, ,2007)p. 242 ।

৪৪. দীনেশ চন্দ্র সিংহ: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২০।

৪৫. চঞ্চলা বিশ্বাস: *[৭০,কাশীপুর, হাবড়া,উঃ ২৪ পরগণা,]* সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎ গ্রহনকারী গবেষক নিজেই। (০৬/ ০৪/২০১৮)।

৪৬. ভানুমতী মজুমদার: *[৬২,কাশীপুর,হাবড়া,উঃ ২৪ পরগণা]* সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎ গ্রহনকারী গবেষক নিজেই। (০৭/ ০৪/২০১৮)।

৪৭. ফুলরানী দাস: *[৭৮,কাশীপুর,হাবড়া,উঃ ২৪ পরগণা]* সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎ গ্রহনকারী গবেষক নিজেই। (০৮/ ০৪/২০১৮)।

৪৮. কপিল কৃষ্ণ বিশ্বাস: *বাঙ্গালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের ভূমিকা,* (কোলকাতা, নিখিল ভারত,বিশেষ সংখ্যা,২০১০)পৃ. ২০।

৪৯. মনোশান্ত বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,*পৃ.২৬৮।

৫০. মনোশান্ত বিশ্বাস: *তদেব,*পৃ. ২৭৩।

৫১. মনোশান্ত বিশ্বাস: *তদেব,* পৃ.২৭৫।

৫২. মনোশান্ত বিশ্বাস: *তদেব,*পৃ.৩০৭।

৫৩. কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর: *উজানতলীর উপকথা'(১ম পর্ব)'* কোলকাতা,চতুর্থ দুনিয়া, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১২)পৃ. ২০৫।

৫৪ . প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী: *প্রাগুক্ত,*পৃ.৫৩।

৫৫. নীলিমা দত্ত: *উদ্বাস্তু কলোনী,* মধুময় পাল(সম্পা.):'দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ', . (কোলকাতা, গাঙচিল,২০১১)পৃ. ১৭৩।

৫৬. যোগেন্দ্র নাথ রায়: *প্রাগুক্ত,*পৃ. ১৫৫।

৫৭. Rup Kumar Barman: *প্রাগুক্ত,*পৃ .২০৫ ।

৫৮. Rup Kumar Barman: *প্রাগুক্ত,*পৃ .২০৬

৫৯. পুষ্প বৈরাগ্য: *প্রাগুক্ত,* পৃ.পৃ. ৪৪-৬১।

৬০. মনোশান্ত বিশ্বাস:*বাংলায় মতুয়া আন্দোলন সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি,* (কোলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০১৬)পৃ. ২৭৭।

৬১. মোহান্ত, নন্দ দুলাল:*মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ,* (কোলকাতা,অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, ২০০২) পৃ.পৃ. ১৪৪-১৫৩।

৬২. Tareque Masud এবং Catherine Masud(পরিচালিত):*অন্তর্যাত্রা(The Homeland)*,পরিচালক-,-২০০৬)।

৬৩. ডঃ মোহান্ত, নন্দ দুলাল: *প্রাগুক্ত,*পৃ. ১৪৩।

৬৪. দীনেশ চন্দ্র সিংহ: *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৯।

৬৫. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়: *উদ্বাস্তু,*(কোলকাতা,সাহিত্য সংসদ)পৃ.১৫।

৬৬. আশিস হীরা: *প্রাগুক্ত,* পৃ.১৮৭।

৬৭. দক্ষিনা রঞ্জন বসু: *ছেড়ে আসা গ্রাম,* তপন বাগচী(সম্পা.),'আনন্দ নাথ রায়ের ফরিদপুরের ইতিহাস' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)(কোলকাতা,'র‍্যাডিক্যাল) পৃ. ৪৩৫।

৬৮. আশিস হীরা: *প্রাগুক্ত,*পৃ. ২৬।

৬৯. ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ: *প্রাগুক্ত,* পৃ.২০।

৭০. বদরুউদ্দিন উমর: *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি,১ম খণ্ড* (কলিকাতা,আনন্দধারা প্রকাশন, ১৯৭১)পৃ.২৮৭।

৭১. সত্যেন্দ্র নাথ বিশ্বাস: *মুক্ত সীমান্তের শেষ রাত,*মধুময় পাল: 'দেশভাগ বিনাশ ও বিনির্মাণ',(কোলকাতা,গাঙচিল, প্রথম প্রকাশ ২০১১) পৃ.পৃ.১১৪-১১৭।

৭২. ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ: *প্রাগুক্ত,*পৃ.২৪।

৭৩. মুক্তিযুদ্ধ-ই-আর্কাইভ ট্রাষ্ট: মুক্তিযুদ্ধ ই সংকলন (ঢাকা,২,ফেব্রুয়ারি ২০১৯), পৃ.১৬৭।

৭৪. হাফিজুর রহমান (সম্পা.): *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ:* দলিল পত্র' দশম খণ্ড,গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২) পৃ.১৯২।

৭৫. http://www.genocidebangladesh.org/)।

৭৬. আশিস হীরা: *রক্তে রাঙা চম্পার শাড়ি/অঞ্জলি মণ্ডল(সরকার)* হালদার, সাত্যকি(সম্পা.), 'একাত্তরের রক্তস্মৃতি মহিলাদের মৌখিক বয়ান'(কোলকাতা,গাঙচিল,২০১৯)পৃ.পৃ. ১২৭-১৩৮।

৭৭. সন্ধ্যা রানী বিশ্বাস: *[৭২,সিঙ্গা,কাশিয়ানী,গোপালগঞ্জ],*সাক্ষাৎদাতা,সাক্ষাৎগ্রহনকারী-গবেষক নিজেই (০৭/০৪/২০১৯)।

৭৮. শর্মিলা বসু: *ডেড রেকনিং ১৯৭১ সালের যুদ্ধের স্মৃতি* (অনুবাদ- সুদীপ্তা রায়, ঢাকা, হাসর্ট এন্ড কোম্পানি, ২০১১)পৃ.১১৮।

৭৯. সিডনি শানবার্গ: *ডেডলাইন বাংলাদেশ: ১৯৭১,*(অনুবাদক-মফিদুল হক,ঢাকা,সাহিত্য প্রকাশ,২০১০)পৃ.১৯৬।

৮০. অ্যান্থনি মাসকারেনহাস: *দ্যা রেইপ অফ বাংলাদেশ,*(অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী,ঢাকা,প্রকাশক -সিরাজুল ইসলাম, ২০০৫)।পৃ.১৭।

৮১. বকুল রানী বিশ্বাস: [*৬৮,সিঙ্গা,কাশিয়ানী,গোপালগঞ্জ],*সাক্ষাৎদাতা, সাক্ষাৎ গ্রহনকারী-গবেষক নিজেই,) ০৮/০৪/২০১৯।

৮২. মিহির সেনগুপ্ত: *শরণার্থীর মুক্তিযুদ্ধ,*(ঢাকা, কাগজ প্রকাশন,২০১৫) পৃ.১০০।

৮৩. http://web.dailyjanakantha.com(১৮/০৩/১৯) ।

৮৪. শাহরিয়ার কবির: *একাত্তরের গণহত্যা, নির্যাতন ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার,* (ঢাকা, সময় প্রকাশন, ২০১২) পৃ.৭৬।

চতুর্থ অধ্যায়

মতুয়া নারীদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন বৃত্তান্ত (১৯৯০-২০১১)

ভারতীয় প্রেক্ষিতে ‘দলিত’ ভাবনার উৎস নিহিত রয়েছে ভারতবর্ষীয় হিন্দু সমাজের জাতপাত ব্যবস্থার গঠন কাঠামোর মধ্যে। এদেশে ধর্মীয় রীতিনীতির মাধ্যমেই জাত ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল ‘বিধির বিধান’ ও ‘সামাজিক বিধি’ হিসাবে। চতুর্বর্ণের বাইরে ছিল তারা অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ, অজল-চল বলে বর্ণ হিন্দুদের কাছে পরিচিত ছিল। ‘প্রাচীনকাল থেকেই সমাজের উপর নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য ব্রাহ্মণগণ ধর্মশাস্ত্র গুলিকে নির্দেশিকা হিসাবে রচনা করেছেন,সর্বত্র আধিপত্যের নিরঙ্কুশ সুরক্ষার জন্য ব্রাহ্মনকৃত গ্রন্থাদির শাস্ত্রীয় বিধানের প্রয়োগের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল ক্ষত্রিয়দের উপর। এই ভাবে ধর্ম ও রাষ্ট্র যৌথভাবে শূদ্র আখ্যাপ্রাপ্ত জাতি সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় ব্রাহ্মন্য সেবা ও রাজনুগত্যের নামে মানসিক, সামাজিক ব্যবস্থার করুন ও নিষ্ঠুর নিয়মগুলি। উদবৃত উৎপাদন এবং তৎসংশ্লিষ্ট শ্রম বিভাজন উচু-নিচু ভেদাভেদ অনুযায়ী নিচু স্তরের পেশার লোকেদেরকে অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য আখ্যা দেওয়া হয়। সামাজিক শ্রম বিভাজনের ক্রমবর্ধমান এই ‘হেয়তম’ অথচ অতি প্রয়োজনীয় কায়িক শ্রমে নিযুক্ত মানুষেরা সমাজের দৃষ্টিতে চতুর্বর্ণের বাইরের অন্ত্যজ বা অবর্ন হিসাবে ধর্মশাস্ত্র প্রনেতাদের নির্দেশে বংশগত অবস্থানে রয়ে গেল, ক্রমোচ্চ বর্ণ বিভাগে এঁদের উচ্চবর্ণে উত্তরণের কোনো সুযোগ ছিল না আর শাস্ত্র রইল না’।[১] বৈদিক যুগের পরবর্তী সময়ে বহিরাগত আর্যদের সাথে ভারতীয় উপজাতিদের মধ্যে সংমিশ্রণ প্রক্রিয়া চললেও অনার্য উপজাতির মধ্যকার কিছু গোষ্ঠী যেমন নিষাদ, কিরাত, চণ্ডাল(ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রার ঔরসে সকল জাতির অধম চণ্ডালদের উৎপত্তি হয়েছে।), অন্দ্র প্রভৃতি জাতিগুলিকে ‘অস্পৃশ্য’ শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছিল।[২] এই সম্পর্কে বি আর আম্বেদকরের মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন- ‘According to it, It is the Shudra who is born last. The Untouchable is outside the scheme of creation. The Shudra is Savarna. As against him the Untouchable is Avarna, i.e outside the Varna system. The Hindu theory of priority in creation does not and cannot

apply to the Untouchable.[৩] দলিত কথাতির আভিধানিক অর্থ হল-(দ+ত(স্ম)-বিন) যাকে দলন করা হয়েছে। অর্থাৎ 'মর্দিত, নিষ্পেষিত, নিপীড়িত, শোষিত এবং বিভক্ত'।[৪] দলিত কথাটির আরো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন Sukhadeo Thorat-

Generally 'dalit' mean a poor and downtrodden people of our society. The word 'Dalit' was derived from Sanskrit language and the literary meaning of dalit is 'grown down', 'oppressed' or 'broken'. As political epithet the term dalit was used in the 1930s as a Hindi and Marathi translation of 'Depressed classes'.[৫] অধ্যাপক গোপাল গুরু[৬] তাঁর প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন Dr.B.R.Ambedkar 'দলিত' কথাটি কোন অর্থে ব্যবহার করেছেন-

Dr.B.R.Ambedkar also used term in his Marathi discourses, called Bahishkrut Bharat. He says, '...dalithood is a kind of life conditions which characterize the exploitation, suppression and marginalization of Dalits by the social, economic, cultural and political domination of the upper caste's Brahminical ideology'.

অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ, হরিজন এবং দলিত কথাটি একই অবস্থান বোঝায় তাঁর ব্যাখ্যা দিয়েছেন- Untouchability is a historical phenomenon and untouchables have been called by various names such as 'Harijans', 'Exterior Castes', 'Depressed Classes', 'Outcastes', 'Mlechha' 'Chandala', 'Panchama', 'Nishada', 'Antyaja', etc.[৭]এই অবহেলিত অস্পৃশ্যদের সংগঠিত করেই ১৯২৭ খ্রিঃ ২৫শে ডিসেম্বর ডঃ বি আর আম্বেদকর মাহার অস্পৃশ্যদের জন্য নিষিদ্ধ চাভাদর সরোবরের জল স্পর্শ করে বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে 'দলিত আন্দোলন'-এর সুস্পষ্ট পদরেখার সূত্রপাত করেন।[৮] দলিত বা অস্পৃশ্য জাতি সম্প্রদায়গুলো শুদ্ধ-অশুদ্ধ এবং শুচি –অশুচি বিচারে মন্দিরে প্রবেশের অধিকার, এক পুকুরের জল নেওয়ার অধিকার, এক সঙ্গে ভোজনের অধিকার ও শিক্ষা গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থেকেছে। এমনকি উচ্চবর্ণের লোকেরা অস্পৃশ্য বা দলিত মানুষকে স্পর্শ করা বা তাদের হাতে জলগ্রহন

করাকে ঘৃণ্য বা অমর্যাদাকর বলে মনে করতো। দলিত আন্দোলন বা অস্পৃশ্য জাতি সম্প্রদায়গুলোর লক্ষ্য ছিল সামাজিক দিক দিয়ে সাম্য বা সমান মর্যাদা অর্জন করা, আত্মসম্মান এবং ধর্মীয় অধিকার অর্জন করা অর্থাৎ অস্পৃশ্যতা দূর করা এবং সামাজিক উত্তরণ ঘটানোই জাতি সম্প্রদায়ের আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ দিক।

১৯৫৪ সাল থেকে 'দলিত' শব্দটি ব্যাপক ভাবে চালু হয়েছে।[৯] ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের দলিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মের মধ্যে দেখা যায় যে, দলিত সাহিত্য নিছক সাহিত্য কর্ম নয় বরং আন্দোলন রূপেও দেখা গেল। দলিত সাহিত্য চর্চার ভিত্তিভূমি ছিল মহারাষ্ট্র। জ্যোতিরাও ফুলে(১৮২০-৯০) ও আম্বেদকরের হাত ধরে মহারাষ্ট্রে দলিত সাহিত্য চর্চা শুরু হয়।[১০]

৪.১.বাংলায় দলিত আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলে দলিত আন্দোলন বেশ জোরালো অথবা অ্যাকাডেমিক পরিসরে দলিত সাহিত্য চর্চা হয়, সেই সমস্ত অঞ্চলে "দলিত" ধারনা বিষয়ে মানুষের মনে সংশয় কম অথবা সংশয় নেই। তাদের কাছে অনেক পরিষ্কার,পরিষ্কার না হলেও বিস্ময়ের বস্ত অন্তত নয়। দীর্ঘদিন ধরে বাংলার দলিত কণ্ঠস্বর ছিল একেবারেই অশ্রুত। একদিকের বয়ান, " বাংলায় দলিত সাহিত্য নেই", অন্য দিকের বয়ান, "বাংলায় কি সত্যিই দলিত নেই" প্রথম বয়ানে জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না বাংলায় দলিত নেই, কিন্তু বেশ জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে যে বাংলায় দলিত সাহিত্য নেই। যদি থাকতই তাহলে কি জানতাম না? প্রথম বয়ানটি পর্যবেক্ষণের অভাব ও দলিত সংবাদ সম্প্রচারের অভাবে তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয় বয়ানটি তৈরি হয়েছে আবেগের ভ্রান্তি থেকে। হয়তো একদল বাঙালি ভাবেন অন্য ভারতে যা ঘটে এখানে তা ঘটে না। ফলত বলা যায় না যে এখানে দলিত আছে।[১১] কিন্তু বাংলায় দলিত রয়েছে। উনবিংশ শতকেও বাংলায় হিন্দু ধর্মের চার বর্ণ ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ছিল ।শূদ্রদের সংকর জাতি হিসাবে ৩ তিনটি বিভক্ত করা হয়েছে। (১) উত্তম সংকর- ২০ টি জাতি (২) মধ্যম সংকর ১২ টি জাতি এবং (৩) অধম সংকর জাতি। অধম সংকর হিসাবে ৯ টি জাতির কথা উল্লেখ করা হয় (মলেগ্রহি, কুডব, চণ্ডাল, বরুড়, তক্ষ, চর্মকার, ঘট্টজীবী, ডোলাবাহী, মল্ল)। তার মধ্যে চণ্ডালের স্থান ছিল তৃতীয়[১২] আবার ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে একই ভাবে শূদ্রদের তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে- (১)সৎ শূদ্রঃ ১৬ টি জাতি (২) অসৎ

শূদ্রঃ ১৯ টি জাতি এবং অন্ত্যজঃ ১০ টি জাতি(ব্যাধ, ভড়, কোল, কোঞ্চ, হাড়ি, ডোম, জোলা, বাগতীত, ব্যালগ্রাহী, ও চণ্ডাল)। অন্ত্যজদের মধ্যে 'চণ্ডালদের' অবস্থান সর্বনিম্নে।[১৩]অন্ত্যজদের স্পর্শ করা জল উচ্চবর্ণের লোকেরা পান করতেন না। বিংশ শতকের প্রথম দিকে বাংলার অন্ত্যজ বা অধম বর্ণগুলির ক্ষেত্রে অস্পৃশ্য জাতির পরিবর্তে 'অজল চল' জাতি হিসাবে গন্য হতো। ইংরেজ ঔপনিবেশিক সরকার নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা তৈরি করতে থাকলে জাতি বিভাগ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়, সমাজে নতুন পেশার সৃষ্টি হল, যার ভিত্তি যোগ্যতা। এর ফলে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে নতুন পেশাভিত্তিক জাতি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। 'কৃষিজীবী হিসাবে চিহ্নিত বৃহৎ বৃহৎ আকারের জাতিগুলি ছিল রাজবংশী, নমশূদ্র(চণ্ডাল), পৌণ্ড্র, বাগদি, ভুঁইমালী, বাউরি,বেলদার, ভোক্তা, কাউরা, পালিয়া, কোটাল ইত্যাদি। অন্যদিকে দোয়াই, গোনরি, জেলিয়া, কৈবর্ত, মালো, কান্দ্রা, মাল্লা, পাটনি, তিয়র, ঘাসি,বিন্দ প্রভৃতি জাতিগুলি ছিল মূলত মৎস্যজীবী। চর্মকারের কাজে নিযুক্ত ছিল মুচি ও দাবগারগন।পান ও চৌপালদের প্রথাগত কাজ ছিল কাপড়বোনা। ধোপারা নিযুক্ত ছিলেন কাপড় ধোওয়ার কাজে।ঝাড়ুদার বা মেথরের কাজে নিযুক্ত ছিল কয়েকটি সম্প্রদায়(হালালখোর, হাড়ি, মেথর, লালবেগি)'।[১৪] ভারতের ১৮৭২ সময়কাল থেকে বিভিন্ন বর্ণের সম্প্রদায় গুলির সামনে তাঁদের বর্ণপরিচয়ের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাড়ায় এবং সামাজিক স্থায়ী পরিচিতি অর্জন এবং উক্ত বর্ণের আদি উৎস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নতুন চর্চার উদ্ভব হয়। এই সময়বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে নিজস্ব সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ইতিহাস অনুসন্ধানই জাতি সচেতনতার একটি পরিমণ্ডল তৈরি করেছিল। বিশেষত অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের স্থায়ী পরিচিতি নিয়ে যে টানাপোড়ন বা জটিলতা ছিল তার উৎস ছিল মনু রচিত আইন সংহিতা এবং বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র, যাতে চতুর্বর্ণের বাইরের সম্প্রদায়গুলিকে বর্ণহিসাবে কোন স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এঁদের অবর্ণ, পঞ্চম জাতি, অতিশূদ্র,অস্পৃশ্য, বলা হতো'।[১৫] একই মত দেখা যায় দেবী চ্যাটার্জি[১৬]। তার প্রবন্ধে বলেছেন- The practice of untouchability remains integral to the caste order. Persons belonging to the castes lowest in terms of the hierarchy and considered as the most polluting are stigmatized as untouchables. Untouchable castes have been variously referred to as panchamas, antyajas, atishudras, avarna, depressed classes, Harijans, scheduled castes, and Dalits.

বাংলায় অস্পৃশ্যতার মাত্রা অবশিষ্ট ভারত থেকে কম হলেও পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলের চিত্র ছিল আলাদা। অধম সংকর জাতিদের সাথে উচ্চবর্ণের সুবিধাভোগীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিরাট দূরত্ব ছিল। উচ্চবর্ণের মানুষ মুখে সর্বদাই 'অজল –চল বা অস্পৃশ্যতার পক্ষপাতী ছিল। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে চণ্ডাল জাতি সম্প্রদায়ের 'সামাজিক আন্দোলন' [১৭] । এই দলিত আন্দোলনের মাধ্যমে তারা তাদের সামাজিক অবস্থান, ধর্মীয় অধিকার স্থায়ী পরিচিতি (Identity) অর্জনের জন্য স্থানীয় ধর্মীয় মতাদর্শের ছত্রছায়ায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে সম্প্রদায় গত মর্যাদা বা সম্মানজনক অবস্থান তৈরি করেছে। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির দাবীতে ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করার দাবীতে স্থানীয় ধর্ম মত হিসাবে হরিচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ধর্ম মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারক চন্দ্র সরকার (১৮৪৫-১৯১৪) রচিত *'শ্রী শ্রী হরি লীলামৃত'* গ্রন্থ এবং মহানন্দ হালদার (১৯০২-১৯৭২) রচিত 'শ্রী গুরুচাঁদ চরিত' নামক গ্রন্থ মতুয়া তথা দলিত সাহিত্য হিসাবেও পরিচিত। অন্যান্য জাতি সম্প্রদায়ের দলিত লেখকদের সৃষ্ট দলিত সাহিত্য হল- পৌণ্ড্র জাতির সম্পর্কে শ্রীমন্ত নস্কর রচিত *'জাতি চন্দ্রিকা'* ও বেণী মাধব হালদারের *'জাতি বিবেক'* (১৮৮৭), রাজবংশীদের হর কিশোর অধিকারী রচিত 'রাজবংশী কূলপ্রদীপ' এবং মালোদের ক্ষেত্রে মহেন্দ্রনাথ মল্ল বর্মণের *ঝল্লমল্ল পরিচয়* (১৩৩১)।[১৮] উনবিংশ শতক থেকে বিংশ শতকের সৃষ্ট দলিত সাহিত্য থেকে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। ফলে বাংলায় যে দলিত সাহিত্য ছিল সেটা অস্বীকার করা যায় না । কিন্তু দেশভাগের পরবর্তীতে যেখানে দলিত আন্দোলন সমগ্র ভারতে ব্যাপক আকার ধারণ করে সেখানে বাংলায় এতো নীরব কেন? দীর্ঘ দিনের মার্কসীয় আন্দোলন কি অনেকটাই মুল্যহীন করে দেয় জাত পরিচয়ের প্রশ্নকে? কেবল কি জাতের প্রশ্ন আবৃত হয় শ্রেণী প্রশ্নে? হ্যা, বামপন্থীরা জাতের প্রশ্ন কে শ্রেণী চেতনার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চেয়েছেন, এবং বামপন্থীদের মধ্যেই উচ্চবর্ণের প্রাধান্য বরাবরই বজায় থেকেছে, জাত-পাত নিয়ে আলাদা করে ভাবার সময় তাদের ছিল না। ফলে 'শ্রেণী-চেতনা দিয়ে সাম্য-সন্ধানের বামপন্থী প্রয়াস যে ব্যর্থ তা একজন সাধারন মানুষেরও আজ আর বোধের অতীত নেই'।[১৯] কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে জাত-পাতের দায় বামপন্থীদের উপর চাপিয়ে জাত-পাতের প্রশ্নকে ঝেড়ে ফেলা যায় না। ১৯৭০-র দশকে ভারতের মার্কসবাদী রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে উত্তপ্ত বাদানুবাদ ঘটে যায় 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর শিকড় খুঁজে পাওয়া যায়

সেই অসম্পূর্ণ বিতর্কে। ১৯৮২ সালে যখন রণজিৎ গুহের সাবলটার্ন স্টাডিজ (নিম্নবর্গের ইতিহাস) সংকলন বের হয়, ইতিহাস চর্চার সব ঘরানা থেকে সমোলোচনার ঝড় ওঠে, তখন থেকে ধীরে ধীরে ইতিহাস রচনার পদ্ধতি পরিবর্তন হতে শুরু করে। বিশ শতকের ছয়ের দশক পর্যন্ত ইতিহাস চর্চার বেশ কয়েকটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। পৌরাণিক ইতিহাস চর্চার ধারা, জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার ধারা, সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস চর্চার ধারা, মার্কসবাদী ইতিহাস চর্চার ধারা, এবং পরবর্তীতে যোগ হয় সাবলটার্ন ইতিহাস চর্চার ধারা। কিন্তু এই সাবলটার্ন ইতিহাস চর্চার ধারা তে নানা ধরনের সমস্যা দেখা গেল, এই ইতিহাস চর্চার ধারাতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের আইডেন্টিটি (Identity) খুঁজে পাওয়া গেল না। আবার নারী, সমাজ, প্রান্তিক কৃষক, দলিত নিম্নবর্গের মানুষ ও থাকলো উপেক্ষিত।[২০] কিন্তু এই সময়েই বাংলায় নতুন করে দলিত বা নিম্নবর্ণের মানুষদের ইতিহাস উঠে আসতে লাগলো বিভিন্ন গবেষকের গবেষণার মাধ্যমে। ১৯৮৭ সালে 'বঙ্গীয় দলিত লেখক পরিষদ গঠিত হয়।এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন বিমল বিশ্বাস, সম্পাদক নকুল মল্লিক ও অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন রণেন্দ্র নাথ বিস্বাস।এই বছরে মছলন্দপুরে দুই দিন ব্যাপী 'বঙ্গীয় দলিত সাহিত্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় দলিত লেখক পরিষদের ত্রৈমাসিক মুখপাত্র *'দলিত কণ্ঠ'* নকুল মল্লিকের সম্পদনায় প্রকাশিত হয়।[২১] দলিত পুরুষদের লেখনীতে উঠে আসে তাদের প্রতি কতো ধরনের বৈষম্য হয়েছে, কেন হয়েছে, এই সব নিয়ে চর্চা শুরু করেন কিন্তু তাদের লেখায় কখনো দলিত নারীদের বৈষম্যের কথা কখনো ফুটে উঠে না। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তাঁদের সামাজিক , রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা দলিত পুরুষ লেখকরাও করে নি । পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দলিত নারীদের অবস্থা তুলে ধরা সম্ভব নয়।

এক্ষেত্রে, যদি আমরা *countercurrent*[২২]-এ, এম স্বাথী মার্গারেটের প্রবন্ধটি দেখি তাহলে দেখতে পাবো, তিনি নিজেকে একজন দলিত মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত তেলেগুভাষী দলিত-খ্রিস্টান নারী হিসাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন যে, কাত্তি পদ্ম রাও, গোপাল গুরু,-এর মতো দলিত বুদ্ধিজীবীরা দলিত সমাজে পিতৃতন্ত্রের বিশয়তা নিয়ে সংবেদনশীল নন। তেমনি ভোলগা,বসন্ত কান্নাভিরান, কল্পনা কান্নাভিরান, ছায়া দাতারদের মতো উচ্চ বর্ণের নারীবাদীদের লেখাতে জাত-পাত-লিঙ্গ সম্পর্ক তেমন প্রতিফলিত হয় না। তিনি দুঃখ করে বলেন যারা দলিত আবার নারী, তাদের কথা এরা এক মুহূর্তের জন্য ভাবেন না ।বাস্তবে কিন্তু "উচ্চবর্ণের নারীদের সামাজিক

অবস্থান কখনোই দলিত নারী বা পুরুষের মতো না"। দলিত গবেষক ও অধ্যাপক গোপাল গুরুর "দলিত নারী ভিন্ন ভাবে কথা বলেন"[২৩] নামের একটি লেখায় নারী আন্দোলনের মধ্যে দলিত নারীদের সর্ব ভারতীয় সংগঠন National Fedaration of Dalit Women-গঠনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন,ভারতে মূলধারার নারীবাদীদের থেকে আলাদা হয়ে এই সংগঠনটি তৈরি হয় গোপাল গুরু যাকে "ভিন্নতার রাজনীতি" বলেছেন সেই জায়গা থেকে। খুব শীঘ্রই বোঝা গেল যে 'মূলধারার নারী আন্দোলনে যতোই সাধারনভাবে সমস্ত নারী মুক্তির কথা বলা হোক, "নারী" বলে একটি সমসত্ত্ব সত্ত্বার কথা বললে তা সব ধরনের নারীর সমস্যার কথা বলছে না। দলিত নারীর জীবনের শোষণ যেহেতু বহুমাত্রিক, অ-দলিত নারীদের থেকে পৃথক, তা আলাদা করে তুলে ধরার দাবি রাখে'।[২৪] দলিত নারীদের প্রতি বৈষম্য হয় কারন তারা নারী(লিঙ্গ ভিত্তিক), তারা দলিত (বর্ণ ভিত্তিক) , এবং দলিত নারী হিসাবে তারা নিজেদের পুরুষদের দ্বারা শোষিত। সেখানে বাংলার দলিত লেখকরা সচেতন মনে আর অসচেতন মনে হোক তারা কখনো দলিত নারীদের জীবন নিয়ে ভাবেননি ।

সম্প্রতি,দলিত নারীদের ভাবনা চিন্তা, তাদের জীবনের দুঃখ, সুযোগ- সুবিধা, অধিকার বঞ্চিত হয়ে সরব হয়েছে 'নীড়' পত্রিকার মাধ্যমে। আর্থিক -অনটনের মধ্যে দিয়ে পত্রিকার পথ চলা শুরু হয়েছিল ১৯৯৪ সালে দলিত ছাত্রী -আবাসিকদের নিজেদের সমস্যার মুখপাত্র হিসাবে। বর্তমানে সমগ্র দলিত নারীদের প্রতি বৈষম্য, নির্যাতন অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরার মুখপাত্র হয়ে উঠেছে।

কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়ালের[২৫] জীবন এবং সংগ্রাম যার মধ্যে দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল সেটা বহুগুণ হয়ে দাড়িয়েছিল শুধু মাত্র তার সামাজিক অবস্থান এবং দলিত পরিবারে জন্ম গ্রহণের কারনে। তিনি বলেন যে লেখার প্রতি তার আগ্রহ বৃদ্ধি পায় ১৯৮৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত একটি আলোচনা সভায় যেখানে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। তার প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা হল " ধরলেই যুদ্ধ সুনিশ্চিত" তার নিজের ভাষায় ইংরেজিতে যার অর্থ হল- *"sure battle if you touch"* এই বইয়ের বেশীরভাগ কবিতা হল-, নারীবাদ, সামাজিক সমস্যা এবং দলিত সমস্যার বিষয়ে-যার মধ্যে অন্যতম হল চুনি কোটালের আত্মহত্যার বিষয়টি। এই মুহূর্তে বিভিন্ন সংখ্যার শীর্ষক হিসাবে ১৮ টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে- *অন্য চোখে দলিত সাহিত্য, দলিত নারীর রচনা, মেয়েদের আম্বেদকর চর্চা ও ইন্দো- অস্ট্রেলিয় দলিত রচনা,*

বাংলাসহ সাঁওতালি, ওঁরাও, কামতাপুরি, রাঢ় ও দখনো ভাষার ছোটো গল্প, ভারতীয় নারীর ছোটো গল্প, দলিত মেয়েদের আত্মজীবনী-সহ অন্যান্য রচনায় দলিত নারীদের জীবনের বৈষম্য,নির্যাতনের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি জল, সুনামি প্রভৃতি নিয়ে সমাজ সচেতনার জন্য বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করেছেন।

লেখিকাদের মধ্যে বিশেষ করে আছেন-ইলা দাস,মঞ্জু বালা, কানন বড়াল, দিপিকা বালা বিশ্বাস ,সুজাতা হালদার, যূথিকা পাণ্ডে, স্মৃতিকনা হাওলাদার,আয়েশা খাতুন,সুনীতি পোদ্দার, লিলি হালদার,নিলিমা সরকার,মনোহর মৌলী বিশ্বাস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। সহ-সম্পাদক হিসাবে স্বস্তি আচার্য তাঁকে একনিষ্ঠ ভাবে সাহায্য করে গেছেন ।

৪.২.মতুয়া নারীদের ধর্মীয় অবস্থা

১৯৯০ সালে মতুয়া মহাসংঘের (০৪/০৭/১৯৯০) মহিলা সংগঠন 'শান্তি সত্য ভামা নির্বাণ কমিটি' গঠন করা হয়। স্বপন কুমার মণ্ডল[২৬] রচিত *'মতুয়া কাণ্ডারী প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর ও নারী জাগরণের পথিকৃৎ বড়মা'* নামক গ্রন্থে এই কমিটির কার্যকলাপ বর্ণনা করেছেন এই ভাবেঃ প্রতি মাসের তৃতীয় বুধবার শ্রীধাম ঠাকুরনগর ঠাকুর বাড়ীতে শান্তি সভা হয়। প্রত্যেকটি শান্তি সভা বেলা ২ ঘটিকা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই শান্তি সত্য ভামা নির্বাণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দলের শতাধিক মহিলা স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে যোগদান করে শ্রী শ্রী ঠাকুরের বন্দনা, স্তব-স্তুতি, শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত ও শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত পাঠ ও পূজা পার্বণ ও হরিনাম সংকীর্তন করেন। হরিসভা বাড়ীর কূলবধূরা বরন ডালা সাজিয়ে ধূপ,দ্বীপ, পঞ্চ প্রদীপ জ্বালিয়ে বাড়ীর সিংহ দরজায় কাপড় বিছিয়ে বাড়ীর সদরে নিয়ে যাওয়া হয়। ডঙ্কা কীর্তন চলতে থাকে। বছরের ৫২ সপ্তাহের প্রতি বুধবারে এই মহিলা দল নিয়মিত ভাবে মহোৎসব করে আসছে।

বড়মা বীণাপাণি দেবী এই সংগঠনের নামকরণ করেন। তিনি, বাসন্তী বালা ঠাকুর কে দলনেত্রী, শ্রীমতী কমলিনী বিশ্বাসকে সভানেত্রী এবং কাজল লতা কাঞ্জিলাল কে সম্পাদিকা হিসাবে না প্রস্তাব করেন। সভায় সকলে বড়মার এই প্রস্তাব সমর্থন করেন'।

মতুয়া মহা সংঘের শান্তি সত্যভামা নির্বাণ কমিটির কার্যাবলী সম্পর্কে যেটা জানতে পারি সেটা হল এই মহিলা সংগঠনটি ধর্মীয় ভাবে হরি চাঁদ ঠাকুর, গুরু চাঁদ ঠাকুর, প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর এবং

বড়মা বীণাপাণির দেবীর নাম সংকীর্তন করে।আর্থ- সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে মহিলা সংগঠনের পৃথক ভাবে কোনো কার্যকলাপ নেই।

মহামায়া গোলদার[২৭] জানিয়েছেন, কাশীপুর অঞ্চলের মতুয়া ধর্মের প্রভাব বেশী। দেশভাগের সময় এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় আসা মতুয়া ধর্মের লোকজন এই অঞ্চলে বসবাস করে। ফলে আমার জন্ম সূত্রে আমরা সবাই ভারতীয়। বিয়ের পর এই অঞ্চলের সবার মতো আমিও মতুয়া ধর্মানুষ্ঠানে যাই, হরিচাঁদ -গুরুচাঁদ নাম সংকীর্তন করি। স্কুল মাঠ প্রাঙ্গনে একটা হরিগুরচাঁদ মন্দির আছে আমরা এই উত্তর পাড়ার মহিলারা সেখানে প্রতি মাসে একবার গিয়ে নাম সংকীর্তন করি।বারুণীর মেলাতে ও গিয়েছি, লক্ষ লক্ষ লোক হয়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে এই ধর্ম কোন ভেদাভেদ করেনা, তবে মহিলারা একটা বয়সের পর সবাই ধর্মকর্ম করে সেই হিসাবে আমিও করি।

রমেন্দ্র নাথ বিশ্বাস[২৮] জানিয়েছেন, কুমড়া অঞ্চলে প্রথম বড় ধরনের মতুয়াদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু হয় ২০১৬ সালে।২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের তিন দিন (২,৩ ও ৪ তারিখ) প্রথম এই অঞ্চলের মতুয়া মহাসঙ্ঘের তত্ত্বধানে হরিগুরুচাঁদ নাম সংকীর্তন, হরি যাত্রা, মতুয়া দলপতিদের বরণ, প্রভৃতি করা হয়।এই বছর প্রায় ৩০,০০০ হাজার লোক তিন ধরে খিচুড়ি, ডাল ভাত খেয়েছে। ঠাকুর বাড়ী থেকে মমতা বালা ঠাকুর, শান্তনু ঠাকুর এবং সাংগাঠনিক সম্পাদক সুকেশ চৌধুরী ও মতুয়া ধর্মের অনেক সাধু- গোঁসাই উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, মহিলাদের কাজ প্রসঙ্গে বলতের তিনি জানান, মহিলারা প্রত্যেক দলপতিদের বরণ করেছিলেন, তারা পূজা অর্চনা,রান্না এবং সবাইকে খাওয়ানোর দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু কাশীপুর আঞ্চলিক মতুয়া মহাসঙ্ঘের হরি ঠাকুরের বানী ‘নারী পুরুষ সবাই সমান’ এটা মনে করিয়ে সাক্ষাৎদাতাকে জিজ্ঞেস করা হয়, সাংগঠনিক দায়িত্বে কোন মহিলার নাম না থাকার কারন কি, তিনি জানান, মহিলারা সময় দিতে পারবেনা, বাড়ীর রান্নার কাজ, তারপর বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে গিয়ে অর্থ, চাল , ডাল ,তেল সংগ্রহ করতে হয়, ফলে যেটা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আসলে মতুয়া পুরুষদের মনে এখনো নারীদের শুধু মাত্র ঘরের কাজ , আর ধর্মীয় কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখতে চায়। তবে কালীপূজার সময় এই মতুয়া নারীদের প্রান চঞ্চল হয়ে ওঠে, কারন নাংলা বিলে তারাই যে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করে।

এখানকার প্রায় সমস্ত মানুষ নিপীড়িত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত মতুয়া ধর্মের অনুরাগী। বেশীর ভাগ মানুষ বাংলাদেশ থেকে এসেছে। ফলে এই পুরনো প্রজন্মের মানুষ গুলির শৈশব বাংলাদেশে কেটেছে। তার পর এপারে চলে আশা, দেশ ভাগ প্রভৃতি কারন সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে একটি অন্তরায় রয়েছে। বিলের জলে নৌকো বেয়ে মাছ ধরা, গাছে উঠে লুকোচুরি খেলা, সবই তখন স্মৃতি। সেই স্মৃতি হয়তো ঝাপসা হয়েই যেতো। কিন্তু বছরে একবার নাংলার বিলে মহিলাদের নৌকো বাইচ প্রতিযোগিতা মনে করিয়ে দেয় পুরনো সেই দিনের কথা। কালী পূজার পরে মহিলাদের এই প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে যা দেখতে হাজার মানুষের ভিড় হয়। এই অঞ্চলে মহিলা নৌকা বাইচ শুরু করেন শ্রী রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ২০০৩ সালে । বর্তমানে বনগাঁর পানচিতা ঝিলে মহিলাদের নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের নমঃশূদ্র বসতি অঞ্চল গোপালগঞ্জের সাতপাড় ,জলিপাড় এই অঞ্চলে মধুমতি নদীতে দুর্গা পূজার দশমীতে পুরুষদের নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা হত, সেখানে কখনো মহিলারা অংশগ্রহন করতে পারত না, তাদের সেই স্বাধীনতা ছিল না, ওপার বাংলা থেকে আসার পর নিজেরা অনেকেই আর্থিক স্বাধীনতার পাশাপাশি , সংখ্যালঘু মহিলা হিসাবে যে আতঙ্ক কাজ করতো সেটা এখানে নেই, তাছাড়া সব থেকে বড় বিষয় স্বামী বাড়ীর বাইরে থাকায় ছোটোবেলার স্মৃতিকে নৌকা বাইচের মাধ্যমে ধরে রেখেছে।

৪.৩.পশ্চিমবঙ্গে মতুয়া নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

১৯৯৩ সাল থেকে পঞ্চায়েতের ন্যূনতম আসনে নারীরা প্রবেশাধিকার লাভ করার সাথে সাথে গ্রামাঞ্চলে নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচিও গ্রহন করা হয়েছে।কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলির রূপায়িত করার ব্যাপারে পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ‘স্বর্ণজয়ন্তী স্বরোজগার যোজনা’র(এস.

জি.এস.ওয়াই) মাধ্যমে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের নরনারীকে স্থায়ী ভাবে কিছু উৎপাদনের মাধ্যমে স্থায়ী আর্থিক স্বনির্ভরতার সাথে এগিয়ে দেবার প্রচেষ্টাও চলছে।পূর্বের সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের (আই.আর.ডি.পি.)পরিবর্তরূপে এস.জি.এস.ওয়াই কর্মসূচিটি মহিলাদের পক্ষে বিশেষ করে উপযোগী বলে মনে করা হয়।[২৯] এই কর্মসূচির সাথে কোথাও কোথাও আবার পূর্বেকার 'ডোকরা' (Development of Women and Children-DWCRA) কর্মসূচির সমন্বয়ে গ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের নারীদের ১০-১৫ জনের ছোটো ছোটো দল তৈরি করে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে দল ভিত্তিক কোন বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রি করতে পঞ্চায়েত থেকে উৎসাহ করা হচ্ছে।[৩০] কাশীপুর গ্রামের সমীক্ষা অঞ্চলে বেশীর ভাগ মহিলারা বিভিন্ন স্বনির্ভর প্রকল্পের সাথে যুক্ত। যেমন রবীন্দ্রনাথ স্বনির্ভর গোষ্ঠী, দেবেন্দ্রনাথ স্বনির্ভর গোষ্ঠী, দিশা স্বনির্ভর গোষ্ঠী, আলো স্বনির্ভর গোষ্ঠী, মা মাটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী। মোট ১০০/৭১+৭২ এই সংসদের আওতায় ৫০ টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। এই সংসদের চেয়ারম্যান স্বরমা বালা জানান যে প্রত্যেক মাসে ৫০-৩০০ পর্যন্ত টাকা জমা দিতে পারে। এবং এই সমিতির সংখ্যা ১০ জন করে হয়। কুমড়ো গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ১% হারে ৫০০০-২৫০০০০ টাকা পর্যন্ত লোণ দেয় প্রত্যেক স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মানুষ ২% হারে লোণ নিতে পারে। সমিতির বাইরের লোকের কাছে সুদ খাটাতে পারে। এবং এই লভ্যংশ প্রত্যেক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যের মধ্যে সমান হারে ভাগ হয়।

এছাড়া উৎপাদন মূলক কাজে বিশেষ করে কৃষিতে তপশিলি নারীর ভূমিকা বোঝা যায় ২০০১ সালের প্রদত্ত একটা সারণি থেকে:[৩১]

	চাষী		কৃষি শ্রমিক	
পশ্চিমবঙ্গ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
	১২.৯	২০.৯	৪৫.৭	৩৫.০০

সমীক্ষাকৃত কাশীপুর গ্রামে নারীদের কাজের ভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায়,

সাক্ষাৎদাতার পরিবারের মাসিক আয় :

টাকার পরিমান	মহিলা	পুরুষ
১০০০-৩০০০	২৫	৯
৩০০১-৫০০০	২	১৩
৫০০১-৭০০০	৩	৬
৭০০১-৯০০০	১	২
৯০০১-১১০০০		২
১১০০১-১৩০০০		২
১৩০০১-১৫০০০		১
১৫০০১-১৭০০০		১
১৭০০১-১৯০০০		৩
>১৯০০১		৩

বাড়ীর কাজ সামলে অর্থাৎ রান্না, ঘর-বাড়ী পরিষ্কার ,ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে, বাজার করে, বেশীর ভাগ মহিলা বিড়ির কাজ, মাদুলির কাজ করে। ফলে তাদের ক্ষেত্রে আয় ১০০০-৩০০০ এর বেশি করা সম্ভব নয়, ১০০০ বিড়ি তে ১২০-১৪০ টাকার মতো পায় এবং মাদুলির কাজ যারা করে তারা ও বাড়ীর কাজ করে মাদুলি তৈরি করে দিনে ৪০-৫০ টাকার মতো আয় করে ।পুরুষরা বাড়ীর বাইরে বিশেষ করে রাজমিস্ত্রি,আংটি বিক্রি করতে, কোলকাতার কোনো দোকানে কাজ করে ফলে তাদের নিজের খরচ রেখে বাড়ীতে যে নূন্যতম টাকা পাঠায় তাতে সংসার চালাতে মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়।

সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুযায়ী মহিলাদের ৩৯.৪৮%(১৫ জন) বিড়ি শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত। বর্তমানে যারা এক হাজার বিড়ি প্রতি ১২০-১৪০ টাকা পায়। পূর্বে এই বিড়ি শ্রমিক এক হাজার বিড়ি থেকে ১০ টাকা আয় করত। সাক্ষাৎকারে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী বিড়ি শ্রমিক কার্ড ছাড়াও বহু বিড়ি শ্রমিক রয়েছে। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তমানে মোট ৩০০০ বিড়ি শ্রমিক কার্ড হোল্ডার আছে। পরিবারের মেয়েরা পড়াশোনার পাশাপাশি বিড়ি বাঁধার কাজ করে।

এছাড়া মাদুলির কাজ করে ৮ জন(২১.০৫%)। দিন প্রতি ৪০-৫০ টাকা আয় করেন।

বিড়ি বাঁধার কাজ আর মাদুলির কাজ করার ফলে পরবর্তীতে অনেক মহিলা চোখে কম দেখে ।

বাড়ীর কাজ করে ৮ জন(২১.০৫%)। এই মহিলাদের পুরুষরা সরকারি চাকরী করে এবং স্বচ্ছল পরিবারের মত জীবন-যাপন করে।

অন্য হাতের কাজ হিসেবে সেলাই মেশিন, শাক-সবজি,ও শাড়ি বিক্রির কাজের সাথে যুক্ত। এছাড়া শহরে গৃহ-পরিচারিকার কাজের সাথে যুক্ত। তাঁদের মোট সংখ্যা হল ৭জন (১৮.৪২%। বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন উক্ত সমিক্ষাকৃত পরিবারে গৃহ পালিত পশুর পরিমান নেই।

৪.৪ মতুয়া নারীদের রাজনৈতিক অবস্থান

১৯৯২ সালের ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনীর পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েতি আইনে কিছু সংশোধনীর মাধ্যমে এই রাজ্যেও পঞ্চায়েতের প্রত্যেক স্তরে নারীর জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন(তপশিলী জাতি/ উপজাতি নারী সহ) সংরক্ষিত রাখার নীতি গ্রহন করেন। ১৯৯৩-২০০৮ সালের নির্বাচনে সারা পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে তপশিলী জাতি ও উপজাতি শ্রেণীর সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধি সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল[৩২] :

বছর	গ্রাম পঞ্চায়েত			পঞ্চায়েত সমিতি			জেলা পরিষদ		
	মোট আসন	নির্বাচিত মহিলা	শতাংশ	মোট আসন	নির্বাচিত মহিলা	শতাংশ	মোট আসন	নির্বাচিত মহিলা	শতাংশ
১৯৯৩	৬১,১০১	২১,৪৮৯	৩৫.২২	৯,৪৫৩	৩,১৮২	৩৩.৬৬	৬৫৬	২২৪	৩৪.১৪
১৯৯৮	৪৭,৪৩৪	১৭,৫৩৭	৩৫.৬১	৮,৫৬২	২৯১৩	৩৫.০২	৭১৬	২৪৩	৩৩.৯৪
২০০৩	৪৯,১৪০	১৭,৪০৯	৩৫.৪২	৮,৫০০	২,৯৩০	৩৪.৪৭	৭১৩	২৪৫	২৪.৩৬
২০০৮	৪১,৮০৯	১৬,২৭৬	৩৮.৯২	৮,৮৫৫	৩,২১৩	৩৬.২৮	৭৫৫	২৭২	৩৬.০২

স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক ভাবে তপশিলী জাতি সম্প্রদায়ের হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের মতুয়া ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নারীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা পেয়েছিল। এক্ষেত্রে অসীম মুখোপাধ্যায় 'পঞ্চায়েত প্রাঙ্গন'[৩৩] গ্রন্থে বলেছেন, জনমানসে এমন একটা ধারণা রয়ে গেছে যে, পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্যারা কাজ বোঝেন না, কাজ করা তো দুরের কথা। তাদের পঞ্চায়েতে আনা হয়েছে-মহিলা ভোট ব্যাঙ্ক ঠিক রাখার জন্য। দ্বিতীয়ত, নারী আন্দোলনকারীদের ক্ষতে প্রলেপ দেয়ার জন্য। তৃতীয়ত, ভারতীয় গণতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান ফাঁকফোকর বোঝাবার জন্য। চতুর্থত, দেশজুড়ে লিঙ্গ-বৈষম্য ও মহিলাদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান হিংসাকে আড়াল করার জন্য। এই প্রশ্ন গুলো তারাই তুলেছেন যারা নিজেদের মহিলাদেরকে ঘরের মধ্যে দেখতে বেশী পছন্দ করেন। এখনো সমাজ ব্যবস্থায় পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বেরোতে পারে নি যারা তারাই এই ধরনের কথা বলছেন'।তপশীলি নারীদের ক্ষমতায়নের পথে বর্তমান সময়ের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাই বাধা

হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কারন হিসাবে রত্না বিশ্বাস'[৩৪] জানিয়েছেন, আমি পূর্বে হাবড়া ব্লক-১ এর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলাম, কাজের অভিজ্ঞতা আছে। পঞ্চায়েতের সমিতির কাজে নানা পুরুষের সাথে কথা বার্তা বলতে হয়, ফলে পুরুষদের সাথে জড়িয়ে আমাকে নিয়ে নানা ধরনের কথা গ্রাম অঞ্চলে বলা শুরু হয়। আমার স্বামী প্রথমদিকে রাজনীতিতে আসতে নিষেধ করেছিল, নানা বাধা প্রতিরোধ করে আজ ১৫ বছরের মতো রাজনীতিতে আসি। এখন আর কেউ কিছু বলে না। তবে কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষদের একঘেয়েমি মানসিকতা রয়েছে সেটা বোঝা যায়, 'মহিলারা কি বুঝবে, ঘরে যাও , তুমি শুধু স্বাক্ষর করে দিও, আমরা সব সামলে নেব। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ফলে আমার মতো মহিলারা রাজনীতিতে আসতে পেরেছে, না হলে সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষদের যা আধিপত্য তাতে আমাদের ঘরের বাইরে বেরোনো কঠিন হয়ে যেতো। প্রত্যেক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত মহিলারা প্রত্যেক মাসে একটি করে সভা করে, সেখানে আর্থিক সঞ্চয় নিয়ে যেমন আলোচনা তেমনি রাজনীতি নিয়ে আলোচনাও করা হয়।রাজনীতিকগন তাদেরকে দলের স্বার্থে বাড়ী বাড়ী গিয়ে রাজনৈতিক প্রচার করার সময় মহিলাদের শাড়ি দেওয়ার প্রচলন শুরু করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাঁদেরকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষক করে তোলে। এক্ষেত্রে প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস জানান "আগে কেবল মাত্র পরিবারের পুরুষদের সাথে কথা বলে রাজি করে পরিবারের সমস্ত ভোট পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমানে আর্থিক দিক দিয়ে পরিবারকে সমর্থন দেওয়ায় মহিলাদের গুরুত্ব বেড়েছে"। ২০১০ সালে বীণাপানির দেবীর নেতৃত্বে মহাজাতি সদনে 'চাই নাগরিকত্ব চাই, চাই জাতিপত্র'- র দাবীর অবস্থানে রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি বলে দেয় ভোট রাজনীতিতে তারা কতো গুরুত্বপূর্ণ।[৩৫] ভারতীয় ভোটের রাজনীতিতে জাতি সম্প্রদায় কতোটা গুরুত্ব রয়েছে সেটা সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষক গবেষণা করেছেন। বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও তাঁর ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়। 'জাতিভেদের বিরুদ্ধে একটি কথা না বলেও শ্রেণী চেতনা দিয়ে সাম্য-সন্ধান বামপন্থীদের যে এক ব্যর্থ প্রয়াস তা একজন সাধারণ মানুষের ও আজ বোধের অতীত নেই'।[৩৬] ভারতীয় রাজনীতিতে তথা রাজ্য রাজনীতিতে মতুয়ারা ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর কাছে গুরুত্ব পেলে ও বাংলাদেশের রাজনীতিতে মতুয়াদের স্থানীয় ক্ষেত্রে ছাড়া সংসদীয় রাজনীতিতে বর্তমান সময়েও উপস্থিতি লক্ষ্য

করা যায় না। ফলে দুই দেশে রাজনীতিতে দুই রকম অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। একদিকে সংখ্যালঘু হিসাবে তেমন গুরুত্ব নেই, আবার অন্যদিকে জাতি সম্প্রদায় হিসাবে এবং ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে তাঁদের গুরুত্ব ভোট রাজনীতিতে লক্ষ্য করা যায়।

৪.৫.শিক্ষাগত অবস্থা

জাতি বর্ণ ভিত্তিক ভারতীয় সমাজে গড় শিক্ষার হার এত কম হওয়ার জন্য আরও যে কারন গুলি দায়ী, তার মধ্যে অন্যতম হল একদিকে উচ্চ ও মধ্য বর্ণহিন্দু এবং অপরদিকে তপশিলি জাতি উপজাতি হিসাবে যারা বর্তমান সময়ে পরিচিত তাদেরর প্রতি বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য। তার ফল স্বরূপ তপশিলি জাতি হিসাবে মতুয়াদের মধ্যেও শিক্ষার হার খুব কম ছিল বর্তমান সময়ে সরকারী সুযোগসুবিধা পাওয়ায় তাদের মধ্যে ও শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।তপশিলি জাতি নারীদের শিক্ষার হার ছিল[৩৭]:

	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
তপশিলি জাতি	৬.৪৪	১০.৮৩	২৩.৭৬	৪৬.৯	৬১.২৩

সমীক্ষা অঞ্চলের সাক্ষাৎদাতাদের শিক্ষার হার ছিল:

সাক্ষাৎদাতার শিক্ষার হারঃ

শিক্ষা	পুরুষ	মহিলা
নিরক্ষর		৪
*ন্যূনতম স্বাক্ষর	১	৭
* চতুর্থ শ্রেনি পাশ	২	৮
অষ্টম শ্রেনি পাশ	১	৭
মাধ্যমিক	১	২
উচ্চ মাধ্যমিক		২
স্নাতক		
স্নাতকোত্তর	১	২

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে,নিরক্ষর মহিলা সাক্ষাৎকারীর সংখ্যা ৪ জন। **নুন্য তম স্বাক্ষর কারীর সংখ্যা ৭ জন এবং চতুর্থ শ্রেনি বা সপ্তম শ্রেণি অব্ধি পড়া মহিলার সংখ্যা ৮ জন। এই সংখ্যার বেশীর ভাগ দ্বিতীয় প্রজন্মের যারা বাংলাদেশ থেকে আসার সময় নূন্যতম পড়াশোনা করে এসেছে। স্নাতকোত্তর পাস করা মহিলা দের একজন বর্তমানে বি.এড পড়ছেন অন্য জন বাড়ীর কাজে নিযুক্ত ।

বর্তমান সময়ে পরিবারের সচেতনতার জন্য এবং সরকারি সাহায্যের জন্য মেয়েদের শিক্ষার হার আগের তুলনায় বেড়েছে, অনেক সাক্ষাৎকারী মনে করেন যে, সাইকেল পাওয়া থেকে শুরু করে কন্যাশ্রী টাকা পাওয়া অব্ধি মেয়ে পড়াশোনা করতেই পারে তাতে যেমন বিয়ের সময় খরচটা বেশি করতে হয় না তেমনি বাড়ীতে থাকলে বিভিন্ন হাতের কাজে সাহায্য করতে পারে।

৪.৬. মতুয়া নারীদের সামাজিক অবস্থা

সামাজিক ক্ষেত্রে মতুয়া নারীদের অবস্থান জানা যায় সন্ধ্যা বিশ্বাসের 'আত্মকথা'[৩৮] থেকে। তিনি দেখিয়েছেন যে তার মা কখনো পড়াশুনা করেন নি , দুর্গা পূজা এবং ভোটের সময় ছাড়া তিনি কখনো বাড়ীর বাইরে বের হন নি। একান্নবর্তী পরিবারে তার বাবা কিভাবে মাকে মারধোর করতো,শুধুমাত্র মেয়ে জন্ম হওয়ার জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করেছিলো। ছয় বোনদের নিয়ে তার মায়ের অদম্য ইচ্ছেতে তারা পড়াশুনা করে চাকরী করতে পেরেছে। লেখিকার বিয়ের পরও তার মায়ের মতো তাকেও স্বামীর নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। লেখিকার আত্মকথনের সাথে মিল পাওয়া যায় সম্প্রতি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস মীনা কাণ্ডাস্বামীর[৩৯] "*When I hit you or, portrait of the writer as a young wife*" লেখাতে। কাহিনী এক এম.এ পাশ মহিলার। ভালবেসে বিয়ে করেন চল্লিশ বছর বয়সী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সক্রিয় কমিউনিস্টকে।তিনি একজন তামিল মেয়ে কিন্তু বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে কর্ণাটকে চলে আসতে হয়। তিনি লেখিকা, তাই তার কাছে " *আউটলুক"* পত্রিকা থেকে লেখা দেওয়ার জন্য ই-মেলে চিঠি আসে। বাড়ীতে ইন্টারনেটের সুবিধে নেই কারন ডঙ্গলটি স্বামী পকেতে করে নিয়ে যায় রোজ কর্মস্থলে ।এ দিকে সুযোগ পেলে ফোনে লেখা লিখতে থাকে । একদিন স্বামী স্নানে গেলে সে লুকিয়ে স্বামীর পকেট

থেকে ডঙ্গল নিয়ে কোন ভাবে এডিট না করে লেখা পাঠিয়ে দেয়। এ ভাবে ক্রমাগত একটি শিক্ষিত স্বাধীনমনা লেখক ও আধুনিক ভারতীয় মেয়েকে প্রাচীন ভারতীয় বিবাহের নিয়মনীতি ও বন্ধনে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করা হতে থাকে, তবুও মেয়েটি তার লেখা চালিয়ে যায়। আনুগত্যের কোন অভাব হলেই জুটত মার ও অত্যাচার। রাত্রে, বিছানায় যাওয়া ও একজন রাগী ও দমনমনস্ক শিক্ষকের সঙ্গে যন্ত্রের মতো সহবাস করতো দিনের পর দিন। মেয়েটির ফোন কেরে নেওয়া হয় এবং বাধ্য করা হয় তার যাবতীয় ই-মেল ডিলিট করতে ও ফেসবুক থেকে অ্যাকাউন্ট তুলে নিতে । এই রকম দমবন্ধ পরিস্থিতি চলে চার মাস। এক জায়গায় সে বলছে, দীর্ঘ দু-সপ্তাহ ঘরে বন্ধ থাকার পরে, পার্টির একটা প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হওয়ার জন্যে সে একটি হ্যান্ডব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে নেয়, চোখে কাজল পড়ে এবং হাল্কা লিপস্টিক লাগায়। তাতে তার স্বামী বলে যে, পার্টির শ্রমজীবী মহিলারা তাঁকে বেশ্যা বা পেটি বুর্জোয়া মহিলা বলে ভুল করতে পারে। সে প্রশ্ন রাখে, একজন বেশ্যা ও কি শ্রমজীবী নয় ?

মীনা কাণ্ডাস্বামীর *"When I hit you or*"- বইটি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের চতুর্থ প্রজন্মের একজন দলিত লেখকের আত্মজীবনী ,আগের দলিত মহিলাদের আত্মকথা ও লেখালেখির ধরনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কিন্তু শিক্ষিত দলিত মেয়েটিও লড়াই করছে পিতৃতান্ত্রিক অধিকার বোধের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য । কিন্তু আত্মকথনের লেখিকা সেই নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারেন নি ফলত তাঁকে নিয়মিত বাড়ী থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি শুনতে হয় । আবার সন্তানের মায়ায় জড়িয়ে আছেন বলেন বেরোতে পারেন না সেখানে মীনা কাণ্ডাস্বামী বিচ্ছেদ নিয়ে নিজেকে লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন । একুশ শতকে ও নারী নির্যাতন বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হয়ে আসছে। একই রকম কথা শোনা যায়, সুপ্রিয়া ব্যাপারীর[৪০] কথায়। তিনি জানিয়েছেন, এই অঞ্চলে প্রায়ই পরিবারে নারীকে নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হতে হয়, এমন কি মারধরের ও ঘটনা ঘটে, সালিশি হয় সমাধানের জন্য। বিশেষ করে হাবড়া থানায় এই গ্রামের নারী নির্যাতনের বিভিন্ন রেকর্ড রয়েছে। তিনি আরও বলেন, কিছুদিন আগে হীরা বাড়ীতে(নাম বলতে অনিচ্ছুক) এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। এই দম্পতি দুজনেই শিক্ষিত, স্বামী চাকরি করেন, স্ত্রী হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। নানা ধরনের সাংসারিক খুঁটিনাটি নিয়ে স্ত্রীকে তিনি মারধোর করতেন।ডাক্তার হওয়ার কারনে তার কাছে বিভিন্ন বয়সী পুরুষ কথা বলতে আসে।ফলে

পাশের বাড়ীর একজন পুরুষদের সাথে অনেক সময় ধরে কথা বলছিলেন তার স্বামী সেটা দেখে তাকে বাড়ীতে ডেকে এমন মারধোর করেছিলেন যে মহিলা বাধ্য হয়ে বাপের বাড়ী চলে যান এবং স্বামীর নামে হাবড়া থানায় নারী নির্যাতনের কেস করেছিলেন, ফলে পুলিশ অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে থানা ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মিটিং করে সমাধান করা হয়েছিল। সবাই যদিও এই ব্যাপারে উক্ত মহিলার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। ফলে যখনই পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারী কথা বলতে গিয়েছে তখনই তার চরিত্র, হাটা চলা, কথা বার্তা নিয়ে সমাজ দোষ দেওয়া শুরু করে।

বর্তমানে বাংলায় দলিতদের আর্থ –সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থান, তাদের পিছিয়ে পড়ার কারন, নিয়ে বিভিন্ন দলিত লেখক গবেষণা করছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মনোহর মৌলী বিশ্বাস[৪১]। তিনি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, বাংলায় বর্তমান সময়ে দলিতরাই নিজেদের ইতিহাস লেখার কাজে এগিয়ে আসছে। দলিত মহিলারাও তাদের লেখার মাধ্যমে তাদের অস্থিত্বের কথা তুলে ধরছেন। পূর্বে সুলোচনা (১৭৭৬সালে ময়মনসিংহ জেলার ঠাকুরকনা গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন, তিনি নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মহিলা ছিলেন, যাদের চণ্ডাল বলা হতো। তার কবিতার বইয়ের নাম *শ্রী শ্রী গোপিনী কীর্তন*) এবং রানী ধোপানী (বাঁকুড়া জেলার শালতোরা গ্রামে জন্মগ্রহন করেন, তিনি বৈষ্ণব কবিতা লেখেন) দলিত মহিলা হয়েও তাদের লেখনি থেমে থাকে নি । তিনি কথা প্রসঙ্গে, Gayatri chakrovorty spivak[৪২] এর "*Can the Subaltern Speak?*" এর কথা তুলে তিনি বলেছেন যে,হ্যা, তারা কথা বলতে পারে এবং সেটা তাদের নিজের ভাষায়, তাদের ভাষা কিছু লোকই বুঝতে পারে। অর্থাৎ যারা দলিতরাই দলিতদের ভাষা বুঝতে পারে । মতুয়া সম্প্রদায় শান্তি সত্যভামা নির্বাণ কমিটির মাধ্যমে নারীদের পরিবারে তথা সমাজে সমান অধিকার রয়েছে সেটা তুলে ধরছে । এবং বর্তমান কালে দলিত লেখিকা হিসাবে কল্যাণী চাঁড়াল, ইলা দাস,মঞ্জু বালা, কানন বড়াল প্রমুখের কথা উল্লেখ করলেও তার লেখা "দলিত সাহিত্যের রূপরেখা" বা অন্যান্য প্রবন্ধে কখনোই দলিত নারীদের কথা ফুটে ওঠে নি।

নীড় পত্রিকাতে লেখিকাদের মধ্যে বেশীর ভাগই দলিত মহিলারা যারা তাদের আত্মকথার মাধ্যমে সমাজে কীভাবে তারা লাঞ্ছিত-নির্যাতিত -অপমানিত হয়ে বড় হয়ে উঠেছেন সেটাই তুলে ধরেছেন।দলিত নারীদের লেখা গুলি সব ধরনের শোষণ ও নিপীড়নের ব্যাপারে খুব স্পষ্টভাবে

তুলে ধরে ,যা তাদের সমাজের ভিতরে এবং বাইরে সহ্য করতে হয়। দলিত পুরুষ লেখকদের লেখায় কখনোই পারিবারিক সহিংসতা কথা লেখা হয় না।

সাক্ষাৎকারে কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল[৪৩] জানিয়েছেন, দলিত মহিলাদের মধ্যে শুধুমাত্র নমঃশূদ্র মহিলাদের কথা উঠে আসছে। সেই ভাবে বাউলি,চর্মকার, বাল্মিকি- নারীদের কথা উঠে আসছে না । এখনো তাদের ইতিহাস, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি-সাহিত্য নিজেদের লেখায় উঠে আসে নি, ফলে কি ভাবে সেখানে নারীবাদী ভাবনা তাদের মধ্যে আসবে? দলিত পুরুষদের লেখাতেও সেই ভাবে কখনো নারীদের তুলে ধরা হয় না কারন আমাদের সমাজে দৃঢ় ভাবে পিতৃতান্ত্রিক রয়েছে, দলিত সমাজ ও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু "বাংলা দলিত সাহিত্য" দলিত নারীদের জন্য একটা মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছে যার ফলে গুটিকয়েক দলিত নারী হলেও তাদের লেখার মাধ্যমে একক ভাবে হলে ও দলিত নারীদের কথা বলতে পারছি এবং লিখতে পারছি। "চুনি কোটাল স্মারক বক্তৃতা"-তে শুধুমাত্র দলিত নারীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। তার কথায় আরও দলিত নারীদের লেখা নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকা উঠে আসুক যেখানে গণমাধ্যম বা মিডিয়া যেখানে দলিত নারীদের কোন স্থান দেয় না সেখানে নিজেরদের প্রচেষ্টায়ই একমাত্র সম্বল ।

দলিত সাহিত্য কীভাবে তৈরি হবে যদি না এই কথাগুলো কখনো উঠে না আসে, যেদিন মুচির মেয়ে, ঋষির মেয়ে,মেথরের মেয়ে জাতের জন্য মাথা নিচু না করে বাচতে পারবে সেইদিন সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসবে ,তখন দলিত নারীরা তাদের সাহিত্য রচনা করবে ।

৪.৭.বাংলাদেশের মতুয়া নারীদের ধর্মীয় অবস্থা

বাংলাদেশের মতুয়া নারীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলতে বারুণী মেলা, কালী পূজা, দুর্গা পূজা প্রধানত বোঝায়। এই গুলো ছাড়াও মতুয়াদের বারো মাসে তের পার্বণ লক্ষ্য করা যায়। সেই গুলো হল বাস্তু পূজা, হ্যাচড়া পূজা, শিবের ব্রত, পৌষ সংক্রান্তি প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়।এক্ষেত্রে সমীক্ষা গ্রামের সন্ধ্যা রানী বিশ্বাস[৪৪] জানিয়েছেন, ওড়াকান্দি বারুণী মেলার সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমাদের গ্রামে মতুয়া ভক্তরা আসে, আমরা তাদের খাওয়া, বিশ্রামের ব্যবস্থা করি, হাজার হাজার লোক গ্রামের রাস্তা দিয়ে মতুয়া দল নিয়ে যায়। পাশের বাড়ীর মালতী বিশ্বাসের বাড়ীতে পূর্বে ২০০-৩০০ মতুয়া ভক্ত থাকতো, ২-৩ দিন থেকে তারা চলে যেতো। সাক্ষাৎদাতা নিজের

বাড়ীতে প্রতি মাসে হরি সভা অনুষ্ঠান করেন, যেখানে মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের সংখ্যা কম। বেশীর ভাগ মহিলা অর্ধেক বয়সী। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম মৃত্যু দিন একই দিনে হওয়ায় তাদের পরিবারের এমনকি গ্রামের বেশীর ভাগ লোকজন বুধবার নিরামিষ খান। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, সিঙ্গা গ্রামে গুরু চাঁদ ঠাকুর এসেছিলেন, ফলে তার একটা গুরুত্ব রয়েছে।এই গ্রামের বিবরন পাওয়া যায় শ্রী বিচরন পাগল রচিত 'শ্রী শ্রী হরিগুরুচাঁদ চরিত্র-সুধা' [৪৫] গ্রন্থে,

'সিঙ্গা নিবাসীয় ভক্ত বনমালী হয়।
প্রভুকে লইতে গৃহে করিল আশয়।।
...এমত হেরিয়ে পরে প্রভু দয়াময়।
সিঙ্গা গ্রামে যাইবারে স্বীকৃত হয়।।
...তারিণীর গৃহে ছিল যতেক রমণী।
প্রফুল্লিতা হয়ে সবে করে হুলুধ্বনি' ।।

তাই উক্ত সমীক্ষা গ্রামে মতুয়া ধর্মের বিভিন্ন নিয়মনীতি কঠোর ভাবে মেনে চলা হতো।

অন্য সাক্ষাৎদাতা, বকুল রানী বিশ্বাস[৪৬] জানিয়েছেন, আমার অনেক বয়স হয়েছে ফলে আমি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাই, বাড়ীতে মতুয়া ধর্মীয় রীতিনীতি সঠিক রাখার দায়িত্ব ও আমার। বৌমা বাড়ীর সকল কাজ দেখা শোনা করে, ছেলে মাঠে কাজ করে। বারুণীর মেলা ছাড়াও এই গ্রামের কুমারী মেয়েরা হ্যাচড়া ঠাকুরের পূজা করে যাতে আমাদের পরিবারের কারো ঘা-প্যাচড়া না হয়। গ্রামীণ হ্যাচড়া ঠাকুরের ছড়া এই রকম-

'হ্যাচড়া ঠাকুর চাইছে ফুল, সাজি দেব তারে
সাজির ভিতর হ্যাংলা কাঁটা, ব্যাংলা কাঁটা,
...। অযাত্রার বন্নির ফুল ঝাকি ঝাঁকি পড়ে।

.....

'হ্যাচড়া ঠাকুর ঠাকুর রে তোর প্যাচড়া চুল
তাইতে লাগিয়া গেল বন্নির ফুল...

এই রকম ভাবে দেখা যায় 'হ্যাচড়া ঠাকুর পূজার ছড়া বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। পুষ্প বৈরাগ্য[৪৭] বাংলায় উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের চণ্ডাল নারীদের ধর্মীয় জীবন তুলে ধরেছেন। তারা যেহেতু

অস্পৃশ্য ছিল ফলে তাঁদের সামাজিক আচার পুজা ও আলাদা ছিল। বাস্ত পূজা, হ্যাচড়া পূজা, জল নামানো গান,জাগরনের গান, কুল নামানোর গান, বিয়ের গান প্রভৃতি তুলে ধরেছেন। বর্তমান সময়ে ও দেখা যায় এই পূজা এবং ছড়া গুলো লোক মুখে এখনো টিকে রয়েছে। যদিও অঞ্চল ভেদে ছড়া গুলির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

৪.৮.রাজনৈতিক অবস্থা

"৩০ বছর পর বাংলাদেশে আর কোন 'হিন্দু' থাকবে না"[৪৮]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক আবুল বারকত তার গ্রন্থ বাংলাদেশে 'কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি' নামক এক গবেষণা পত্রে এই তথ্য উঠে এসেছে। তিনি আরও বলেছেন, ১৯৬৪ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৫ দশকে মোট ১ কোটি ১৩ লাখ হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ বাংলাদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। আর প্রতিদিন দেশ ছেড়েছেন ৬৩২ জন হিন্দু।[৪৯] ফলে বাংলাদেশী সংখ্যালঘু বিশেষ করে মতুয়াদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহন করা কতোটা দুরূহ সেটা সহজেই অনুমেয়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, সংসদে ৩৫০ সাংসদের মধ্যে ৫০ জন সাংসদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। সাংবিধানিক ধারা অনুযায়ী ৫০ জন মহিলাদের মধ্যে ২০ জন সরাসরি নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে আসতে পারবেন। ভোটে জিতে আসা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জনগণের কাছে যতো দাবি-দাওয়া থাকে, সংরক্ষিত আসনে জিতে আসা প্রতিনিধিদের কাছে সেই আসা জনসাধারণ করে না। গ্রামীণ ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে, সংরক্ষিত আসন ব্যতিরেকে সাধারণ সদস্যদের জন্য ইউনিয়ন কে ৯ টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করতে হয় এবং সংরক্ষিত আসনে সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একটি ইউনিয়নকে ৩ টি ভাগে বিভক্ত করতে হয়। এই ভাবে উপজেলা পরিষদের মহিলা আসনটি সংরক্ষিত হয়, পাশপাশি প্রত্যেক ইউনিয়নে ৩ টি করে মহিলা সংরক্ষিত আসন থাকে।[৫০] এর ফলে সংখ্যালঘু হিসাবে মতুয়া নারীদের রাজনীতিতে যোগদান করা অসম্ভব হয়ে পরে। তাছাড়া, '২০০১ সালের ১লা অক্টোবর নির্বাচন পরবর্তী সংখ্যা লঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের হামলার পর, তারা সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন, আমরা ভোটের অধিকার চাই না, আমাদের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে নিন।[৫১] ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মতুয়া নারীদের

দেখতে পাওয়া যায়, স্থানীয় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামে বা ইউনিয়ন বোর্ডে নারীদের দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে Bangladesh Minority Rights Forum, Dalit Women Fedaration, South Asia Dalit Forum-Bangladesh Chapter প্রভৃতি সংগঠনগুলি জাতীয় সংসদে দলিত, মতুয়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব-র জন্য বিভিন্ন ধরনের আলোচনা সভার আয়োজন করছেন।[৫২] সমীক্ষা অঞ্চলের শিখা মৌলিক[৫৩] জানিয়েছেন, আমাদের গ্রামে সবাই হিন্দু, আশেপাশে হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল। কিন্তু রাজনীতির কথা আসলে সব মহিলারা কেমন একটা আড়ষ্ট হয়ে যান। এই অঞ্চলে কলেজে পোড়া বেশ কিছু মেয়েও আছে যারা কখনোই কোন ছাত্রছাত্রী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকে না। বিভিন্ন বয়সী পুরুষদের সাথে মিশতে হয় ফলে তারা আর রাজনীতি এড়িয়ে চলে। মধ্য বয়স্ক মহিলারা বিশেষ করে যাদের ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে গেছে তারা ওয়ার্ড চেয়ারম্যান, মেম্বার পদপ্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তবে সেইটুকুই সীমাবদ্ধ।

এই প্রসঙ্গে রীনা বিশ্বাস[৫৪]জানিয়েছেন, ঘরের বাইরের কাজ কর্ম পুরুষরাই দেখা শোনা করে, সেখানে মহিলারা যেতেই চায় না। এবং পুরুষরা নারীদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহন ও ভালো চোখে দেখে না। যে মহিলারা রাজনীতিতে অংশ গ্রহন করে তাঁদেরকে নিয়ে গ্রামঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের কথা উঠে আসে, ফলে তারা রাজনীতি থেকে দুরেই থাকে।

৪.৯.বাংলাদেশী মতুয়া নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

আবুল বারকত তাঁর *কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*[৫৫] গ্রন্থে বলেছেন, এ দেশে নারী পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্ববিরোধ লক্ষণীয়। আমাদের ব্যাক্তিজীবনে নারী জননী হিসাবে সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধার। মা'র জন্য জীবন দিতে পারে না এমন কোন পুরুষই নেই। কিন্তু ঐ জননীই তার সচেতনাতা ও সক্ষমতার বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন এবং নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রক হবেন- এ কথা কি আমরা ভাবি? কৃষি প্রধান দেশে কৃষি উৎপাদনে নারীর অবদান যে ৫০ ভাগ- এর স্বীকৃতি কোথায়? ফসল চাষ, ধান ঝাড়াই, তুষ ছাড়ানো- শুকানো, ধান সেদ্ধ করা, হাঁস-মুরগি-গরু পালন করা, জ্বালানি সংগ্রহ করা,

রান্না করা- এ সবই তো নারীই করেন। নারী যে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এবং সৃজনশীলতার সাথে এসব করেন- তা আমরা কি বুঝি? পরিবারের জন্য যিনি সারা বছর দৈনিক গড়ে ১৮ ঘণ্টা শ্রম দেন- তার স্বীকৃতিই কি এই যে তিনি পরিবারে সবার শেষে , সবার চেয়ে কম এবং উচ্ছিষ্ট খাবারের জন্য জন্মেছেন?

এই প্রসঙ্গে সমীক্ষাকৃত অঞ্চলে একই রকম পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, ফুলমালা বিশ্বাস[৫৬] জানিয়েছেন, পোড়াপুড়ির বছর আমাদের পরিবারের সবাই দেশ ছাড়ি, ইন্ডিয়ার রাণাঘাটে এক বছর থাকার পর বাংলাদেশের গ্রামে চলে আসি। ছোটো দুই ছেলে, মেয়ে আর স্বামীকে নিয়ে দেশে এসে দেখি বাড়ীতে কিছুই নেই। ঐ যে সারা দিন রাত এক করে ঘর তৈরি করা থেকে শুরু করে জমিজমা করেছি, এখন ২-৩ বছর হল কোমরের যন্ত্রণা নিয়ে উঠতে পারি না। স্বামী নেই, ছেলের বউরা দেখে না দেখার মতো করে। ছেলেরা বোঝা মনে করে, সরকার মাসে ২০০০ টাকা করে বয়স্ক ভাতা দেয়, তাই দিয়ে ওষুধ, পান ইত্যাদি খেতে পারি।

উক্ত সমীক্ষা অঞ্চলের সাক্ষাৎদাতা পরিবারের মাসিক আয়ঃ

সাক্ষাৎদাতার পরিবারের মাসিক আয়ঃ

টাকার পরিমান	মহিলা	পুরুষ
১০০০-৩০০০	১৪	২
৩০০১-৫০০০	৩	৫
৫০০১-৭০০০		৪
৭০০১-৯০০০		২
৯০০১-১১০০০		১
১১০০১-১৩০০০		১
১৩০০১-১৫০০০		
১৫০০১-১৭০০০	৪	২
১৭০০১-১৯০০০		

>১৯০০১		১

সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ১০০০-৩০০০আয়ের মধ্যে যারা আছেন তাদের বেশীর ভাগ অর্থাৎ ১০ জন মহিলা হাঁস মুরগী পালন করে ২০০০ থেকে ২৭০০ টাকার মধ্যে মাসিক আয় করেন। ৪ জন মহিলা বয়স্ক ভাতা হিসাবে ২০০০ টাকার মতো পান। সেই হিসাবে ২জন পুরুষ বয়স্ক ভাতা পান। ৩০০১-৫০০০ আয় করা মহিলারা যারা দৈনিক মজুরীর কাজ করেন এবং বাড়ীতে হাঁসমুরগি পালন করেন। তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম ৩ জন, অন্য দিকে একই আয় করা পুরুষের সংখ্যা ৫জন যারা দৈনিক জমিতে কাজ করে,এবং তার মধ্যে ২ জন মুদির দোকান আছে। ৪ জন মহিলা যাদের আয় ১৫০০১-১৭০০০ তারা সমাজে ধনী পরিবার হিসাবে পরিচিত। তারা স্নাতক স্তর পড়াশোনা করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি পেয়েছেন। এবং ২জন পুরুষও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরুষদের আয়ের উৎস হিসাবে তারা ৫০০১-৭০০০ তাকা আয় করা ৪ জন পুরুষ বিভিন্ন বাজারে গিয়ে পান, হলুদ,লঙ্কা, জিরা, তেল, খাতা, কলম, প্রভৃতি বিক্রি করেন। যারা গ্রামে অবস্থাপূর্ণ পরিবার হিসাবে চিহ্নিত যাদের পরিবারের নারীরা জমি থেকে ধান তোলার পর ধান মাড়াই করে, চাল সিদ্ধ করে, এবং খড় রৌদ্রে শুকিয়ে গাদা করে রাখে। বর্ষাকালে তারা বাড়ীর উঠানে নানা ধরনের সবজি চাষ করে।৭০০১-৯০০০ টাকা আয় করা পুরুষদের সিঙ্গা বাজারে বড় ধরনের মুদীর দোকান রয়েছে।যাদের পরিবার ও অবস্থাপূর্ণ মধ্যবিত্ত বলে পরিচিত। ৯০০১- ১৩০০০ টাকা আয় করা পুরুষ ২জনে একজন টিউশন পড়ান, অন্য জন বাজারে স্বর্ণকারের দোকান আছে। এবং একজন পুরুষ যার আয় সব থেকে বেশী উক্ত সমীক্ষায় তিনি মাছের ব্যবসা করেন। স্থানীয় স্তর থেকে মাছ কিনে তিনি ঢাকায় লরি করে মাছ পাইকারি হাটে বিক্রি করতে পাঠিয়ে দেন। এই সমীক্ষা অঞ্চলের নারীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 'স্ত্রীধন' বলতে যেটা বুঝি সেই অর্থ পেত হাঁসমুরগির ডিম বিক্রি করা টাকা বা হাঁস মুরগী বিক্রি করে।কিন্তু যুগভেদে এবং যুগ প্রয়োজনে পরবর্তীকালে মতুয়া ধর্মে নানা ধরণের বিধিসমূহ লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত হয়েছে।এগুলি "মতুয়া আইন" নামে খ্যাত। অবিভক্ত বঙ্গে তদানীন্তন মতুয়া মহাসঙ্ঘ কর্তৃক এই "মতুয়া আইন" সর্ব প্রথম লিখিত আকারে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে মূল মতুয়া কেন্দ্র শ্রীধাম ওড়াকান্দি থেকে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ- গুরুচাঁদ মিশনের নামে ১৩৮৬(১৯৭৯) ও ১৩৮৭ (১৯৮০) বঙ্গাব্দে যথাক্রমে মহাবারুণী ও রথযাত্রার দিন শ্রীপতি ঠাকুর ও

শ্রী হিমাংশু ঠাকুর এবং অপরপক্ষে শ্রী অংশুপতি ঠাকুর কর্তৃক পুস্তিকা আকারে এই মতুয়া আইন প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। যে আইনে বলা হয়েছিলঃ

"কোন মতুয়া বাড়ীতে হাঁস,মুরগী,শূকর, ছাগল ও পায়রা পুষবে না"।[৫৭] বাংলাদেশের মতুয়ারা, একমাত্র ধান চাষের ওপর নির্ভরশীল ফলতঃ তাদের পরিবারের নারীদের মজুরিহীন কৃষি কাজ করতে হয় বছরে ৪-৫ মাস, তবে তার মধ্যেও অনেক মহিলা অন্যের জমিতে কাজ করে। ধানের

বীজ বপন থেকে শুরু করে ধান মাড়াই করা কাজে সমীক্ষাকৃত অঞ্চলের মহিলাদের দক্ষতা অপরিসীম। তাই ধানের বীজ বপনের সময় তাদের চাহিদা থাকে, মজুরী পুরুষের সমান থাকে, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে এইই কাজ গুলো মহিলারা যত্ন সহকারে করে। এছাড়া আখের রস থেকে গুঁড় বানানোর কাজে পরিবারে সাহায্য করে থাকে। অঞ্চল ভেদে কাজ আলাদা হয়ে থাকে।

৪.১০.বাংলাদেশের মতুয়া নারীদের শিক্ষা

...It is not a one day single incident, rather it just became systematon, which must alarm the humanity. But a huge number of rape towards the Hindu women are motivated for three main reasons:

i) To grab the Hindu lands „Rape the Hindu Women" has long been used as a device by the Muslims; A raped Hindu woman usually do not get justice. Even, if she receives justice, she and her family never can rehabilitate into the society. Hence, rather becoming abandond and gradually transforming into a prostitute and/or committing suicide, the raped Hindu woman and her family often flee Bangladesh.

ii) To forcefully convert them into Muslim. It is to be noted that for the socio-economic and cultural structure, a raped Hindu woman has no room in the society; not in father"s home, not in husband"s home. Even, if she and her family would flee, once it is revealed, she life will be again completely messed. Hence, a vulnerable raped Hindu women rather than destroying her life just convert into Muslim religion.

iii) To set example and spread threat into the Hindu society to eliminate them, rape is used as the easiest and quickest weapon against the Hindu women. Here, the Hindu women just become viction not only for being a women, but a minority woman. And the Muslims use „Rape" as a safe device for Islamization, land grabbing and setting example in the community. [৫৮]

ফলে এইরকম কারনের জন্য সংখ্যালঘূ মেয়েরা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধার সম্মুখীন হয়।

সমীক্ষা অঞ্চলের, সবিতা মল্লিক[৫৯] জানিয়েছেন, উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে যেতে হয়, সেটা একটা সংখ্যা লঘূ মেয়ে হিসাবে মতুয়া মেয়েদের বাইরে যাওয়াটা বিপদজনক বলে মনে করে অনেকে, এটা ছাড়াও অর্থের প্রয়োজন হয়, সেটার যোগান দেওয়ার মতো উক্ত অঞ্চলের পরিবার খুব কম দেখা যায়। তাছাড়া পরিবারের কর্তা বিশেষ করে বাবা বা দাদারা মনে করে এতো পরিয়ে কি হবে, তার থেকে কিছু অর্থ জমিয়ে রাখা প্রয়োজন। সেই অর্থের মাধ্যমে ভালো ছেলের সাথে বিয়ে দেওয়া যাবে।

উক্ত সমীক্ষা অঞ্চলের সাক্ষাৎদাতাদের শিক্ষার হারঃ

সাক্ষাৎদাতার শিক্ষার হারঃ

শিক্ষা	নারী	পুরুষ
নিরক্ষর	৬	২
*ন্যূনতম স্বাক্ষর	৫	২
* পঞ্চম শ্রেনি পাশ	৩	-

নবম শ্রেনি পাশ	৯	৩
মাধ্যমিক	৪	-
উচ্চ মাধ্যমিক	-	-
স্নাতক	৩	১
স্নাতকোত্তর	-	-

উক্ত সমীক্ষায় ৬জন নারী নিরক্ষর নারী সাক্ষাৎ গ্রহন করা হয়েছে, যাদের বয়স ষাটের উর্ধে, যারা মুক্তিযুদ্ধ সময় শরণার্থী হিসাবে ভারতে এসেও পরবর্তীতে বাংলাদেশে চলে গিয়েছিল। মতুয়া ধর্মের বিভিন্ন নিয়ম নীতি মেনে চলেছেন। এবং দুই জন পুরুষও নিরক্ষর। যারা সবাই বয়স্ক ভাতা পান। ন্যূনতম স্বাক্ষর করতে পারেন এমন নারীদের ও পাওয়া যায় যাদের বয়স গড়ে ৪০-৫০ এর মধ্যে। যাদের জন্ম হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের কিছু পূর্বে বা কিছুদিন পরে। ফলে সহজেই তাদের অবস্থা অনুমেয়। দারিদ্রতা, মুক্তিযুদ্ধের সময় যাদের সব কিছু হারাতে হয়েছিল, নতুন করে দেশ, ঘর গঠনের জন্য তাদের নিজেদের শিক্ষাকে বলি দিতে হয়েছিল। পঞ্চম শ্রেণী পাশ মহিলাদের সংখ্যা ৩ জন। যারা গুরুচাঁদ ঠাকুরের ‘ খাও বা না খাও ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দাও’ নীতির মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে যে পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার ফলস্বরুপ তারা প্রাথমিক শিক্ষাটুকু গ্রহন করতে পেরেছিল।একই রকম ভাবে ৯জন নারীও নবম শ্রেণী অব্ধি পড়াশোনা করতে পেরেছিল। আর ৩জন পুরুষ ও পড়াশোনা করতে পেরেছিল। এই ৯জন নারীকে পরিবার থেকে নবম শ্রেণীতে পড়াকালীন বিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে তারা জানান। তবে তারা নবম শ্রেণী অব্ধি ছাত্রীদের জন্য সরকার থেকে বছরে যে ১০০০ টাকা দেওয়া হতো সেটা তারা পেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন। মাধ্যমিক পাশ করা নারীর সংখ্যা ৪ জন। পরবর্তীকালে এদের মধ্যে একজনকে ভারতে বসবাসকারী ছেলের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। যার ফলে তার পড়াশোনা আর হয় নি। অন্য ৩জনকে মাধ্যমিক পাশ করার পর পরিবার থেকে পড়ানোর দিয়ে অগ্রসর না হয়ে ‘ভালো’ ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে দেন বলে জানিয়েছেন। স্নাতক পাশ করা ৩ জন নারী বর্তমানে চাকরি করেন। তাদের মধ্যে থেকে একজন জানিয়েছেন যে বিয়ের আগে শর্ত ছিল মেয়েকে স্নাতক পাশ করাতে

হবে। পরবর্তীতে স্নাতক পাশ করে আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি পাই। ফলে উচ্চশিক্ষা শিক্ষিতা হলে নারীদের যে চাকরি রয়েছে সেটা বোঝা যায়।

৪.১১.সামাজিক অবস্থা

...Zia had to fall on the support of the so-called pro-Islamic and other fundamentalist groups. The Proclamation Order No. 1, in 1977, which inserted the first sentence of the Holy Quran: Bismillah-ar-Rahman-ar-Rahim (In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful), at the beginning of the Constitution not only dismantled secularism in Bangladesh but also deleted the principle of secularism and replaced it by "Absolute Trust and Faith in the Almighty Allah". Zia's (1988) assassination paved way for the army general Ershad to come to power and also for Eighth Amendment in the Constitution, in which Article 2 declares: "The state religion of the Republic is Islam, but other religions may be practiced in peace and harmony in the Republic".[৬০]

১৯৯০ সালে বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচারের ফলে অনেক জায়গা হিন্দু শুন্য হয়ে যায় এবং বহুস্থানের হিন্দুরা বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে। চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর হিন্দুরা সহায়-সম্বল,বাড়ি-ঘর সব হারিয়ে পাহাড়ের উপর কৈবল্যধাম মন্দিরের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহন করে।সেখানে কমপক্ষে ৫০০ টি হিন্দু পরিবার আশ্রয় নিয়ে তাদের জীবন রক্ষা করে। ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলার চরপাতা ইউনিয়নের নলগোড়া গ্রামের সাধু সিংয়ের বাড়িতে ছয়টি পরিবার ছিল যারা সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের শিকার হয়ে ভারতে পাড়ি দিয়ে জীবন ও সম্মান রক্ষা করে।১৯৯২সালের ৬ই ডিসেম্বর বাবরী মসজিদ ধ্বংসের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের শিকার হয়ে ভোলা জেলার হাজার হাজার হিন্দু বাস্তুচ্যুত হয় এবং পালিয়ে চলে যায়।ফলে হিন্দু অধ্যুষিত ভোলা জেলা প্রায় হিন্দুশূন্য বর্তমানে। বাংলাদশের প্রতিটি হিন্দু প্রধান অঞ্চলে হত্যা ,ধর্ষণ, হিন্দুদের বাড়ি-ঘর-ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান লুটপাট, মন্দির-ধর্মস্থান ধ্বংসসহ সকল ধরণের সাম্প্রদায়িক

সন্ত্রাস করে মুসলিমরা। ফলে সারা দেশ ব্যাপী অনেক হিন্দু জীবনের নিরাপত্তার জন্য তাদের জায়গা,সম্পত্তি,বাড়ি-ঘর ছেড়ে ভারতে আশ্রয়ের জন্য পালিয়ে চলে যায়।[৬১] ২০০১ সালের দাঙ্গা-হাঙ্গামার তদন্তে উঠে এসেছে রাজনৈতিক দল গুলির ভূমিকা। এটা অনুমান করা হয়েছে যে ২৬০০০ লোক ১৮০০০ অপরাধ মূলক ঘটনাতে অংশ নিয়েছে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হিন্দুরা আক্রান্ত। ৫৫৭১ টি অভিযোগ পত্র জমা পড়ে, তার মধ্যে ৩৬২৫ টি তদন্তের আওতায় আসে। এর মধ্যে ৩৫৫ টি রাজনৈতিক হত্যা, ৩২৭০ টি ধর্ষণ, লুঠপাঠ, অস্ত্রাদির ব্যবহার।২০১১ সালের দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে HAF এক বিবরণীতে জানিয়েছে যে নিম্নোক্ত আক্রমন হিন্দুদের উপর করা হয়েছে[৬২]

সাল	অত্যাচারের সংখ্যা
২০০১	৬৭
২০০৪	৩৯৯
২০০৫	৪৮০
২০০৬	৪৬১
২০০৭	২৭০
২০০৮	৩০৬
২০০৯	৩৪৪
২০১০	৪৮৯
২০১১	৬৭২

নারীদের প্রতি অত্যাচার অতি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলাদেশে ২০০১ সালে ১০০০ হিন্দু মহিলা ও বালিকা ধর্ষিতা হয়েছে। ২০০১ সালের দাঙ্গার তদন্তে এটা প্রকাশিত হয়েছে যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টি(B.N.P) রাজনৈতিক দলের কতিপয় মন্ত্রী ও কতিপয় সাংসদ

এবং কিছু চরমপন্থী মুসলিমরা দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত। বিশ্ব মানব অধিকার সংগঠনের এক বিবরনে সম্প্রতি উল্লেখিত হয়েছে যে রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের একটি যন্ত্র হল 'গণধর্ষণ' ।বাংলাদেশের গণধর্ষণ থেকে গর্ভবতী বা বৃদ্ধা বা নাবালিকা বাদ যায় নি। ২০১১ সালে সংখ্যালঘু নারীদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে ৭১১ জন মহিলা। এর মধ্যে ২৯ জন আত্মহত্যা করেছে, ৬ জনকে হত্যা করা হয়েছে, ৫৯ জন আহত,৯১ জন অত্যাচারিত হয়েছে,১২ জন অপহরিত হয়েছে এবং ১৫ জন ধর্ষিত হয়েছে। এই সময়ে ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ও প্রতিরোধ করতে গিয়ে ১৩ জনকে হত্যা করা হয়েছে,২৮০ জন আঘাত পেয়েছে ও ৩ জনকে আক্রমণ কারীদের অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে। ২০১০ সালে ধর্ষণের শিকার হতে হয়েছে ৫৫৯ জন কে।[৬৩] ফলে স্বাভাবিক ভাবেই সহজেই অনুমেয় সংখ্যালঘূ হিসাবে বাংলাদেশে মতুয়া নারীদের অবস্থা। শুধুমাত্র তাদের উপর সংখ্যাগরিস্থ চাপ ছিল সেটা ও নয়, ছিল তাদের নিজস্ব সমাজের চাপও। মনীষা বিশ্বাস[৬৪] জানিয়েছেন, তার বয়স যখন ২৩ বছর তখন ভালোবেসে কাউকে না জানিয়ে বিয়ে করেছিলেন পূর্ব পাড়ার এক গরিব শিক্ষিত ছেলেকে(বর্তমানে টিউশন পড়ান)। আমাদের পাড়ার ১১৩ তা পরিবার নিয়ে একটা সমাজ ব্যবস্থা ছিল, যেখানে সবাই সবার বিপদে আপদে এগিয়ে আসতো, কিন্তু যেহেতু আমি কাউকে না জানিয়ে বিয়ে করেছিলাম, পাড়ার মুরুব্বীরা সবাই মিলে আমার বাবার পরিবারকে সমাজচ্যুত করে রেখে দিল। আমাদের পরিবারের সাথে কেউ কথা বলত না, আমাদের কোন অনুষ্ঠানে কেউ ডাকতো না, ফলে আমরা এক ঘরে হয়ে রইলাম। কিন্তু ছেলেটার সমাজ থেকে তাকে তো কোন এই ধরনের সমাজচ্যুত হতে হই নি, আর আমি তো প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েই বিয়ে করেছিলাম, তাহলে কেন আমার পরিবারকে এই সমাজের পুরুষরা এই ধরনের ফতোয়া জারি করেছিল, শুধু মাত্র মেয়ে হয়ে একা সিদ্ধান্ত নিয়ে বিয়ে করেছি বলে?আমি মেয়ে বলে কি একা সিদ্ধান্ত নিতে পারি না?। যদিও বর্তমান সময়ে সেই এক ঘরে করে রাখার ব্যাপারটা মিটে গেছে বলেও তিনি জানান। কিন্তু কিন্তু প্রথম ১০ বছরের মতো তার নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে তার ফল পরিবারকে এমন ভুগতে হয়েছে বলে তিনি এই সমাজ ব্যবস্থার প্রতি ধিক্কার জানিয়েছেন। পরিবার বা সমাজ মিলে সিদ্ধান্ত নিলেই যে মেয়ে ভালো থাকে সেটা কখনোই বলা যায় না, এই রকম একজন সাক্ষাৎদাতা ছিলেন মিতালী বিশ্বাস[৬৫] তিনি বলেছেন , মাধ্যমিক পাশ করে I.A(Higher Secondary) পড়তে কদমবাড়ী কলেজে ভর্তি হই, একটা ছেলের সাথে

সম্পর্ক হওয়ায় পরিবার মিলে ভারতে কাজ করে (বাংলাদেশে মা-বাবা থাকে) এই রকম একটা ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়। প্রথমে ভারতে এসে আমাকে নিয়ে রাজস্থান চলে যায়। ঐখানে খাবার আমার মোটেও ভালো লাগতো না, স্বামী ও আমার কোন খেয়াল রাখতো না। কোনদিন একবেলা খেতাম তো, কোনদিন না খেয়ে থাকতাম। তার সাথে ছিল শারীরিক নির্যাতন , এই রকম অবস্থায় আমি যখন গর্ভবতী হয়ে পড়ি, তার এক আত্মীয় পশ্চিমবঙ্গে থাকে সেখানে রেখে যায়, যেখানে ঐ অবস্থায় আমাকে পরিবারের সব কাজ করতে হতো। আমার মেয়ে হয়, যার ফলে আমি আরো অনাদরে হয়ে পড়ি। কোনোভাবে স্বামী আমাকে নিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে এসে শ্বশুর বাড়ীতে রাখে, সেখানে আমাকে আর অইতুকু মেয়েকে না খেয়ে থাকতে হতো। স্বামী সবাইকে বলতো ঐ মেয়ে তার নয়। আমি বাবার বাড়ী চলে আসি। এখনো আছি, সেখানে আমাকে কেউ কিছু বলে না। কিন্তু পাড়া প্রতিবেশি বাঁকা চোখে স্বামীর ঘর করতে পারি না বলে দোষ দেয়।এই সমাজে যদি সবাই সমান হতো তাহলে সবাই শুধু আমাকে দোষ দেয় কেন? আর সম্পর্ক করার জন্য কোন সমাজ, পরিবার তাকে এতো বড় শাস্তি দিতে পারে? যে প্রশ্নের সে কোন উত্তর খুঁজে পায় না। তাদের ভুল সিদ্ধান্তের ফল তো আমি কেন ভুগতে যাব। এ প্রসঙ্গে মায়া বিশ্বাস[৬৬] জানিয়েছেন,তিনি জানিয়েছেন, ৩৪ বছর আগে আমার এই গ্রামে বিয়ে হয় , বিয়ের ৬ বছরের মধ্যে স্বামী মারা জায়।শাশুড়ি, ননদ, দেবর সবাই মিলে আমাকে দোষ দিতে শুরু করে 'আমি নাহি ব্যাটারে খাইছি' শুধু তাই নয় এমনকি ননদ, দেবর গায়ে হাত ও তুলতো । নিঃসঙ্গতা ও অতীতের কথা মনে করে তার গলা থেকেও বেরিয়ে আসেঃ

'পোষা পাখী উড়ে যাবে সজনী
একদিন ভাবি নাই মনে'

৪.১২.পর্যবেক্ষণ

পশ্চিমবঙ্গের মতুয়া নারীরা এই সময়ে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে সেটা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯২ সালে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা পেয়েছে।পূর্বের তুলনায় শিক্ষিতার পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে সামাজিক দিক দিয়ে তাদের গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। উচ্চবর্ণের নারীদের তুলনায় তারা কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাসরত মতুয়া নারীদের তুলনায় তারা অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের মতুয়া নারীদের সামাজিক দিক দিয়ে এখনো শোষিত। অর্থনৈতিক ভাবে তারা এখনো স্বাবলম্বী হতে পারেনি । এই দিক থেকে তারা যেহেতু সংখ্যালঘু, আবার নারী হিসাবে পুরুষদের অধীনে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের মতুয়া নারীদের তুলনায় তাদের উপর শোষণ বহুমাত্রিক।

টীকা ও সূত্র নির্দেশ

১. সুকোমল সেন : *ভারতের সভ্যতা ও সনাজ বিকাশে ধর্ম, শ্রেণী ও জাতিভেদ,* (ন্যাশনাল বুক এজেন্সী,কলিকাতা,১৯১২)পৃ.১২৭।

২. তদেব, পৃ. ১৩২।

৩. B.R. Ambedkar : *Writtings and Speeches Vol-vii*, (Maharastra,Education Dept. Govt. of,1990)p.279।

৪. যতীন বালা : *দলিত সাহিত্য আন্দোলন,* (কোলকাতা,চতুর্থ দুনিয়া,২০০২)পৃ. ৩৮।

৫. Sukhadeo Thorat : *Dalits in India Search for a Common Destiny*,(New Delhi,Sage Publications, 2009) p.p.1-3.

৬. Gopal Guru: *The Language of Dalit-Bahujan Political Discourse,* Ghanshyam Shah (ed) 'Dalit Identity and Politics'(New Delhi,Sage Publications, 2001)p. 101.

৭. S.M Michael:'Untouchable: *Dalits in Modern India,* (Lynne Rienner Publication, 1999)p.15.

৮. নন্দদুলাল মোহান্ত: *মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ,* (কলিকাতা, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, , ২০০২)পৃ.৬।

৯. নন্দদুলাল মোহান্ত: *তদেব,* পৃ.৭।

১০. প্রসেনজিত চৌধুরী : *মহারাষ্ট্রীয় নবজাগরন' ব্রাহ্মন্যবাদ বিরোধী আন্দোলন ও নারী জাগরণের এক অধ্যায়,* (কোলকাতা,অনুবাদ-বাসুদেব দাস, সেতু প্রকাশনী, ২০১৪)পৃ.৫৭।

১১. শরন কুমার লিম্বালেঃ : *দলিত নন্দনতত্ত্ব,* (কোলকাতা, অনুবাদক- মৃন্ময় প্রামানিক,কোলকাতা, একটি তৃতীয় পরিসর প্রকশনা,২০১৭)পৃ.পৃ.১৪-১৫।

১২. নিহাররঞ্জন রায় : *বাঙ্গালী হিন্দুর বর্ণভেদ,* (কলিকাতা, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থালয়,১৩৫২) পৃ.পৃ-৮৯-৯০)।

১৩. নিহাররঞ্জন রায় : *তদেব,* পৃ.পৃ.৯২-৯৪)।

১৪. রূপ কুমার বর্মণ: *বাংলার নিম্নবর্ণীয় (তফশিলি) মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান, বিকাশ ও বর্তমান পরিস্থিতি,* (অন্তর্মুখ-বাংলা গবেষণা পত্রিকা, পর্ব-৩,সঙ্খ্যা-৩, জানুয়ারি- মারচ,২০১৪, বাগ, স্বপন কুমার(সম্পা)পৃ.১০৯।

১৫. মনোশান্ত বিশ্বাস : *বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ,সংস্কৃতি,রাজনীতি,* কোলকাতা,সেতু প্রকাশনী,২০১৬)পৃ.২৩।

১৬. Debi chatterjee: *Dalit Liberation Struggles*, (International Encylopedia of Revolution and Protest,Ness, Immanuel, Blackwell Publishing, 2009) p.p.954-961.

১৭. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়: *উন্নয়ন,বিভাজন ও জাতিঃ বাংলার নমঃশূদ্র আন্দোলন, ১৮৭২-১৯৪৭,* শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিজিৎদাশগুপ্ত, (সম্পা): 'জাতি,বর্ণ ও বাঙ্গালী সমাজ (দিল্লী,আই.সি.বি.এস., ১৯৯৮)পৃ.১২৭।

১৮. রূপ কুমার বর্মণ : *বাঙ্গালি নিম্নবর্ণ মানুষের সামাজিক অবস্থান ও অদ্বৈত মল্ল বর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম : সমাজ ও সাহিত্যের তুলুনাত্মক বিশ্লেষণ*, খোকন কুমার বাগ,(সম্পা.)অন্তর্মুখ, (পর্ব- ৪, সংখ্যা-২, ত্রৈমাসিক, অক্টোবর- ডিসেম্বর, ২০১৪)পৃ.১৬।

১৯. মনোহর মৌলী বিশ্বাস : *দলিত সাহিত্যের রূপরেখা* , (কোলকাতা,প্রকাশক-অবনীন্দ্রনাথ বেরা, ২০০৭)পৃ. ১৫০।

২০. জহর সেন মজুমদার : *নিম্নবর্ণের বিশ্বায়ন,* (কোলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০৭) পৃ.১৪ ।

২১. যতীন বালা : *দলিত সাহিত্য আন্দোলন,* (কলিকাতা, চতুর্থ দুনিয়া, ২০০২)পৃ.৬২।

২২. M.Swathy Margaret: *Dalit Feminism,* (www. Counter currents.org, 3rd june,2005) ।

২৩. Gopal Guru: *Dalit Women Talk Differently* ,(Economic and Political Weekly (EPW) ,Oct,1995) P.p.-14-21।

২৪. দেবী চ্যাটার্জি : *দলিত নারীঃবেচে থাকার সংগ্রাম,* দীপঙ্কর চক্রবর্তী (সম্পা.) আত্মপরিচয়ের (কলিকাতা অনীক,সেপ্টেম্বর-অক্টোবর,২০১৩)পৃ.৭৫।

২৫. কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল : *[৫৬, অভিদীপ্তা আবাসন,কোলকাতা]*সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎ গ্রহণকারী গবেষক নিজেই (০৩/০৪/২০১৮)।

২৬. স্বপন কুমার মণ্ডল : *মতুয়া কাণ্ডারী প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর ও নারী জাগরণের পথিকৃৎ বড়মা,* (ঠাকুরনগর, শান্তি সত্যভামা নির্বাণ কমিটি, ২০১৭) পৃ. পৃ.১১-১৯।

২৭. মহামায়া গোলদার : *[৩৮,কাশীপুর, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা]*সাক্ষাৎদাতা, সাক্ষাৎকারী গবেষক নিজেই(০৪/০২/২০১৯)।

২৮. রমেন্দ্র নাথ বিশ্বাস : *[৪৭,প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য, কুমড়া আঞ্চলিক মতুয়া মহাসংঘের সম্পাদক(বর্তমান),কাশীপুর, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা],*সাক্ষাৎদাতা, সাক্ষাৎকারী গবেষক নিজেই(০৫/০৩/২০১৯)।

২৯. কল্যানী বন্দ্যোপাধ্যায় : *রাজনীতি ও নারীশক্তি ক্ষমতায়নের নবদিগন্ত,* (কলিকাতা, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৯)পৃ.১১৩।

৩০. কল্যানী বন্দ্যোপাধ্যায় : *তদেব,* পৃ.১৩৫।

৩১. কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় : *নারী শ্রেণী ও বর্ণ,*(কলকাতা, মিত্রম, ২০০৯)পৃ .৫৩।

৩২. কল্যানী বন্দ্যোপাধ্যায় : *প্রাগুক্ত,* পৃ.১২৩।

৩৩. অসীম মুখোপাধ্যায় : *পঞ্চায়েত প্রাঙ্গন* (কোলকাতা, মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫)পৃ.২৪।

৩৪. রত্না বিশ্বাস : *[৪৩, কুমড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, কাশীপুর, হাবড়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা],*সাক্ষাৎদাতা, সাক্ষাৎকারী গবেষক নিজেই(০৬/০২/২০১৯)।

৩৫. Prasknava Sinharay: *Caste,migration and identity,*(http://www.india-seminar.com/2013/645/645_praskanva_siharay.htm).

৩৬. মনোহর মৌলী বিশ্বাস: *প্রাগুক্ত,*পৃ.১৫০।

৩৭. কল্যানী বন্দ্যোপাধ্যায় : *প্রাগুক্ত,* পৃ.১৭৫।

৩৮. সন্ধ্যা বিশ্বাস : *আত্মকথা* কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল,(সম্পা.) : 'দলিত নারীর প্রবন্ধ সংখ্যা' (কোলকাতা, প্রকাশক- কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল, ২০১৮) পৃ.পৃ.২২-৩৮।

৩৯. Meena Kandasamy: *When I hit you or, portrait of the writer as a young wife*, (Atlantic Books Publishers,2017) ।

৪০. সুপ্রিয়া ব্যাপারী: *[৩১, কাশীপুর, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা]*, সাক্ষাৎদাতা সাক্ষাৎকারী গবেষক নিজেই (০৪/০২/২০১৯)।

৪১. মনোহর মৌলী বিশ্বাস : *[৬৭,চতুর্থ দুনিয়া,স্টল নং-২২]*সাক্ষাৎদাতা, সাক্ষাৎকারী গবেষক নিজেই , (১৬/০২/২০১৮)।

৪২. Gayatri chakrovorty spivak: *Can the Subaltern Speak?,* Williams, Patrick, Chrisman, Laura(ed)Colonial Discourse and Post-Colonial Theory A Reader, (New York ,Columbia University Press, 1988), P.p.66-111।

৪৩. কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল : *প্রাগুক্ত*,সাক্ষাৎদাতা।

৪৪. সন্ধ্যা রানী বিশ্বাস: *[৭৩, সিঙ্গা,কাশিয়ানি,গোপালগঞ্জ]*সাক্ষাৎদাতা, সাক্ষাৎগ্রহনকারী গবেষক নিজেই, (০৭/০৪/২০১৯)।

৪৫. বিচরণ পাগল: *শ্রী শ্রী হরিগুরুচাঁদ চরিত্র-সুধা*, (উত্তর ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ ১৩৫১ সাল, বর্তমান সংস্করণ -১৪১৯)পৃ.৩৫০।

৪৬. বকুল রানী বিশ্বাস:[৭৬, সিঙ্গা, কাশিয়ানি, গোপালগঞ্জ]সাক্ষাৎদাতা,সাক্ষাৎগ্রহনকারী গবেষক নিজেই, (০৮/০৪/২০১৯)।

৪৭. পুষ্প বৈরাগ্য : *মেয়েলি ব্রতঃ নমঃশূদ্র সম্প্রদায়*, কল্যাণী ঠাকুরচাঁড়াল, সম্পা: 'দলিত নারীর প্রবন্ধ সংখ্যা'(কলকাতা,চতুর্থ দুনিয়া২০১৮),পৃ.পৃ.৯৮-১০৮।

৪৮. আবুল বারকত : *বাংলাদেশে 'কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, (ঢাকা, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি,২০১৬) পৃ.৭৯।

৪৯. *https://www.eibela.com* , ২০১৬।

৫০. সৈয়দ আবুল মকসুদ : *প্রথম আলো,* ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৮।

৫১. মহিদুল হক: *সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলার দায়কার* https://www.somewhereinblog.net,২০১৪।

৫২. *https://www.amadershomoy.com, ১৮ই অক্টোবর, ২০১৮)।*

৫৩. শিখা মৌলিক : *[৩৮, সিঙ্গা, কাশিয়ানি,গোপালগঞ্জ]*সাক্ষাৎদাতা,সাক্ষাৎগ্রহনকারী গবেষক নিজেই, (০৮/০৪/২০১৯)।

৫৪. রীনা বিশ্বাস : *[৪৩, সিঙ্গা, কাশিয়ানি,গোপালগঞ্জ]*সাক্ষাৎদাতা,সাক্ষাৎগ্রহনকারী গবেষক নিজেই,

৫৫. আবুল বারকত : *বাংলাদেশে 'কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, (ঢাকা, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি,২০১৬) পৃ.পৃ.৭০-৭৮।

৫৬. ফুলমালা বিশ্বাস : *[৬৯, সিঙ্গা, কাশিয়ানি,গোপালগঞ্জ]*সাক্ষাৎদাতা,সাক্ষাৎগ্রহনকারী গবেষক নিজেই, (০৯/০৪/২০১৯)।

৫৭. নন্দ দুলাল মোহান্ত : *প্রাগুক্ত,*পৃ.১৪৭।

৫৮. Santayana Kaviraj: *Minority Women in Bangladesh: Analysis of Their Human Rights Issues* (The UN Conference for the Fourth Minority Forum. Geneva 29 & 30 Nov 2011, https://www.ohchr.org/).

৫৯. সবিতা মল্লিক: *[৩৭, সিঙ্গা, কাশিয়ানি,গোপালগঞ্জ]*সাক্ষাৎদাতা,সাক্ষাৎগ্রহনকারী গবেষক নিজেই, (৯/০৪/১৯).

৬০. Iftekhar Uddin Chowdhury*: Caste-based Discrimination in South Asia: A Study of Bangladesh,*(New Delhi,Indian Institute of Dalit Studies,2009)p.06।

৬১. প্রানকৃষ্ণ রায়: *নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের আন্দোলনের রূপরেখা*, (দমদম,পাওয়ার পাবলিশার্স.কম), পৃ.৮৮।

৬২. প্রানকৃষ্ণরায়: *তদেব*, পৃ.১০৮

৬৩. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী : *দলিত ও জাতি- বর্ণ বৈষম্য পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, (ঢাকা,অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৭,) পৃ.১২৩।

৬৪. মনীষা বিশ্বাস : *[৪২, সিঙ্গা, কাশিয়ানি,গোপালগঞ্জ]*সাক্ষাৎদাতা,সাক্ষাৎগ্রহনকারী গবেষক নিজেই, (১০/০৪/২০১৯)।

৬৫. মিতালী বিশ্বাস : *[২৫, সিঙ্গা, কাশিয়ানি,গোপালগঞ্জ]*সাক্ষাৎদাতা,সাক্ষাৎগ্রহনকারী গবেষক নিজেই, (১১/০৫/২০১৯)।

৬৬. মায়া বিশ্বাস : *[৫৪, সিঙ্গা, কাশিয়ানি,গোপালগঞ্জ]*সাক্ষাৎদাতা,সাক্ষাৎগ্রহনকারী গবেষক নিজেই, (০৭/০৪/২০১৯)

উপসংহার

উনবিংশ শতকের শেষের দিকে সামাজিক আত্মমর্যাদা আন্দোলনের পথ ধরে মতুয়া ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল। গুরু চাঁদ ঠাকুর মতুয়া ধর্মে বিভিন্ন রীতি নীতির মাধ্যমে মতুয়া নারী- পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছিলেন। গুরুচাঁদ সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে নারীদের দিয়েছিলেন শিক্ষা। অল্প বয়সী বিধবা নারীদের দিয়েছিলেন সংসার। বয়স্ক বিধবা নারীদের আশ্রয় কেন্দ্র দিয়েছিলেন। বাল্য বিবাহ রদ করার জন্য বিভিন্ন সময়ে , বিভিন্ন নির্দেশ দিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে যেখানে অস্পৃশ্য চণ্ডালদের সামাজিক, রাজনৈতিক কোন অধিকার ছিল না, সেখানে তিনি এই ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সামাজিক মর্যাদা আদায় করে দিয়েছিলেন। এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব তৈরি করেছিলেন।

কিন্তু ধীরে ধীরে এই ধর্মীয় সমাজেও পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। যেখানে পুরুষদের ঈশ্বরের সমতুল্য হিসাবে বিবেচিত হয়। নারী হয়ে যায় গৌণ বিষয়। নারী হয়ে যায় পুরুষদের বিশুদ্ধ উত্তরাধিকার উৎপাদনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। যেখানে মতুয়া ধর্মে নারীদের অবস্থান ছিল পুরুষদের সহযাত্রী হিসাবে। কিন্তু পরবর্তীতে, এই ধর্মীয় সমাজ চিন্তনে পুরুষ দ্বারা প্রভাবিত কিংবা আবিষ্ট হয়ে পড়ে। নারীদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়। সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে তারা রুদ্ধ হয়ে যায়। নারীপুরুষের মধ্যে দুটি ক্ষেত্র লক্ষ্য করা যায়, পুরুষের জন্য বাইরের জন ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয়, আর নারীদের জন্য বাড়ীর অন্তঃপুর।

দেশভাগের পরবর্তীকালে, মতুয়াদের একাংশ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে,আরেকটা অংশ পূর্ব পাকিস্থানে থেকে যায়। দুই দেশে দুই রকম ভাবে মতুয়া নারীদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করা যায়। উদ্বাস্তু হয়ে আসা নারীরা ঘরের বাইরে পা ফেলে জীবন নির্বাহ করার চেষ্টা শুরু করে। আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা শুরু করে। তাদের ক্ষেত্রে আর অন্তপুর আর বাইরের জনক্ষেত্রের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার ফলে সামাজিক গুরুত্ব তাদের বৃদ্ধি পায়। সাংবিধানিক সুবিধার জন্য তারা শিক্ষিতা হওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য তারা কোলকাতায় মিছিল করতে দেখা যায়। উদ্বাস্তু নারীরা সামাজিক ভাবে মূল স্রোতে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে।

অন্য দিকে, পূর্ববঙ্গে থেকে যাওয়া মতুয়া একাংশ রুটিনভিত্তিক সংখ্যালঘূ হিসাবে নির্যাতনের শিকার হতে থাকে। যার ফল হিসাবে প্রতিদিন তাদের প্রতি অত্যাচার হচ্ছে আর দেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে শুরু করে। এই নির্যাতনে নারীদের সব সময় মূললক্ষ্য বস্ত করা হয়। ফলে সমাজে নারীদের কে আরো অন্তপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে সংখ্যা লঘূ পুরুষদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক , সেখানে সংখ্যালঘু নারীদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। নারীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নেই বললেই চলে। অন্যদিকে, ১৯৯২ সালে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে তপশিলি জাতি হিসাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা পেয়েছে, ফলে স্থানীয় রাজনীতিতে তাদের অংশ গ্রহন লক্ষ্য করা যায়। ১৯৮৬-৮৭ সালে মতুয়া ধর্মের আদিধাম ওরাকান্দি থেকে বেশ কিছু রীতি – নীতি পালনের জন্য মতুয়া ধর্মের অনুরাগীদের নির্দেশ দেওয়া হয়। যেখানে বলা হয়েছে সম্পর্কে নারীদের একা বাইরে বেরোনো,স্বামীকে ঈশ্বর মনে করা, প্রভৃতি কয়েকটি ধারা প্রকাশিত হয়। যেটা বর্তমানে বাংলাদেশের মতুয়া নারীরা মেনে চলে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অনেক মতুয়া নারী সেই ধারা সম্পর্কে এখনো অজ্ঞাত। পশ্চিমবঙ্গের নারীদের আর্থিক স্বচ্ছলতার কারনে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের যেমন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি শিক্ষা ক্ষেত্রে ও দেখা যায়। বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু মতুয়া নারীরা তাদের লেখনীর মাধ্যমে তাদের প্রতি কি ধরনের শোষণ হয়েছে সেই সম্পর্কে নিজেরা লিখে সমাজে তুলে ধরতে পেরেছে। উদ্বাস্তু ও দলিত নারীদের হয়ে কলম ধরেছেন কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই অসহায় মতুয়া নারীদের হয়ে কেউ কল্যাণী চাঁড়াল ঠাকুর হয়ে এগিয়ে আসতে পারেননি।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১। প্রাথমিক উপাদান সমূহ

ক) মতুয়া ধর্মের আকর গ্রন্থঃ

সরকার,তারক চন্দ্র- শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত' ১৩২৩ বঙ্গাব্দ(ইং ১৯১৬ সাল), ওড়াকান্দি, ফরিদপুর, বাংলাদেশ।

হালদার, মহানন্দ-'শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত' চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৬,ঠাকুর নগর।

পাগল,বিচরন-'শ্রী শ্রী গুরু চাঁদ মাহাত্ম্য' ১৪০৩ বঙ্গাব্দ,২য় সংস্করণ, ওড়াকান্দি, ফরিদপুর, বাংলাদেশ।

'শ্রী শ্রী হরিচাঁদ শান্তি মায়ের পূজা পদ্ধতি'-মতুয়া মহাসঙ্ঘ, বীণাপাণি প্রেস,ঠাকুরনগর, উত্তর ২৪ পরগনা,১৯৯৮।

২) গৌণ উপাদানঃ

ক) প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থসমূহঃ

আচার্য, স্বস্তি এবং থাকুর,কল্যানী(সম্পা.)- 'লোক সাংস্কৃতিক প্রবন্ধ সংকলন', চতুর্থ দুনিয়া,কলিকাতা,২০০৮।

গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাত চন্দ্র-' বাংলার নারী জাগরণ' সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ,কলিকাতা,১৯৯৭।

ঘোষ, বিনয়-' বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ' ওরিয়েন্ত লংম্যান,নিউদিল্লী, ১৯৭৮।

ঘোষ, বিনয়-'বাংলার নবজাগৃতি' ওরিয়েন্ত লংম্যান,নিউদিল্লী,১৯৭৯।

ঘোষ, বিনয়-বিদ্রোহী ডিরোজিও' অয়ন,কলিকাতা, ১৯৮০।

চট্টোপাধ্যায়,অসীম-'গ্রাম বাংলার ইতিকথা'(W.W. Hunter রচিত 'Annals of Rural Bengal'এর অনুবাদ) সুবর্ণরেখা,কলিকাতা,১৯৮৪।

চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী ও নিয়োগী,গৌতম-'ভারতের ইতিহাসে নারী' কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কো., কলিকাতা,১৯৮৯।

বিশ্বাস, কপিল কৃষ্ণ-'শ্রীধাম ওড়াকান্দি,ঠাকুর নগর ও মতুয়াদের নানা প্রসঙ্গ' নিখিল ভারত,বামনগাছি,উঃ২৪ পরগণা,২০১০।

বেতাই, আন্দ্রে- ‘পদমর্যাদাঃ মূল্যায়ন ও ক্রমোচ্চ বিন্যাস’ বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর এবং দাশগুপ্ত, অভিজিৎ(সম্পা.)- ‘জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ’ আই. সি. বি. এস. নিউ দিল্লি, ১৯৯৮।

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ- ‘ জাতি ও নিম্নবর্গের চেতনা’ শেখর এবং দাশগুপ্ত, অভিজিৎ(সম্পা.)- ‘জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ’ ১৯৯৮।

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ-‘ ইতিহাসের উত্তরাধিকার’ আনন্দ, কলিকাতা,২০০০।

মোহান্ত, নন্দদুলাল- ‘মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরন’ অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, কলিকাতা,২০০২।

মোহান্ত, নন্দদুলাল-‘মতুয়া ধর্মদর্শনঃ নারী স্বাধিকার’ (চুনি কোটাল স্মারক বক্তব্য,২০০৬,) চাঁড়াল, কল্যাণী ঠাকুর(সম্পা.) – মতুয়াধর্ম প্রসঙ্গে’ চতুর্থ দুনিয়া,২০১০,কলিকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর- ‘উন্নয়ন,বিভাজন ও জাতিঃ বাংলায় নমঃশূদ্র আন্দোলন ১৮৭২-১৯৪৭’ বন্দ্যোপাধ্যায়, এস. এবং দাশগুপ্ত,১৯৯৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ(সম্পা.)-‘দলিতের আখ্যান বৃত্ত,’ মৃত্তিকা,কলিকাতা,২০০৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়,শেখর- ‘নমঃশূদ্র আন্দোলন’ মণ্ডল, চিত্ত ও রায়মণ্ডল,প্রথমা(সম্পা.) ‘বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত’ অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, কলিকাতা,২০০৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়,কল্যানী- ‘নারী, শ্রেণী ও বর্ণঃ নিম্নবর্ণের নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান’ ম্যানোস্ক্রিপ্ট ইন্ডিয়া, ২০০০, হাওড়া।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ-‘ উনিশ শতকে নারী মুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য’ পুস্তক বিপনি, কলিকাতা,২০০১।

চক্রবর্তী,রমাকান্ত- ‘চৈতন্যের ধর্মান্দোলনঃ মূল্যায়ন’ অশীন দাশগুপ্ত স্মারক বক্তৃতা পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলিকাতা, ২০০৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়,কল্যানী-‘ নারী, শ্রেণী ও বর্ণঃ নিম্নবর্ণের নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান’ ম্যানুস্ক্রিপ্ট অফ ইন্ডিয়া, হওরা,২০০০।

স্যান্যাল, হিতেশ রঞ্জন- ‘বাংলায় জাতি’র উৎপত্তি’ শেখর এবং দাশগুপ্ত, অভিজিৎ(সম্পা.)- ‘জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ’ ’ আই. সি. বি. এস. নিউ দিল্লি, ১৯৯৮।

বালা, যতিন- ‘দলিত সাহিত্য আন্দোলন’ চতুর্থ দুনিয়া, কলিকাতা

বসু, নির্মল কুমার-‘ হিন্দু সমাজের গড়ন’ বিশ্বভারতী, ১৯৪৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর-'পলাশি থেকে পার্টিশান' ওরিয়েন্ত লংম্যান,কলিকাতা,২০০৬।

সরকার,সুমিত-' আধুনিক ভারতঃ ১৮৮৫-১৯৪৭' কে. পি. বাগচি এন্ড কোঃ কলিকাতা, ১৯৯৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়,শেখর- 'উন্নয়ন, বিভাজন ও জাতিঃ বাংলার নমঃশূদ্র আন্দোলন, ১৮৭২-১৯৪৭' শেখর এবং দাশগুপ্ত, অভিজিৎ(সম্পা.)- 'জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ' ১৯৯৮।

গুহ, রণজিৎ- 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' ভদ্র, গৌতম এবং চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পা.)-'নিম্নবর্গের ইতিহাস' আনন্দ, কলিকাতা, ১৯৯৮।

হালদার, পরমানন্দ-'মতুয়া ধর্মদর্শন ঠাকুরনগর,উত্তর ২৪ পরগনা,১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, বন্দ্যোপাধ্যায়,অসিত কুমার- ভূমিকা।

বিশ্বাস ,সুকৃতি রঞ্জন –'গ্রাম বাংলার রেনেসাঁর জনক গুরুচাঁদ ঠাকুর' রিপাবলিক প্রকাশনী, উত্তর ২৪ পরগনা,২০০১।

সান্যাল, হিতেশ রঞ্জন-' অস্পৃশ্যতা ও রাজনীতি' সেন, সুজিত(সম্পা.)'জাতপাতের রাজনীতি' পুস্তক বিপনি' কলিকাতা,১৯৮৯।

চাকলাদার, স্নেহময়-' পশ্চিমবঙ্গের জাত ব্যবস্থার প্রকৃতি ও বামফ্রন্ট সরকারের নীতি' সেন, সুজিত(সম্পা.) জাতপাতের রাজনীতি' পুস্তক বিপনি' কলিকাতা,১৯৮৯।

সেন,সুকোমল-' ভারতের সভ্যতা ও সমাজ বিকাশে ধর্ম,শ্রেনী ও জাতিভেদ' ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৯২।

ব্যাপারী, মনোরঞ্জন-'অভিশপ্ত অতীত', বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ- 'দেশভাগঃ স্মৃতি আব সত্তা' প্রোগ্রেসিভ, কলিওকাতা,১৯৯৯।

চ্যাটার্জি,জয়া- 'বাংলা ভাগ হলঃ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ,১৯৩২-১৯৪৭' এল অ্যালমা পাবলিকেশন,কলিকাতা,২০০৩।

ঠাকুর, প্রমথ রঞ্জন-'আত্মচরিত বা পুরবস্মিতি',১৯৯৫, বীণাপাণি প্রেস,ঠাকুরনগর।

ঠাকুর, কপিল কৃষ্ণ-' মতুয়া আন্দোলন ও বাংলার অনুন্নত সমাজ' নিখিল ভারত, কলিকাতা ১৯৯৪।

ঠাকুর,কল্যানী- নারী প্রগতি ও গুরুচাঁদ ঠাকুর' কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর (সম্পা.) 'অন্ত্যজ সমাজ জাগরনের পথিকৃৎ গুরুচাঁদ ঠাকুর' চতুর্থ দুনিয়া, কলিকাতা,১৯৯৭।

ঠাকুর,কপিল কৃষ্ণ-'উদ্বাস্তু আন্দোলনের অনালোচিত কয়েকটি অধ্যায়' নিখিল ভারত পত্রিকা, বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০১০।

ঠাকুর,কপিল কৃষ্ণ-'অন্ত্যজ সমাজ জাগরনের পথিকৃৎ গুরুচাঁদ ঠাকুর' চতুর্থ দুনিয়া,কলিকাতা, ১৯৯৭।

সেনগুপ্ত, মিহির-' বিষাদবৃক্ষ' সুবর্ণরেখা, কলিকাতা,২০০৫।

নিয়োগী, স্নিগ্ধা-' উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নারী জাগরণ' এ. কে. সরকার এন্ড কো. ১৯৮৯,কলিকাতা।

মণ্ডল,দ্বারকানাথ-' নমঃশূদ্র জাতিকথা'

রায়,নিহাররঞ্জন- 'বাঙালির ইতিহাসঃ আদিপর্ব' দে'জ পাবলিশিং,কলিকাতা,১৩৫৬বঙ্গাব্দ।

ঘোষ, শৌরীন্দ্র কুমার-' বাঙালি জাতি পরিচয়' সাহিত্যলোক,কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

শাস্ত্রী, শিবনাথ-'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি, কলিকাতা, ১৯৫৫।

শরিফ,আহমেদ-' বাংলা, বাঙালি, বাঙালিত্ব,' সাহিত্যলোক,১৯৯২।

মুখোপাধ্যায়,কনক-'উনবিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতি ও রামমোহন,বিদ্যাসাগর' ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, প্রা. লি. কলিকাতা,১৯৯৭।

মুখোপাধ্যায়,অমল কুমার-'বাঙ্গালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,১৯৪৭-১৯৯৭'এ.মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৯৯৯।

সরকার,রবিপ্রভা-'নারীমুক্তি আন্দোলন শ্রীধাম ওড়াকান্দী' হরিচাঁদ সেবাসংঘ পত্রিকা,জানুয়ারি-মার্চ,২০০০।

রায়,দেবেশ(সম্পা.)-'দলিত' সাহিত্য একাদেমি,দিল্লি,১৯৯৭।

দত্ত,অমর-'উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলাদেশের হিন্দু জাতীয়তাবাদ' প্রগ্রেসিভ, কলিকাতা,২০০৪।

সেন,সুকুমার-' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা,১৯৪০,দ্বিতীয় খণ্ড।

সরকার,সুমিত-'আধুনিক ভারতঃ ১৮৮৫-১৯৪৭' কলকাতা,১৯৯৩।

ওমর, বদরুদ্দীন-'বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি' কোলকাতা, চতুর্থ দুনিয়া,২০০৯।

চ্যাটার্জি ,দেবী-‘ উদ্বাস্তু মানুষ, আন্তর্জাতিক আইন ও ভারতবর্ষ’ ‘নীড়’ উদ্বাস্তু, ১৫তম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, কলিকাতা, চতুর্থ দুনিয়া,২০০৯।

চ্যাটার্জি,দেবী –‘ভারতের জাতি- বর্ণ ব্যবস্থা বিরোধী ভাবধারা ও আন্দোলনে শ্রেণী দ্বন্দের উৎস সন্ধান’।

রায়,দেবজ্যোতি-‘ কেন উদ্বাস্তু হতে হল?’ কলিকাতা, ২০০১।

চক্রবর্তী,প্রফুল্ল-‘প্রান্তিক মানব’ প্রতীক্ষর, কলিকাতা,১৯৯৭।

বিশ্বাস, সদানন্দ ও বিশ্বাস,কপিল কৃষ্ণ-‘ঠাকুর নগর জনপদের ইতিহাস’ ‘অদল-বদল’ পত্রিকা, ২৩তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, সল্টলেক, কলিকাতা,২০০৮।

বিশ্বাস, মনোহর মৌলী-‘ মতুয়া ধর্মান্দোলন ও নারীবাদ’ চাঁড়াল, কল্যাণী ঠাকুর(সম্পা.)।

বিশ্বাস বিদ্যারত্ন, সীতানাথ-‘ জাতিতত্ত্ব ও নমস্যকুলদর্পণ।

বিশ্বাস ঠাকুর,দেবেন্দ্র লাল-‘মতুয়াঃ বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি-বিধান’হরিচাঁদ মিশন,কলিকাতা,১৯৯২।

বসু,স্বপন-‘ বাংলার নবচেতনার ইতিহাসঃ ১৮২৬- ১৮৫৬’ পুস্তক বিপনি,কলিকাতা, ১৯৭৫।

মুরশিদ,গোলাম-‘ নারী প্রগতিঃ আধুনিকতার আভিঘাতে বঙ্গরমণী’ নয়া উদ্যোগ,কলিকাতা, ২০০১।

মজুমদার,মোহিত লাল-‘ বাংলা ও বাঙ্গালী’ কমলা বুক ডিপো, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

মুখোপাধ্যায়, অমল কুমার-‘ দেশ ,কাল,সমাজ’ কে পি বাগচি এন্ড কোঃ, কলিকাতা, ১৯৮৮।

মিত্র, সতীশ চন্দ্র-‘যশোর খুলনার ইতিহাস’ দ্বিতীয় খন্দ,কলিকাতা, ১৯৬৫।

রানা, সন্তোষ ও রানা,কুমার-‘ পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী’ ক্যাম্প,কলিকাতা,২০০৯।

রায়, রজতকান্ত-‘ পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ’ আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা,১৯৯৪।

রায়,সুনীল কুমার-‘ বঙ্গজন সভ্যতাঃ নমো জাতির আত্ম-পরিচয়’ জনমন, বসিরহাট,উত্তর ২৪ পরগণা, ২০১০।

রায়,নীহার রঞ্জন-‘ বাঙ্গালীর ইতিহাসঃ আদিপর্ব’, দে,জ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

রায় চৌধুরী, তপন –‘ বাঙ্গালনামা’ আনন্দ কলিকাতা,২০০৭।

সেন, সুজিত কুমার(সম্পা.)-‘জাতপাতের রাজনীতি’ পুস্তক বিপনি, কলিকাতা, ১৯৮৯।

সেনগুপ্ত, সুখ রঞ্জন-‘নক্সালবাড়ী থেকে আরবান গেরিলা’ দীপ প্রকাশন, কলিকাতা,২০০৩।

সিংহ, কঙ্কর-'বাংলার রেনেসাঁস অন্ত্যজ আর শুদ্র', র্যা ডিক্যাল,কলিকাতা,২০০৫।

সিংহ, কঙ্কর-'মনু সংহিতা এবং শুদ্র' র্যা ডিক্যাল,কলিকাতা,২০০৬।

সিংহ, দীনেশ চন্দ্র-'শ্যামাপ্রসাদঃ বঙ্গ বিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ', গ্রন্থ রশ্মি, কলিকাতা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ।